প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
সোমনাথ ঘোষ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : কিন্নর রায়

মুদ্রাকর :
অন্নপূর্ণা পাল
শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৮ ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৯

দাম : ২০ টাকা

শ্রীচিত্ত চৌধুরী, শ্রীগোবিন্দ চৌধুরী
শ্রীবুলা চৌধুরী, শ্রীমায়া চৌধুরী
চতুর্বর্গেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই :—

মানসনয়ন

বহুরূপে দেবতা তুমি

তান্ত্রিক সাধনা ও অন্য কাহিনী

সম্মোহন

যক্ষিণী

যোগিনী

কে ডাকে আমায়

জন্মান্তর রহস্য

আজও যা ঘটে

অজানার আঙিনায়

কে তুমি

গোপন সাধনা

অবিশ্বাস্য

অশরীরী

তন্ত্রতপস্যা

সীমান্তের সুর

সে কি এলো ফিরে

সে আসে

আবার আমি

নীল সায়রে

জীবনের ওপার থেকে

মুকুরে শত মুখ

ডাকিনী

যে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি, যে গুহার মুখে লক্ষ্য আমার, শুনেছি এতুটোই ভয়ঙ্কর। এরা জ্যান্ত। এরা মোটে জড়-নিশ্চল নয়। যথেষ্ট শক্তি ধরে। সে-শক্তিকে জয় করা অসম্ভব। কেমনতর শক্তি সে! সত্যি সত্যিই সর্বনেশে-মহাবিপদ কি?

কাঠের পাটাতনের দরজার ফাঁকফোকর দিয়ে সরু সরু ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে গুহার ভেতর থেকে। ধোঁয়া ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ছে না আর।

আস্তে আস্তে দরজাটা সরে যাচ্ছে গুহার মুখ থেকে। ভেতরের দিকে। পাশে, আরো পাশে।

সম্পূর্ণ উন্মুক্ত গুহামুখ এবার।

ভেতরে মধ্যিখানে আগুন জ্বলছে। লকলক করে শিখা উঠছে।

আমি যতদূরে দাঁড়িয়ে, অতদূরে তাপ আসার কথা নয়। তবু কেমন মনে হচ্ছে আমার। ও শিখা আমার একেবারে সামনাসামনি। দেহে অল্প-অল্প তাপ অনুভব করছি।

অদ্ভুত অনুভূতি।

আগুন ঘিরে বসে আছে জনা পাঁচেক স্ত্রীলোক।

উত্তরে বসে আছে যে, একা স্বপ্নমায়া। আগুনে দৃষ্টি। রুখু এলোচুল। পা মুড়ে বসে। পরনে বাঘছাল। বুক থেকে হাঁটু অবধি। আর চারজনের মধ্যে—দু'জন ডানদিকে পাশাপাশি। আর দু'জন বাঁদিকে। মনোবীণা সুনয়নী মৈথিলী হিয়ারানী। এদেরও বেশবাস-বসার ধরন-ধারণ একই রকমের। উত্তরের সঙ্গে পুব-পশ্চিমের কোন তারতম্য নেই।

যতটুকু দেখা যাচ্ছে, ওদের এক একজনের আসনও বুঝি ছালের। ঘ বা হরিণের।

ধীরস্থির হয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে, ওরা তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। কি ভাবনা কি ধ্যান—ওরাই জানে।

এখানে জনবসতিহীন এই নিরালাপুরীতে পাঁচ পাঁচটি স্ত্রীলোকের একসঙ্গে মিলন হল কি করে?

হয়। পৃথিবীতে সব কিছু হয়।

যে যেমন, যেমন মনোভাবের, তেমনি—তেমন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায় হঠাৎ করে। কখনো পথ চলতে-চলতে, কখনো কারো মধ্যে দিয়ে। কেউ বা এসে পড়ে কারো' সঙ্গে কাছাকাছি।

একজন একজনকে মনে করে কত জন্মের আপন। কত জানা কত শোনা কত পরিচয়। পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে আত্মার আত্মীয়। অবিচ্ছিন্ন।

এরা পাঁচজন প্রত্যেকেই কিন্তু আলাদা-আলাদা পরিবার। কারো সঙ্গে কারো কোন যোগাযোগ ছিল না আগে। পরে হয়েছে।

এরা কি আপন-পর সকলের কাছ থেকে চিরদিনের মতো বিচ্ছিন্ন? ভুলেও কি কেউ মনে করে না কোনদিন? এদের মনের কোণেও কি ওদের এতটুকু ঠাঁই নেই?

তাই যদি হয়, তবে কেন?

দ্বীপান্তরের মতো কেন এই নির্বাসনে এরা?

কেন কেন কেন?

যে-জায়গায় আজ আমি দাঁড়িয়ে, ঠিক এই জায়গায় এসেছে চন্দ্রশোভা দ্বিতীয়বার।

এখানকার মাটিতে পা রাখতেই বুকের ভেতর কেঁপে উঠেছে চন্দ্রশোভার। দুহাতে বাঁদিকের বুকটা চেপে ধরেছে সজোরে। দম বুঝি বন্ধ হয়ে যায়।

ধোঁয়ার বিষ ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। অসহ্য ভারী বাতাস। চক্ষের নিমেষে জায়গাটা যে এত তাড়াতাড়ি ভয়াবহ রহস্যপুরী হয়ে উঠবে, কে জানতো আগে। কেউ না জানুক কেউ না বুঝুক—চন্দ্র

শোভা আঁচ পেয়েছিল কিছু কিছু।

পা যেন এগোতে চায় না মোটে। চতুর্দিক থেকে ত্রাসের অসংখ্য কালোছায়া তাকে চেপে পিষে ফেলবে বলে রাজ্যের আক্রোশ মাথায় করে ছুটে আসছে। প্রতিহিংসার আক্রোশ অতৃপ্তির আক্রোশ অবহেলার আক্রোশ।

যে পাহাড় থেকে ধোঁয়ার রেখা বেরিয়ে আসছে ধীরে ধীরে, সে-পাহাড়টাও কেঁপে উঠছে। বাতাসে মিশে ধোঁয়ার সরু রেখা কত বিশাল কত বিষাক্ত না হতে পারে। বিস্ময়কেও হার মানায়।

রাক্ষুসে ধোঁয়া খিদে মেটাবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। ফিকে থেকে ঘন হয়ে উঠছে ক্রমে। খানিক পরে হারিয়ে যাবে ওই পাহাড়। পাহাড়ের গুহা তিনটে। আর গুহার বন্ধ দরজা।

গুহার ভেতর যারা বসে আছে তারা? তারাও কি একই সঙ্গে হারিয়ে যাবে দুনিয়া থেকে? তা কেমন করে হয়। ওরা অক্ষয় বট। ওদের কিছু হলে, অনেকে শান্তি পাবে? স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। মৃত্যুফাঁড়া কেটে যাবে নির্বিঘ্নে। এটা বুঝি হবার নয়।

দিনেরাতে মরণফাঁদের বিশ্বাসী প্রহরী ওরা। ওদের ডাকে সম্মোহন, কথায় সম্মোহন, চাউনিতে সম্মোহন, ভুক্তভোগী বলেই এত ভয় চন্দ্রশোভার। চন্দ্রশোভা নিরুপায়, অসহায়।

সে মরুক দুঃখ নেই, মেয়ে-জামাইয়ের গতি কি হবে?

এ পাপপুরী দেবতার নিষিদ্ধ এলাকা। সব দেবদেবীর প্রবেশ নিষেধ। কেউ এসে বাঁচাতে পারবে না কাউকে। ত্রিভুবনে কোন শক্তি নেই এ শয়তানবুদ্ধির মানুষকে, প্রাণঘাতী দানবকে দাবিয়ে রাখতে সক্ষম।

পারে না যে, এটার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে চন্দ্রশোভার কাছে। চন্দ্রশোভা প্রত্যক্ষসাক্ষী। প্রমাণ শুভ্রাঞ্জন।

চন্দ্রশোভা শুনেছিল যেন কার মুখে। দেবতা ভুল করে, মানুষ ভুল করে কিন্তু শয়তান কখনো ভুল করে না। কখনো তার নির্দয় উদ্দেশ্য থেকে একচুল সরে দাঁড়ায় না। আবার এও শুনেছে, শয়তান শয়তানকে ভুল করে। তাইতেই তার নিপাত।

চন্দ্রশোভার দুপাশে দুজন দাঁড়িয়ে। এরা মানা শোনে নি কিছুতেই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করে টেনে নিয়ে এল এ বাসায়।

ডানদিকে দেবরতন বাঁদিকে অরুণিমা।

দুটো হাত দু'জনের হাতের কবলে। সামনের দিকে টানছে ওরা। এগোতে হবে। মায়ের এরকম দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। আহা, বাছারা। দুজনের বিয়ে হয়েছে বছর দ্বয়েক। ছেলের বড় সাধ ছিল, পূর্ণ হয় নি। অরুণিমাই চন্দ্রশোভার ছেলে, চন্দ্রশোভার মেয়ে। দেবরতন তো দেবরতন। পূর্বজন্মে বুঝি বা ছেলেই ছিল ও। ভাগ্যগুণে এমন জামাই পেয়েছে। কি যত্নআত্তি। পেটের ছেলেও এমন হয় না বোধহয়।

মানুষ চিনতে বড় একটা ভুল করে না চন্দ্রশোভা। এ খ্যাতি যেমন বাপের বাড়িতে তেমনি শ্বশুর বাড়িতে। দেমাক হয়ে উঠেছিল খুব। তাই কি মারাত্মক ভুল করে বসল নিজের বেলায়? নিজের জীবনের জীবন—সর্বস্ব খোয়াতে হবে বলে?

বুকের যন্ত্রণা বেড়ে উঠছে।

অরুণিমা কি বুঝতে পেরেছে তার মনের অবস্থা? তা নাহলে, একথা বলছে কেন?—মা, অমন করে বুক চেপে ধরছ কেন? কি দুঃখ মনে আসছে তোমার? কি কষ্ট?

ভেতরের যন্ত্রণা ভেতরেই পুষে রাখতে ভালবাসে চন্দ্রশোভা। নিজের জন্য অপরে কেন ব্যথা পাবে! কর্মফল ভোগ করতে হয়, সে-ই করবে। সময় বিশেষে সব জিনিস চেপে রাখা দুষ্কর হয়ে ওঠে দেখছে এখন। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে।

এগোতে চেষ্টা করছে। পা বাড়াল।

পাহাড়ের দিকে জোর করে কে যেন চোখ টেনে নিয়ে গেল। শিউরে উঠল চন্দ্রশোভা। যেখানের পা সেখানেই ফিরে এল আবার। গুহার দরজাটা অদ্ভুতভাবে নড়ে উঠল কেন? ভেতরের মানুষ কি বেরিয়ে আসবে নাকি এখুনি। চোখ ফিরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি।

মহাফাঁপড়ে পড়েছে অরুণিমা আর দেবরতন।

সবচেয়ে বেশী বিপদ অরুণিমার। মায়ের প্রকৃতি ভালরকম জানে। কোন ব্যাপারে একবারের বেশী দু'বার জিজ্ঞেস করবার উপায় নেই। জেদী মেয়েছেলে। অসুখবিসুখে কাছে যাবারও উপায় নেই। নিজে যেটা বুঝবে, মরে গেলেও সেটা আঁকড়ে ধরে থাকবে। ভালই হোক আর মন্দই হোক। বেশী কেউ বাড়াবাড়ি করলে, কিছু উত্তর দেবে না। ঘরে থেকে বেরিয়ে গেলেই খিলতাড়া এঁটে চুপচাপ শুয়ে থাকবে।

এই মেজাজের মা তার।

কে জানে, অমতে এখানে আনা হল বলে, এরকম পাল্টে গেল কিনা!

মা দাঁড়িয়ে আছে। ওরাও দাঁড়িয়ে। দেবরতন ইশারায় অরুণিমাকে ব্যাপারটা জানতে বলেছে ক'বার। অরুণিমার ইশারায় একই উত্তর প্রতিবারে। মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করে থাকতে বলেছে।

অরুণিমা জানে, মা কখনো কোন অন্যায় করেনি যেমন, অন্যায় বরদাস্তও করে না কারো। গম্ভীর বিষণ্ণ হলেও বুদ্ধি-বিবেচনাহীন নয়। বরং বলা যায় বেশ বুদ্ধিমতী। বিবেচনাশক্তি প্রখর।

চন্দ্রশোভা নিজেকে সামলে নিয়েছে একটু। বলল, অরুণিমা-দেবরতন! আমি এখানে একটু বসি খানিক। তোমরা একটু এদিক-ওদিক ঘুরে দেখ না!

মাকে ছেড়ে যাবার ইচ্ছে নেই অরুণিমার। কিন্তু আদেশ অমান্য করবার উপায় নেই। কিছু বললে, ফেরার পথে পা বাড়াবে তখুনি। গঙ্গোত্রী যাওয়ার দফারফা একেবারে।

মায়ের বিষণ্ণব্যামো। ডাক্তারের মতে, কোনরকমে কোন আঘাত যেন না পায়। বাইরে ঘোরালে মন প্রফুল্ল থাকে। যতটা পারা যায় প্রফুল্ল রাখতেই বলেছে ডাক্তার। হাসিখুশীতে ভুলিয়ে রাখতে।

অরুনিমা প্রাণখোলা হাসি কোনদিন দেখেনি মায়ের মুখে। বড় করুণমুখ। একখানা বিষাদপ্রতিমা।

বাড়ির লোকের মুখে শুনেছে, অরুণিমা হবার আগে কিন্তু এমনটি ছিল না। হাসির জোয়ার বইয়ে দিত বাড়িময়।

অরুণিমা-দেবরতন কাছ থেকে সরে যেতে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচল চন্দ্রশোভা। একদিকে বাঁচল বটে, কিন্তু আর একদিকে তো মরণের সামিল।

ওই বিভিষিকার পাহাড়-গুহা, গুহার দরজা আর ধোঁয়া এ তো যাচ্ছে না মোটে চোখের সামনে থেকে। যেন আরো ঘন হয়ে আসছে সব। দমবন্ধ ভাবটাও কমছে না।

মনকে ঘোরাবার চেষ্টা করছে চন্দ্রশোভা। যা দেখছে, সমস্ত ভুল, যা ভাবছে সব ভুল।

কিছুতেই পারছে না নিজেকে ঠিক রাখতে। উত্তরকাশী থেকে আসার সময় রাস্তায় বৃষ্টিতে ভিজেছে। শীতে কেঁপেছে। তবু ক্লান্ত হয়ে পড়েনি এতটুকু। বুকভরা আনন্দ নিয়েই হেঁটেছে। এসেছে গঙ্গা-বরুণার সঙ্গমে। প্রকৃতির অপূর্ব মিলনক্ষেত্র।

একজন সন্ন্যাসী সঙ্গমদৃশ্য দেখছে একদৃষ্টে। আর সুরে-ছন্দে মুখে উচ্চারণ করছে, 'সংকল্পং মাত্রং বন্ধঃ'। যে কোন সংকল্পই হোক না কেন, সে শুভকাজের জন্য বা অশুভকাজের জন্য—মানুষকে মহাবন্ধনে বেঁধে রাখে। এ বাঁধন খুলে মনকে মুক্তির আলোয় টেনে নিয়ে আসা অসম্ভব হয়ে ওঠে ভবিষ্যতে। সংকল্প নিজেই একটা মস্ত বন্ধন। আষ্টেপৃষ্টে বন্ধন। সংকল্প ত্যাগেই মিলন। মহামিলন। অদৃশ্যশক্তির সঙ্গে ভেতরের শক্তির সঙ্গম-মিলন। সঙ্গমের লীন হয়ে যাওয়া অসীমে।

অস্তিত্বের লয়। সকল যন্ত্রণা আর অশান্তিরও প্রশান্তি। শুধু একটিমাত্র অনুভব—আনন্দের। আনন্দ আর আনন্দ। আনন্দের মধ্যে সৃষ্টি আনন্দে স্থিতি, আবার আনন্দেই লয়।

সন্ন্যাসী একটি যুবককে সংস্কৃতশ্লোকের মর্ম ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছে। ঠোঁটের ফাঁকে মৃদুহাসি টেনে রেখে। মিষ্টিরোদের আলোয় সন্ন্যাসীর মুখখানা বড় মিষ্টি দেখেছে। গলার স্বরটি আরো মিষ্টি। বলার ভঙ্গীটি ভারী সুন্দর। মনে হয়েছে কোন মুনি সেই মুহূর্তে কোন তপোবন থেকে তপস্যা সেরে ফিরে এসে অমৃত উপদেশ দান করছে। কার জন্যে? মানুষের মঙ্গলের জন্য মানুষের কাছে উপস্থিত হয়েছে।

দেখাশোনার স্বর্গীয় মাহেন্দ্রক্ষণের রেশটুকু মনের কোণে ঘরে রেখেছে চন্দ্রশোভা। পথচলার পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলেই মনে হয় নি একেবারে। ঝরনার ধারে বসে থেকেছে খানিক। ফটিক জল মুখে-চোখে ছিটিয়ে, অঞ্জলি ভরে পিপাসা মিটিয়েছে।

ভাটোয়ারীতে এসে শিবমন্দিরে শিবের মাথায় ফুল-বেলপাতা চড়াবার সময় নিজের অজ্ঞাতসারে কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে স্তোত্রগান। —শিব শিব ওম্, শিবগৌরী ওম্…

হঠাৎ খেয়াল হল সমবেত কণ্ঠের শিব শিব ওম্ শুনে। পাহাড়ী নারীপুরুষ চন্দ্রশোভার গলায় গলা মিলিয়ে চলেছে করজোড়ে চোখ বুজে। স্তোত্রগানের আওয়াজ গমগম করে উঠছে মন্দিরের ভেতর। দিব্যলোকের পরিবেশ নেমে এসেছে ধরাতলে। মন্দির হয়ে উঠেছে শিবলোক। কোন বাজনাবাদ্যি নেই। তবু যেন চন্দ্রশোভা শুনছে বাজনা। বাজছে ডমরু, বাজছে শিঙা। বাজছে ঢাক, কাঁসর ঘণ্টা।

শুধু কি চন্দ্রশোভা শুনেছে একা? না, শুনেছে সবাই। যারা উপস্থিত ছিল—সকলে স্তোত্র শেষে তন্ময়ঘোর কেটে যেতে একবাক্যে স্বীকার করেছে ওর একথা।

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসেও শিবমূর্তি দুচোখের মণি হয়ে উঠেছে তার। কোন আতঙ্কের আভাস আসে নি কোন দিক থেকে। না দেখার দিক থেকে, না মনের দিক থেকে।

মনের পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে পথের ধারে পাহাড়টার কাছা-কাছি এসে পড়ার সময়। সহসা চোখের মণি থেকে সরে গেল শিব-মূর্তি। গানের বাজনার রেশ নিঃশেষ হয়ে গেল নিমেষে। চোখের সামনে ভেসে উঠছে অলক্ষুণে ত্রাস। ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করেছে। বলেছে, না, না ওখানে নয়। নিয়ে যেতে নিষেধ করেছে অরুণিমা-দেবরতনকে।

ওরা অনুরোধ করেছে, এই রাস্তাতে শিগগির হবে। জিদ ধরলে, কার সাধ্যি চন্দ্রশোভাকে নড়ায়, মতকে ফেরায়। কিন্তু অবাক কাণ্ড! সেই চন্দ্রশোভা অন্যজন হয়ে গেল যেন। শরীরে সামর্থ্য-শক্তি সব বুঝি

বজ্রকঠিন হাতে কে এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। গলার নির্ভর-সাহসী স্বরও কেমন যেন ক্ষীণ। তাও আবার গলা ঠেলে জিভ ঠেলে বেরোতে চাইছে না।

কি করুণ অবস্থা।

নিজের কাছে নিজেকেই জগদ্দল ভারবোঝা ঠেকেছে। অরুণিমা-দেবরতন তবু হাত ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। পাহাড়ের সামনাসামনি আসতে গুহার বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে দেখে, দেহ অবশ। অস্থির হয়ে পড়েছে মন। ভয় ভয় ভয়। কি বীভৎস দৃশ্য! নিজে মা হয়ে নিয়ে এলো মেয়েজামাইকে এই মরণ-গহ্বরে। চন্দ্রশোভা জানে কি ভয়ানক এই গুহা। দেবতার ছদ্মবেশে অসুরের বাস। রক্তপিপাসুর বাস। লোকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। জীবনহরণই প্রধান লক্ষ্য।

চন্দ্রশোভার নিজের জীবনের প্রয়োজন ফুরিয়েছে অনেকদিন আগেই। গেলেই বা কি, থাকলেই বা কি। অরুণিমা-দেবরতনকে নিয়েই যত ভাবনা যত ভয়। ওই গুহার মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে কি কেউ? ওর প্রবল আকর্ষণের আওতা থেকে মুক্তি পেয়েছে কি কেউ? সশরীরে সুস্থমনে ফিরে এসেছে কি কেউ?

জানে না চন্দ্রশোভা কারো ব্যাপার। তবে জানে একজনের। দু'-চোখে হাতচাপা দিল চন্দ্রশোভা। বিড়বিড় করে বলল, না, না। তা হতে দেওয়া হবে না আর কিছুতেই। কিছুতেই না। দেবরতন-অরুণিমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবেই। আর একাজ সমাধা করতে হবে তাকেই। দূরে নিয়ে গিয়ে ফেললে অনেকটা বিপদমুক্ত।

গঙ্গা পেরোবার পুলের এদিকে ঋষিকুণ্ড। গরমজলে চান করে মানুষ দেহের গ্লানি নাকি ধুয়ে-মুছে ফেলে। দেহের স্বস্তি আসে বটে। এটা পরীক্ষা করে দেখেছে আগের বারে এসেছে যখন। মনও প্রফুল্ল হয়। একটা সতেজ আমেজ দেহে-মনে জড়িয়ে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। আগে ও জায়গাটায় কোন ঋষি নাকি তপস্যা করেছেন। তখন জঙ্গলের দিন। এখন আর জঙ্গল নেই।

ফেরবার পথে দেখেছে ভুটিয়াদের কুকুর। বাঘের মত গর্জন। ভাল্লুকের মতন লোমে ভরতি। ভেড়াঁদের পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছে। ভেড়াওলা ভুটিয়া চলতে চলতে হঠাৎ চনমনে হয়ে উঠল।

চন্দ্রশোভা একদৃষ্টে দেখছে সব। ভুটিয়াটি মুখ দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ বার করল একটা। একটা ভেড়া কোথায় পথ হারিয়েছিল কে জানে। আওয়াজ শুনে গুটি গুটি করে ঠিক ভুটিয়ার কাছে এসে দাঁড়াল।

আগের মত আর একটা আওয়াজ করল ভুটিয়া। এবারে কোন ভেড়া আর এল না। কুকুরটাকে কান ধরে টেনে এনে ধমকালো, এই পাহারা দিয়ে নিয়ে আসা! শীগগির নিয়ে আয়। যেখান থেকে পারিস!

দুর্বোধ্য ভাষা। পাশের লোকটি ভাঙা হিন্দীতে বুঝিয়ে বলেছে চন্দ্রশোভাকে।

কুকুরটা ভুটিয়ার ভাষা বুঝলো বুঝি! মানুষের মতন মাথা ঝাঁকুনি দিল বার দুয়েক। তারপর মাটি শুঁকতে শুঁকতে চলে গেল। চোখের বাইরে। কিছুক্ষণ। এবার নজরে পড়ছে। ভেড়াকে আগলে আগলে নিয়ে আসছে কুকুর।

একটা কুকুর যখন এভাবে ভেড়াকে নিরাপদে অক্ষত শরীরে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে, তখন চন্দ্রশোভা পারবে না কেন অরুণিমা আর দেবরতনকে নিরাপদস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে! পারবে পারবে পারবে। নিশ্চয় পারবে।

একটু একটু করে মনোবল ফিরে পাচ্ছে চন্দ্রশোভা। ধোঁয়ার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে ওপরে যেন ভেসে উঠছে আবার। বাতাসের ভারী ভাবটা এখন আর মনে হচ্ছে না তেমন। রাশ-রাশ ধোঁয়া—ফিকে কালো, জমাট কালো—চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে। সরে গেল, মুছে গেল।

দমবন্ধ হওয়া ভাবটাও কমে আসছে ক্রমে। একেবারে কমে গেল। নিশ্বাস-প্রশ্বাস সরল হয়ে এসেছে বেশ। চন্দ্রশোভা এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শরীর-মন দুদিক দিয়েই। দুর্বলতা, ভয়—দুটোই কেটে

গেছে। তার পরিবর্তে ধমনীতে নতুন প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্যে ভরা প্রবাহ। সকল শক্তিধরের সমস্ত শক্তি একসঙ্গে জড়ো হয়ে মিলেমিশে একাকার। এ শক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য বিশ্বের যত অকল্যাণ যত অশুভবুদ্ধি। প্রতিহিংসার অনিষ্ট চিন্তা যত।

ভেতরে খুশির জোয়ার চন্দ্রশোভার।

আত্মহারা হয়ে দেখছে। দেখছে আকাশের বুক বিশাল। বিশালে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে কতশত ব্রহ্মাণ্ড। সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র গ্রহ পৃথিবী।

পৃথিবীর আকর্ষণে একটা নীলাভ উজ্জ্বল নক্ষত্র নেমে আসছে দ্রুত। নেমে এসে থামল পাহাড়ের গা ঘেঁষে। নক্ষত্রের মধ্যে একখানা মুখ স্পষ্ট ভেসে উঠেছে। গুরুদেবের হাসিমুখ। গুরুদেবের চাউনি-হাসি যেন কথা কয়ে উঠছে সুমিষ্ট স্বরে। বলছে, ভয় নেই, বিপদ নেই। দেহবর্মের মতন আমার অভয়-আশীর্বাদ ঘিরে রেখেছে চতুর্দিকে।

চমক ভাঙল চন্দ্রশোভার অরুণিমার গানের সুর কানে এসে বাজতে। তোমার সৌন্দর্য হেরি তারায় তারায়। রবি-শশী জলধির গায়। তোমার আঁখি মোর আঁখি। তোমার দেখায় আমি দেখি···

ভালো লাগছে। আমাদের মধ্যে দিয়ে ওপরঅলা হাঁটেন ফেরেন শোনেন কথা কন। আমরা কেউ কিছু নয়। সব তিনি, আবার তিনিই সব।

চন্দ্রশোভার মন বলছে, এটাই আসল সত্যি। কে কার অনিষ্ট করতে পারে! কে কার কাছ থেকে কাকে ছিনিয়ে নিতে পারে! কে কার ইষ্টপথের বাধা হতে পারে? কে কার মৃত্যু-বিচ্ছেদের কারণ?

কেউ না, কেউ না।

নিজের সঙ্গে নিজের প্রশ্ন, উত্তরের লড়াইয়ের আসর মাঝে মাঝে জমে ওঠে ভেতরে। কখনো গোচরে কখনো অগোচরে। এতে আপনি অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় সহজে।

নিরালায় একলা ঘরে বসে বসে এ খেলা খেলতে ভালো লাগে চন্দ্রশোভার। এখানে পাথুরে মাটির ওপর বসে বসে চন্দ্রশোভা কলকাতার তিনতলা বাড়ির দোতলার সাজানো শোবার ঘরে চলে যায়।

খাটে শুয়ে শুয়ে জীবন অধ্যায়ের এক একখানা পাতা উল্টে উল্টে দেখতে থাকে আর নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে বলে বিচার বিশ্লেষণ করতে থাকে।

আচমকা অরুণিমার ডাকে ভীষণ চমকে ওঠে চন্দ্রশোভা। কে যেন তাকে শূন্যে তুপাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে।

বুকের ভেতর ধড়ফড় করে উঠেছে। কোথায় কলকাতার বাড়ির শোবার ঘর, এখন এই পাহাড়-পর্বতের দুর্গম পথ!

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল চন্দ্রশোভা। মুখ থুবড়ে পড়ার টালটা সামলে নিয়ে তাকিয়ে দেখল অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

চাক্ষুষ দেখেও বিশ্বাস আনা অসম্ভব। স্বপ্নমায়া?

এতদিন পরে—দীর্ঘ চব্বিশ বছর কেটে গেছে আজ থেকে। স্বপ্নমায়া কেমন করে একভাবে থাকতে পারে! কেমন ক'রে আগের চেহারা ধরে রাখতে পারে!

না, না, না। এ হতেই পারে না। ভুল, ভুল। স্রেফ চোখের ধাঁধা। মনে পুষে রাখা আগের ছবি এটা। গুহার দরজা খোলা নয়, দরজার ধারে দাঁড়িয়ে স্বপ্নমায়া নয়। চন্দ্রশোভারই ভয়ের ছায়া ওটা।

স্বপ্নমায়া মিষ্টি হাসি হেসে দু'হাত বাড়িয়ে ডাকছে না অরুণিমাকে! অরুণিমা ডাকছে মাকে সঙ্গে যেতে। অরুণিমার পেছনে দেবরতনও এগিয়ে চলেছে গুহার দিকে?

শুভ্রকেশী চন্দ্রশোভা নিজের একটা পাকা চুল কপালের কাছ থেকে টেনে নামিয়ে নিয়ে এলো চোখের সামনে। তার এই অবস্থা! স্বপ্নমায়ার কালো কুচকুচে চুল থাকে কি করে!

আশ্চর্য!

যত মনকে বোঝাতে চাইছে, এসব মিথ্যে। ততই মন বলছে চোখ বলছে, নিছক সত্যি। শীগগির ডেকে নিয়ে এস অরুণিমাকে। জাপ্টে ধরে নিয়ে এস। দেরী হলে পস্তাবে। আপশোসের অন্ত থাকবে না। কেঁদে কুলকিনারা পাবে না। শীগগির শীগগির। দেবরতনকে হারাতে না হয়! শুভ্রাঞ্জন!

শুভ্রাঞ্জন! এ নামে সারা দেহ রোমাঞ্চ হয়ে উঠল চন্দ্রশোভার। শীতল শিহরণ মেরুদণ্ডের ভেতরে।

বাতাসে কথা কইছে কে কানের কাছে মুখে এনে। ফিসফিস করে। শুভ্রাঞ্জনকে বাঁচাও চন্দ্রশোভা। দেবরতনকে বাঁচাও। বাঁচাও।

পাথরের টুকরোয় ঘা খেয়ে খেয়ে, পড়িমরি করে যতটা পারা যায় চলার গতি বাড়িয়ে দিতে দিতে চলেছে চন্দ্রশোভা। বেশি পথ নয়, ওর যেন মনে হচ্ছে—অনেক, অনেক সময় লাগছে। ঠাণ্ডায়ও ঘেমে উঠছে। চলা থামালে চলবে না। অকালে চলে যাবে দুটো প্রাণ।

স্বপ্নমায়ার মনস্কামনা পূর্ণ হতে দেবে না চন্দ্রশোভা কিছুতেই।

চন্দ্রশোভার পা আর চলছে না একদম। একি দেখছে সে! পাহাড়ের উঁচুতে যে পাথরটা খিলেনের মতন হেসে রয়েছে, ওই দিকে ঝুঁকে পড়ছে দুজনে। ওরা ভয়ঙ্করী স্বপ্নমায়াকে চিনতে পেরে, বুঝতে পেরে পালিয়ে আসছে।

পালিয়ে নিয়ে আসছে কে?

চন্দ্রশোভা নিজেই না? হ্যাঁ, তাইতো!

উদ্ধারে অক্ষম নিচের চন্দ্রশোভা নির্বাক রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে দেখছে অবাক চোখে। নড়নচড়ন রহিত। হতভম্ব। প্রাণহীন কাঠের পুতুল একটা দাঁড়িয়ে আছে যেন। মাটির তলায় দুপা পুঁতে দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে কে!

পাথরের খিলেনটায় আশ্রয় নেবার জন্য ওপর থেকে অতি সন্তর্পণে অতি সাবধানে নিচের দিকে নামবার চেষ্টা করছে শুভ্রাঞ্জন।

ভয়ে চিৎকার করে উঠল ওপরের চন্দ্রশোভা! স্বপ্নমায়া দেখে ফেলেছে। আসছে। এসে পড়ল যে। ত্রাসে আলগা হয়ে গেল দু'হাত শুভ্রাঞ্জনের। শূন্য থেকে একেবারে মাটিতে—আকাশের নক্ষত্র খসে পড়ল বুঝি শুভ্রাঞ্জনের মধ্য দিয়ে।

দুচোখে হাত চাপা দিয়ে কেঁদে উঠল ওপরের চন্দ্রশোভা। বসে পড়েছে।

বসে পড়েছে নিচের চন্দ্রশোভাও। দুচোখে হাতচাপা দিয়ে চিৎকার
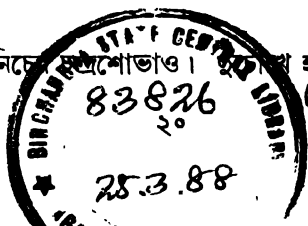
করে কাঁদছে। দুজনের বুকফাটা কান্না একজনের ব্যথার সুরে বেজে উঠছে। ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। কে আছ বাঁচাও! বাঁচাও, বাঁচাও।
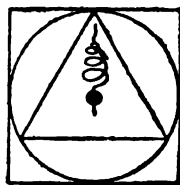
চন্দ্রশোভার করুণকান্না শুনে দৌড়ে চলে এসেছে অরুণিমা-দেবরতন। চন্দ্রশোভা নিজের ভয়ের ছায়া ভেবেছিল, সে-ও হাজির হয়েছে সশরীরে। স্বপ্নমায়া।

চন্দ্রশোভাকে জড়িয়ে ধরে, স্বপ্নমায়া বলেছে, মিছিমিছি এভাবে কাঁদছিস চন্দ্র! যে যায় সে আর ফিরে আসে না। শুভ্রাঞ্জনের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। ওই সময় ওই ভাবে, অবধারিত মৃত্যু ছিল তার। দেহ তার গেছে বটে কিন্তু আত্মা অমর। কত বুঝিয়েছি।

দু'চোখ থেকে হাত নামিয়েছে চন্দ্রশোভা। নির্নিমেষ নয়নে দেখেছে শুধু স্বপ্নমায়াকে। বেশ কিছুক্ষণ দেখেছে। মুখে ভাষা নেই, চোখে জল নেই। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছে—সত্যি সত্যি তুই বেঁচে আছিস স্বপ্ন?

—কেন মরব, কোন দুঃখে মরব! বেঁচে থাকলে কত মানুষের সান্ত্বনা-শান্তি হয়ে থাকব বল তো।

—পোড়া সান্ত্বনা পোড়া শান্তি। লোকের অদৃষ্ট পুড়িয়ে দিয়ে—

—কে কার অদৃষ্ট পোড়ায়! পোড়াবার ছিল, পোড়ে।

—স্বপ্ন।

—বল।

—অরুণিমা-দেবরতন তোরও তো মেয়ে-জামাই!

—কে কার মেয়ে, কে কার জামাই। সব আত্মা। ও হাড়-চামড়া কিচ্ছু না। সম্পর্ক কিচ্ছু না। পরমাত্মা থেকে তোর-আমার সকলের আত্মা এসেছে। সব আত্মাই এক। পৃথক পৃথক ভাবিস কেন?

এটাই মহামায়ার মায়া। মায়মুক্ত হ'। আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার জামাই—আমার আমার করিস নি। চিন্তা করে দেখ দিকিনি, তোর শরীরটাই কি তোর! মায়া মায়া মায়া। জগৎ মিথ্যে। সেই আদি শক্তি, সেই ব্রহ্মই সত্যি। যা থেকে বিশ্বাচরাচরের সৃষ্টি। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি!

এসব শোনার পর চন্দ্রশোভার বাকরোধ হয়ে গেছে বুঝি। স্বপ্নমায়াকে দেখছে তো দেখছেই।

মাঝে মাঝে চমকে উঠছে।

মুখে-চোখে ত্রাস।

সেই স্বপ্নমায়া! সেই সর্বনেশে একই কথাবার্তা। মনের এতটুকু পরিবর্তন হয় নি। দয়া-মায়া-মমতাশূন্য নিষ্ঠুর মেয়ে। ত্রাসে ত্রাসে প্রবল শক্তিমান পুরুষও শুকিয়ে কাঠ। ওকে দেখলে, কালবিলম্ব না করে, মেয়েরা যে যার ঘরে পালিয়েছে। তবু ওর কোপ থেকে রেহাই পেয়েছে কি কেউ?

পায় নি। রাতে ওর কণ্ঠস্বর শুনে, ওকে দেখে অনেকের বুকের রক্ত শুকিয়ে গেছে। তাদের সুখের দুনিয়ায় নিশ্চিত অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে এবার।

কপাল চাপড়ে কেঁদেছে ওরা। কান্নাই সার হয়েছে। ফল কিছু হয় নি। হাতে ধরে পায়ে ধরে কত না বোঝানো। তবু বোঝেনি স্বপ্নমায়া। বুঝতে চায়ও নি। জেনেশুনেই তো সবকিছু করে ও। এটা ওর স্রেফ নির্দয় খেলা, না পাগলামো, না প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার প্রয়াস।

কেমন করে জানবে কে?

নানা লোকে ধারণা নিয়ে নানা কথা বলে বেড়ায়। কথা যে কানে যায় না, তা নয়। যায়। মুখ টিপে হাসে স্বপ্নমায়া। আড়চোখে দেখতে দেখতে স্থান ত্যাগ করে তখুনি।

বাড়িতে ভয়ের ছায়া নামে। ভয়ঙ্কর রাতে ছবি দেখে সকলে। আপনজন আপনজনকে সাবধান করে দেয়। দেবতার নাম স্মরণ করতে

বলে বিছানায় ঘুমোতে যাবার সময়। শুয়ে, প্রিয় দেবতার মূর্তি ধ্যান করতে করতে ঘুমোতে বলে।

তাতেও কোন লাভ হয় না।

যা ঘটবার তাই ঘটে। যা হবার তাই হয়।

স্বপ্নমায়াকে নিয়ে বাড়ির সকলে ভীতসন্ত্রস্ত। ও একটা সাক্ষাৎ অমঙ্গল। সাক্ষাৎ বিভীষিকা। ওকে নিয়ে মহাবিপদ বাড়িসুদ্ধ লোকের। কোথায় পাঠানো যায়! কোথায় রাখা যায় নিশ্চিন্ত হবার জন্য।

দু'এক জায়গায় পাঠিয়ে দিয়ে কি হেনস্তা, কি বদনাম স্বপ্নমায়ার মা-বাবার। ভোর না হতেই ফেরৎ দিয়ে গেছে স্বপ্নমায়াকে ওরা।

এমন মিষ্টি নাম এমন সুশ্রী-সুন্দর মেয়ে। মুখখানা কত সরল, কিন্তু ভেতরে এত গরল। চাউনি-চোখ দেখে কে না বলবে—এ মেয়ে নির্ভেজাল নির্দোষ। লোকে মিথ্যে অপযশ করে।

মেয়েকে নিয়ে মায়ের মনে সুখস্বস্তি নেই একটুও। অনেকের কাছ থেকেই বিদ্রূপের বাণ এসে বিঁধে বিঁধে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় তাকে।—আহা, কি রত্নগর্ভা। লক্ষ্মীঠাকরুণকে পেটে ধরেছে।

আবার কেউ কেউ বলে ওকে, আম'লো যা! লক্ষ্মীঠাকরুণ হতে যাবে কেন? লক্ষ্মীর বোন—অলক্ষ্মী।

শুনতে শুনতে মায়ের কান ঝালাপালা। মেয়ের ভাল করতে গিয়ে একি কাণ্ড করে বসল সে নিজে। গয়ায় যদি না নিয়ে যাওয়া হত মেয়েটাকে, তাহলে এমনতর তো হত না। ত্যাগানন্দের সঙ্গে দেখা হওয়াটাও একটা ধূমকেতুর আবির্ভাবের মতন।

মেয়ের মধ্যে কি যে দেখ কে জানে। কি যে বোঝালো মা তার কোন মর্মই বুঝল না। ওখান থেকে ফিরে আসার পরই যত অনাসৃষ্টি। মেয়েকে নিয়ে বাড়িতে হুলুস্থূল। তুলকালাম কাণ্ড। যে স্বপ্নমায়া প্রত্যেকের মুখের পান ছিল, প্রত্যেকের প্রাণের প্রাণ ছিল, সে সবার চোখের বিষ। মুখঝামটা আর দূরছাই ছাড়া কোন প্রাপ্য যেন নেই আর।

সকলে বলে—বিদেয় কর বিদেয় কর। বলা খুব সহজ। মা কি সহজে পারে?

বড় জা'র বাপের বাড়ির দেশে ডোমজুড়ে কে একজন সন্ন্যাসী এসেছে। মাটির দেয়াল দেওয়া খোড়োচালের ঘরখানা আলো করে বসে আছে দিনরাত। সাধুবাবার কৃপায় কত অসাধ্যসাধন হয়ে যাচ্ছে কত লোকের। নিয়ে গিয়ে দেখলে কেমন হয়!

বড় জা'র হিতোপদেশ মায়ের কানে প্রবেশ করে মর্মে পৌঁছেছে। তবে ইতঃস্তত করছে নিয়ে যেতে, একটু ভয় আছে বলে। ভয়টা অমূলক নয় কিন্তু। এক সাধুর সঙ্গে যোগাযোগ করে তো এই বিপত্তি। আবার সাধু-সন্ন্যাসী! এক তো মেয়েকে নিয়ে বাড়ীতে টেকা দায়, এরপর আবার অন্য নতুন উপসর্গ দেখা দিলে, মায়ে-ঝিয়ের বনে গিয়ে বাস করতে হবে।

বড় জা বলেছে মাকে, মেয়ে মেয়ে করে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে তোমার ছোটবৌ! মাথার ঠিক কর। তোমার ত্যাগানন্দের কারিকুরিটা এর কাছে ধরা পড়তেও তো পারে। কাটানকোটান না করলে এই রকমই চলতে থাকবে নাকি! একজনের জন্য বাড়িসুদ্ধু মরতে বসেছে। একটু আক্কেল-বিবেচনা থাকা উচিত তোমার।

অগত্যা জায়ের সঙ্গে স্বপ্নমায়াকে নিয়ে মা গেছে সন্ন্যাসীর আস্তানায়।

স্বপ্নমায়ার ইচ্ছে ছিল না। ত্যাগানন্দ ছাড়া জগতের কাউকে আর সে জানে না। জানতে চায়ও না। সে যা করছে, ঠিকই করছে। ক'রে যাবেও। কারো কোন কথা শুনবে না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর একদিকে আর ত্যাগানন্দ-স্বপ্নমায়া একদিকে। দেখা যাক, কে কি করতে পারে। এর মধ্যেই সকলে পপাত ধরণীতলে। তাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

মায়ের জোরজবরদস্তিতে সন্ন্যাসীর কাছে এসেছে স্বপ্নমায়া। সন্ন্যাসীর নাম শুনেই আঁতকে ওঠার কথা। মহামারী ভৈরব।

এমন নাম কেন হল ?

সন্ন্যাসীর উত্তর—নিজেই নিজের নামকরণ করেছি। অনেক বুঝে-সুঝে, অনেক চিন্তাভাবনা ক'রে নিজের মাথা থেকে বার করেছি। মহামারীব্যামো যেমন লোকের প্রাণহরণ করে। আমিও সবার অনিষ্টহরণ করি।

হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠল মহামারী ভৈরব। বিচ্ছিরি লাগল স্বপ্নমায়ার। গাঁজার গন্ধে ঘর ভরপুর। ঘরের চারদিকে চারটে গর্ত। মাটির মেঝে খুঁড়ে করা। চারটেতেই লম্বা-লম্বা কাঠ জ্বলছে। মহামারী ভৈরবের সামনের গর্তটায় কাঠের আগুন নিভেছে। কাঠকয়লার লাল আগুনের তাপ রয়েছে বেশ। লাল-কালোর পাশে-পাশে সাদা-সাদা ছাই।

মহামারী ভৈরব খুক-খুক করে হাসছে। ভুঁড়ি নাচছে। লাল কপিন পরা। রঙ মিশমিশে কালো। পিঠ বোঝাই চুল। মুখে কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ। ঢুকষ বেয়ে পানের পিক গড়িয়ে পড়ছে বুকে। মহাশঙ্খের মালা বুকে ঝুলছে। কঙ্কালের আঙুলের পর্ব কেটে কেটে মালা গাঁথা। একটা মানুষের কঙ্কালের ওপর বসে।

মহামারী ভৈরব ধরাগলায় কারণবাড়ি চুমুক দিতে দিতে বলল, পিশাচিন্যৈ স্বাহা। মুখ দিয়ে একটা শব্দ বার করল, হুন্।

স্বপ্নমায়ার দিকে তাকিয়ে হি-হি করে হাসল। বলল, কোথায় এসেছিস্? এ্যাঁ, কোথায় এসেছিস্! শ্মশান, শ্মশান। মহাশ্মশানে এসেছিস্। চারটে চিতা জ্বলহে চারদিকে দেখতে পাচ্ছিস না? এ্যাঁ!

স্বপ্নমায়া নিরুত্তর।

পাছে মেয়ের ওপর ভৈরবের কোপ পড়ে, ভয়েভয়ে মা ঘাড় নেড়ে বলেছে, হ্যাঁ ভৈরববাবা, দেখতে পাচ্ছি আমরা।

—তোকে কে উত্তর দিতে বলেছে? যাকে জিজ্ঞেস করছি, সে কি কালা-বোবা!

ধমক খেয়ে মা চুপ। স্বপ্নমায়ার জ্যাঠাইমার মুখ ফ্যাকাশে। গলায়

কাপড় দিয়ে জোড়হাতে বসে। মা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছে বার বার নাক-কান মলে মলে।

স্বপ্নমায়ার এসব ভাল লাগছে না। ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

ভৈরব বুক কাঁপানো হুঙ্কার দিয়ে উঠল। উঠে দাঁড়াল। সব কটা আগুন প্রদক্ষিণ করে নিজের জায়গায় এসে বসল। চোখ বুজে রইল খানিক। তারপর বিড় বিড় করে বলতে লাগল—ভৈরব তুই এসেছিস। এঁ্যা, কি বলছিস? ওঃ, বলছিস না, আদেশ করছিস! হুঁ, হুঁ। ভৈরবী, ভৈরবী। কে, কে? ওহো, আজ এসেছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। পূর্বজন্মের ভৈরবী ছিল। ও! হো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওর নাম? নাম? স্বপ্নমায়া, স্বপ্নমায়া।

ঘরময় উগ্রগন্ধ। মড়ার খুলিতে বার বার কারণবারি পান করছে ভৈরব আর রাঙাচোখে দেখছে খালি স্বপ্নমায়াকে।—এ মেয়ে শাপভ্রষ্টা ভৈরবী। সংসারের জন্য নয়, বুঝলি? মাকে উদ্দেশ করে বলল ভৈরব।

—যে সংসারে থাকবে এ মেয়ে। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেবে। বংশে বাতি দিতে কেউ আর থাকবে না। ও শ্মশানচারিণী। শ্মশানেই এর বাস!

মায়ের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল জ্যাঠাইমা— ঠিকই বলছে তো ভৈরব। যা কাণ্ড হতে চলেছে, ছন্নছাড়া হয়ে যাবে একান্নবর্তী পরিবার। ভৈরবের কথাই ঠিক ফলবে। শেষে, বংশে বাতি দিতে থাকবে না কেউ আর। একটা মেয়ের জন্য বংশ লোপ?

জ্যাঠাইমা উঠে গিয়ে সাধুর পায়ে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।—রক্ষে করুন বাবা, রক্ষে করুন। একটা বিহিত করুন বাঁচবার।

হে-হে-হে-হে—হেসে উঠেছে ভৈরব। এসে যখন পড়েছিস, তখন তোদেরও ব্যবস্থা হবে নিশ্চয়। আর স্বপ্নমায়ার? দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, ওর জন্মান্তর জাগিয়ে তুলতে হবে ক্রিয়া-

কলাপে। শুনলি তো ভৈরব কি বলল? ও ভৈরবী ছিল। নিজের বুকে হাত ঠেকিয়ে, হেসে উঠল।

স্বপ্নমায়া ওঠবার জন্য উসখুস করছে। পেছন থেকে আস্তে আস্তে মায়ের আঁচল ধরে টানছে। আর নয়, উঠে পড় এবার। ভৈরব দর্শন খুব হয়েছে।

ভৈরবের চোখ সব দিকে।—অত ছটফট করছিস কেন? এখানেই থাকতে হবে তোকে, বুঝলি! কোন জায়গায় স্থান নেই তোর। মনে পড়বে, মনে পড়বে।

আবার হে-হে করে হেসে উঠল। সেই আমি, সেই তুই। মনে করে ছ্যাখ। ছ্যাখ।

জ্যাঠাইমার মাথাটা পায়ের ওপর থেকে যত্ন করে তুহাতে তুলে ধরেছে। বলল, স্বপ্নমায়াকে রেখে যেতে পারিস তোরা।

ভৈরব এতখানি তুঃসাহসী হয়ে উঠবে, ভাবতে পারে নি জ্যাঠাইমা। সারা শরীরের রক্ত মাথায় উঠে গেছে বোধ হয়। মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে। গম্ভীর গলায় বলল, গোপনে এনেছি। বাড়ির পুরুষমানুষদের জানিয়ে আসব এবার। তারা মত দিলে, রেখে যাব।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছে জ্যাঠাইমা। এক হাত মায়ের আর এক হাত স্বপ্নমায়ার—তু'জনের তু'হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে বার করে এনেছে কুঁড়ে ঘরের বাইরে।

বাড়িতে এসে মাকে-স্বপ্নমায়াকে জ্যাঠাইমার নিজের গা ছুঁইয়ে শপথ করিয়েছে। একথা ঘুণাক্ষরে কারো কানে যেন না পৌঁছয়।

সেই রাতেই স্বপ্নমায়াকে নিয়ে তুলকালাম। মাঝরাতে ঘুম ভেঙেছে জ্যাঠাইমার কাকে কথা কইতে শুনে। ঘুমের ঘোরে কার গলা, প্রথমটা অত ঠিক করতে পারে নি। অপরিচিত-অপরিচিত মনে হয়েছে।

খাটে উঠে বসে তু-চোখের পাতা রগড়ে নিয়ে কান পেতে শুনেছে ভাল করে।—ওমা! এ যে তারই মানুষের গলা যে গো!

বড়বাবু বলছে, কে কার স্ত্রী, কে কার স্বামী! তুচ্ছ, সব তুচ্ছ মায়া।

দেহ কিছু নয়, সংসার কিছু নয়, সম্পদ কিছু নয়। কিস্ছু না, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না।

জ্যাঠাইমার বুক ধড়াস করে উঠেছে।—সর্বনেশে কাণ্ড। আমার কপাল ভাঙল এবার। চোখের কোলে জল টলমল করছে।

খাট থেকে নেমে জ্যাঠামশাইয়ের খাটের কাছে এসে, মশারী তুলে বসেছে। হাতে হাত দিয়ে মৃদুস্বরে ডেকেছে, কি বলছ তুমি? কি বলছ? শুনছ, শুনছ?

ধড়মড় করে উঠে বসেছে জ্যাঠামশাই। অবাক চোখে তাকিয়ে বলেছে, এখানে কেন? শরীর খারাপ নয় তো?

জ্যাঠাইমা মাথা নিচু করে বলেছে, না। টান তোমার ঠিকই আছে। স্বপ্নমায়ার কোন কথা তুমি শুন না। আমাদের সবার ওপর ওর একটা প্রতিহিংসা জেগে উঠেছে। ও কাউকে ক্ষমা করবে না, কাউকে ছাড়বে না। নিজে সুখ-শান্তি পেল না বলে, সকলের সুখ-শান্তি কেড়ে নিতে চাইছে এক এক করে। আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে জ্যাঠাইমা।

—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! সরম আসা উচিত তোমার। একটা নির্দোষ মেয়ের নামে মিছিমিছি অপবাদ। ও যা বলে, ঠিকই বলে। ওর জীবনই তার মস্ত উদাহরণ। প্রায় ওরই বয়সী তো তোমারও মেয়ে আছে। বরং চন্দ্রশোভা মাস পাঁচেকের বড় স্বপ্নমায়ার চেয়ে। কি করে বললে এসব কথা বড়বৌ। একটুও কি মমতা নেই তোমার বেচারীর ওপর!

—বড় ভয় পাচ্ছি বড়বাবু!

—কিসের ভয়?

—পাশের বাড়ির সুনু আর হেনার ব্যাপারটা হাতে হাতে ফলে যেতে মনমরা হয়ে গেছি আমি। সুনুকে দেখলে হেনা ক্ষেপে উঠছে। বলছে, কেন দু'দিনের মায়া দিতে এসেছ। তুমি কিছু নয়, আমি কিছু নয়। সময় থাকতে আত্মসাধনা কর। যে চির-অমর—হারাতে হবে না। হারাবার ভয় নেই। তাকে নিয়েই থাকো তুমি। তাকে নিয়েই থাকবে।

দাও আমাকে। স্বপ্নমায়ার পরিণতি দেখে শিক্ষা হওয়া উচিত।

একটু জোরে নিশ্বাস ফেলে বুকটা হালকা করে নিয়ে জ্যাঠাইমা বলল, সুনুর কাছে হেনা গেলেও, হেনার কথাই নতুন করে শুনতে হচ্ছে সুনুর মুখ থেকে।

বিনয়ের সুরে বলল জ্যাঠাইমা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব কি বড়বাবু? রাগ করবে না তো?

—বলতেই যখন বসেছ, শুনতেই যখন হচ্ছে, যা জমা আছে, বার করে ফেল।

—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তুমি কি বলছিলে, মনে আছে?

—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বলব কেন? চোখ বুজে বলছিলুম। স্বপ্ন এল। বলল, জ্যাঠামশাই! মিথ্যে কষ্ট পাবার আগে মনটা ঠিক করে নিন। আমি যা বলছি, সেটাই কি ধ্রুবসত্য নয়? আমি নিজেই তার একটা জাজ্জ্বল্য প্রমাণ।

—হেনা সুনুরাও এইরকম দেখতো।

চোখের জল মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে জ্যাঠাইমা।

পাশের ঘরে এসে হাজির।

অগাধে ঘুমোচ্ছে চন্দ্রশোভা। খাটের কাছে এসে দাঁড়াল। মশারীতে হাত ঠেকাতে গিয়ে সরিয়ে নিল। ঘুমোক। নিজের অশান্তি ওর মাথায় না ঢোকানো ভালো। কদিন এসেছে বই তো না। শুভ্রাঞ্জন আবার ওকে ছাড়া বেশীদিন থাকতে পারে না একা। কবে না কবে হুট করে এসে নিয়ে যাবে। আটকাবার উপায় নেই। মেয়েছেলেকে শ্বশুরবাড়িতে যেতে হবেই তো।

ফিরে এসেছে ঘরে।

বড়বাবু ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশ্চিন্তে নাক ডাকছে। কে জানে ভেবে নিয়েছে কিনা—কেউ কারো নয়, নিজেই নিজের।

সন্তর্পণে পা টিপে টিপে বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছে। কান্না থামাতে পারে নি। বাকি রাতটুকু চোখে পাতায় এক করতে পারে নি। পাতা ভিজে জল উপচে পড়েছে কেবল।

ভোর বেলায় বারান্দায় যেতে যেতে স্বপ্নমায়ার সামনাসামনি এসে পড়েছে। স্বপ্নমায়ার মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল। জ্যাঠাইমা! এত সকালে তো ওঠো না! আজ?

—তোর সঙ্গে কথা আছে। ঠাকুরঘরের দালানে আয় একবার।

জ্যাঠাইমার পেছু পেছু সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় এসেছে স্বপ্নমায়া। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে আবার উঠেছে চারতলার ছাদে। ঠাকুরঘর। দালানে এসে বসেছে তুজনে।

স্বপ্নমায়ার হাত ধরে জ্যাঠাইমা বলেছে, চন্দ্রর মতন তুইও আমার আর একটা মেয়ে। কেমন, তাই না?

—হ্যাঁ, তাই।

—তোর জ্যাঠাইমার কথা রাখ মা। জ্যাঠামশাইয়ের মাথায় ওসব ঢোকাস নি আর। কাল রাতের ব্যাপারে আমার বুক শূন্য হয়ে গেছে রে। কেঁদে ফেলেছে জ্যাঠাইমা।

স্বপ্নমায়া শান্তগলায় বলেছে, জ্যাঠাইমা, কেন কষ্ট পাবে পরে। তোমরা কেউই পৃথিবীতে থাকবে না। কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী। আত্মাই সব। আত্মাকে চেন, ভালোবাস। আগে থেকে জানা থাকলে, পরে আর হায় হায় করতে হবে না। আমাকে দেখেই বোঝ। আমার কেউ আছে, কিছু আছে? আমিই আমার। সে আমি আত্মা-প্রাণ। তুচ্ছ-দেহ নয়। দেহ নয়।

সকাল গড়িয়ে তুপুর এসেছে। তুপুরও চলে গেছে বিকেলকে এগিয়ে এনে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমেছে। পরে এসেছে রাত। আরো পরে মাঝ রাত।

কাল বড়বৌয়ের ঘুম ভেঙেছিল বড়বাবুর কথা শুনে! আজ বড়বাবুর ঘুম ভাঙল বড়বৌয়ের কথা শুনে।···কে কার স্বামী···কে কার স্ত্রী। স্বপ্নমায়া? তুমি এসে ঠিক বলেছ।
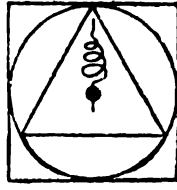
সত্যিসত্যিই কি স্বপ্নমায়া গভীর রাতে বাড়ির এক একজনের ঘরে এক একদিন করে আসে? জ্যাঠা-জেঠী, কাকা-কাকী, বাবা-মা, দাদা-বৌদি—এদের জনায়-জনায় নির্দেশ দিয়ে চলেছে কি—কে কার…?

প্রতি ঘর জাগবে রাতে। সেই পরামর্শই করেছে সবাই মিলে। ধরা পড়লে উচিত মতো শিক্ষা দেয়া হবে স্বপ্নমায়াকে। ওর গুরুদেব ত্যাগানন্দের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে। ত্যাগানন্দের জন্যই সকলের মন কেমন উদাস উদাস। এতদিনের গড়ে ওঠা ভাব ভালোবাসার মজবুত ভিত ধসে যেতে বসেছে। বসেছে কেন—ধসে পড়ছে।

সকলেই পর পর, ছাড়া ছাড়া ভাব। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যেখানে, একজন অন্য বিহনে প্রাণে বাঁচবে না, সেখানেও এমন ফাটল ধরেছে—কেউ কাউকে চেনে না যেন। মন থেকে মায়া গেছে, মমতা গেছে, দয়া গেছে—এসব যদি গেল, সংসারে আর রইল কি?

আশপাশের প্রতিবেশীরাও ভয়ে তটস্থ। দেবতার কাছে মাথা খুঁড়ছে আর মানত করছে—হে ঠাকুর। স্বপ্নমায়া যেন এবাড়ির ত্রিসীমানায় ভুল করেও পা না দেয়। কারো স্বামীর নজরে, স্ত্রীর নজরে, ছেলে-মেয়ের নজরে যেন না পড়ে।

মা কত বুঝিয়েছে মেয়েকে, কত আক্ষেপ করেছে।—কি মেয়েই গর্ভে ধারণ করেছে! নিজের মা-বাবাতে বিচ্ছেদ বাধাল। কর্তা তো মুখের দিকে তাকায় না আর। সংসার ভেঙে যাক, উচ্ছন্নে যাক—কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাবাকে বলেছে মা, একি ব্যারাম হল বল তো তোমাদের! সব যে জাহান্নামে যেতে বসেছে।

বাবা জবাব দিয়েছে, কিছুই থাকবে না। ভাবনার কিছু নেই।

নিজের দেহই নিজের নয়। কি শান্তিই পেয়েছি স্বপ্নমায়ার এই মন্ত্রে। কোন আকর্ষণ নেই, কোন বিকর্ষণ নেই। মা আমাদের মোহ মুক্ত করবার জন্য এসেছে। সাক্ষাৎ মহামায়া। এ সংসার ধন্য, এ জীবন ধন্য এমন মেয়ে পেয়ে। জ্ঞানচক্ষু খুলে দিচ্ছে মা আমার।

মাকেও বাবার কথায় সায় দিতে হয়েছে পরে। যেদিন রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নমায়ার কথা শুনতে পেয়েছে। স্পষ্ট শুনেছে। যেমন কানের কাছে মুখ এনে কেউ কিছু বললে শোনায়, তেমনি। দেখেছেও স্বপ্নমায়াকে। তন্দ্রাজড়ানো চোখে নয়। ঘুম ভাঙা স্বাভাবিক চোখে। পরিষ্কার।

সবাই চুপি চুপি শলাপরামর্শ করে স্থির করল, স্বপ্নমায়াকে তালা-চাবি বন্ধ করে রাখা হবে ঘরে। তারপর যে যার কামরায় জেগে বসে থাকবে। কোথা দিয়ে কি ভাবেই বা লোকচক্ষের আড়ালে স্বপ্নমায়া আসা-যাওয়া করে—দেখতে হবে। কোন্ পিশাচ কোন্ পেতনী ওর মাথায় দেহে ভর করে, ওকে এঘর ওঘর করায়—এর কাছে ওর কাছে নিয়ে নিয়ে ঘোরায়—দেখতে হবে। বিহিতের রাস্তা একটা না একটা বেরোবেই বেরোবে।

নিঝঝুম নিশুতি রাত।

প্রতিটি ঘর রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে স্বপ্নমায়ার জন্য। স্বপ্নমায়া নামের জপ চলেছে ওদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে। প্রকৃতির প্রতিপত্তিকে কতক্ষণ প্রতিরোধ করে রাখতে পারে মানুষ।

একচিন্তায় থাকলে বেশীক্ষণ এমনিতেই অলসনিদ্রার আমেজ আচ্ছন্ন করে ফেলে সারা শরীর মন। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হল না কোন।

ঢুলঢুলু চোখ হয়ে এল প্রায় প্রত্যেকের। আর ঠিক সেই মুহূর্তে স্বপ্নমায়ার কণ্ঠস্বর স্বপ্নমায়ার উপদেশ শুনতে পেল ওরা। সচেতন হয়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। আর দেখেছেও স্বপ্নমায়াকে তখুনি। চোখে-মুখে কৌতুকের হাসি।

তিনতলার লোকেরা নেমেছে দোতলায়। দোতলার লোকেরা সঙ্গ

নিয়েছে তিনতলার। দল বেঁধে স্বপ্নমায়ার উত্তুরে ঘরের দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত সকলে।

আশ্চর্য! দরজা তেমনি তালাবন্ধ।

পুরুষরা অন্য ধারে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। মা-জ্যাঠাইমা আর চন্দ্রশোভা ভেতরের জানলার রেলিংয়ের পাশ দিয়ে ধবধবে সাদা পরদা সরিয়ে বড় বড় চোখ করে দেখেছে ঘরের ভেতর। পেতলের স্প্রীংয়ের খাটের ওপর শুয়ে স্বপ্নমায়া। টর্চের আলোয় নড়েচড়ে ওঠে নি একবারের জন্য। স্থির-ধীর অচঞ্চল দেহ।

সবুজ জমিতে শ্বেতপদ্ম বোনা চাদরে মোড়া বিছানায় ও-ও যেন একটা বড় শ্বেতপদ্ম। ফুটে উঠেছে সদ্য। মুখে নির্মল জোছনা। চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে পরিতৃপ্তি প্রশান্তি।

নীরবে এসেছিল যারা, নীরবেই ফিরে গেছে তারা। মেয়েটা তো নিঃসংশয়ে নির্দোষ। নিশ্চয় কোন গোপনরহস্য লুকিয়ে রয়েছে এর পেছনে। স্বপ্নমায়ার রূপ ধরে আসা-যাওয়া করে রাতে। আদেশ-উপদেশ দেয় ওর কণ্ঠস্বর নকল করে। নিশ্চয় কোন অতৃপ্ত অপদেবতার কাজ এটা। অনেকের মাথায় এ চিন্তাটাও দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

অপদেবতাটা কে হতে পারে? বাসনা-কামনা নিয়ে যে জ্ঞাতি শত্রু মরেছে, সেই কারো সুখ সহ্য করতে পারে না বলে, মরে গিয়েও শত্রুতা করছে। সরাসরি বিচ্ছেদ বাধাচ্ছে।

কারো কারো আবার এ মন্তব্যটা মনঃপুত হল না। বললে, স্বপ্নমায়াকে সামনে রেখে এমন কোন জ্ঞাতি-শত্রু নির্মম খেলা খেলবে বলে মনে হয় না। ওর দুঃখে শত্রু-মিত্র সবাই দুঃখী। সকলেই ওর ব্যাপারে বিশেষ সহানুভূতিশীল।

কপালে তর্জনীর তিনটে টোকা মেয়ে জ্যাঠাইমা বলল, আমার মাথায় একটা এসেছে বাপু। বিচার করে ছাখ তোমরা ঠিক কি বেঠিক।

শ্রোতারা নামানো চোখ তুলে হাঁ-হাঁ করে উঠেছে। একটা বুকভাঙা নিশ্বাস ফেলল জ্যাঠাইমা। ঘরে শোকের আবহাওয়া। কাঁদো কাঁদো

গলায় বলল—মুখখানা মনে পড়লে আমার বুক ফেটে যায়। তার নামে বলতেও কেমন বাধছে মুখে।

সকলের মুখের ওপর একবার করে চক্কর দিয়ে ফিরে এল জ্যাঠাইমার দুচোখ। ছলছলে চোখে বলল, কি সুন্দর মুখশ্রী। কি মধুঢালা কথা। আহা, বাছারে।

চন্দ্রশোভা বুঝতে পেরেছে, মা কি বলতে চাইছে, কার কথা বলতে চাইছে। বাধা দিয়ে বলল, মা! তোমাকে আর বলতে হবে না। ত্যাগানন্দের মুখেই শুনেছি, ভালোরা মরে যাবার পরও লোকের ভালোই করে, তারা সৎ-আত্মা। এখানে যারা মন্দ, তাদেরই ভয় বেশী। তারা লোকের ভালো দেখতে পারে না। অনিষ্টের চিন্তা নিয়ে মরে বলে, চলে গিয়েও মানুষের অনিষ্ট করবার চেষ্টা করে।

বাবার মুখের দিকে তাকাল চন্দ্রশোভা।

বাবা ঘাড় নেড়ে মেয়ের পক্ষে সমর্থনই জানাল। চন্দ্র যা বলেছে, সেটাই ঠিক।

পাশের বাড়ির সুনু-হেনা—ওরাও এসেছে ভুক্তভোগী বলে। স্বপ্নমায়ার শিকারীদৃষ্টির বলি হয়ে।

হেনা বলে বসল, চন্দ্র! মাসিমাকে কথাটা শেষ করতে দিলে না তুমি? অবাক কাণ্ড। এতগুলো লোক সবাই উৎকণ্ঠায় ভুগছি। বলা যায় কার মাথা থেকে কি সত্যি বেরিয়ে আসে! মাসিমাকে বলতে দাও! মাসিমার যুক্তিটা একেবারে ফেলনা নয়। আমরাও অনেক জ্ঞানীগুণীর মুখে শুনেছি, কামনা-বাসনা পূর্ণ হবার আগেই মারা গেলে মুক্তি হয় না। অতি প্রিয়জনকে আশ্রয় করে যত গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে বেড়ায়। নিজে সুখী হতে পারে নি বলে, সুখীলোকের ওপর যত রাগ।

—এ আমি বিশ্বাস করি না! যত সব মনগড়া ব্যাপার। বিরক্তির রেখা ফুটে উঠেছে চন্দ্রশোভার ভুরুর মাঝখানে।

—শাস্ত্রেও তো একথা লেখা আছে। কিছুই বিশ্বাস কর না দেখছি। যাক, তোমার তো কিছুই হয়নি ভাই! ঈশ্বর করুন না হোক। আমাদের মানসিক অবস্থা যা, এর কূলকিনারা খুঁজে বার করতেই হবে।

বিশ্বাস করি না বলে, হাত-পা গুটিয়ে নির্বিকার হয়ে বসে থাকলে চলবে না।

জ্যাঠাইমা নামটা উচ্চারণ করবে এবার, মুখ খুলতে যাচ্ছে। আতরমণি হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মেঝেয় এসে আছড়ে পড়ল।

জ্যাঠাইমাকে উদ্দেশ করে বলল, এ বাড়িতে আর আমি থাকবুনি। ঘুম আসছে চোখে, সোপনদি গিয়ে হাজির। কি সব্বনেশে কথা। বলল —তোর বুড়ো তো যাবেই একদিন। মিছে কাঁদিস কেন? বুড়োকে ভুলে যা।

চোখ মুছে, কেশে নিয়ে বলল আতরমণি, পোড়ারমুখো মিনসেও সোপনদির কথা শুনে নাচছে একেবারে। বলে—ও বুড়ি! তুইও থাকবি না, আমিও থাকব না। ভাবনার কিছু নেই। বুড়ো আবার চৌকিতে বসে বসে গান ধরে দিল।—'ভেবে দ্যাখ মন, কেউ কারো নয়, একবার মুদলে আঁখি'।

আক্ষেপের সুরে বলল আতরমণি, আর নয়, আর নয়। আমার খুব হয়েছে। পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দাও মা! দেশেঘরে চলে যাই প্রাণ নিয়ে, বুড়োকে নিয়ে। এ বাড়িতে ঢুকেছেলুম—বাচ্চা তখন। বুড়ো হয়ে গেলুম। আর থাকা চলবেক না। চলবেক না।

সকলের মুখ থমথমে হয়ে উঠেছে। হেনা আড়চোখে চেয়ে দেখল চন্দ্রশোভার দিকে। চন্দ্রশোভা মুখ নামিয়ে নিয়েছে। দৃষ্টি মেঝেয়। কি যেন কি ভাবছে।

একটু খোঁচা মারার সুযোগ নিতে ছাড়ল না হেনা। বলল—এক-একটা ঘটনা যা ঘটছে, এসবও অবিশ্বাস কর নাকি চন্দ্র?

মুখ তুলে কিছু বলতে যাচ্ছিল চন্দ্রশোভা, ও-ও ছাড়বার পাত্রী নয়, বলা আর হল না। জ্যাঠাইমা চাপা গলায় সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিল। স্বপ্ন আসছে এই দিকে।

তর্কাতর্কি যুক্তিবিচার রহস্য খুঁজে বার করা—সব শিকেয় উঠল। তাড়াতাড়ি সরে পড়ল সেখান থেকে সকলে। হদিশ বার করে আর কাজ নেই। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

ফাঁকা ঘরে একমাত্র দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রশোভা।

স্বপ্নমায়া এল বারান্দায়। ঘরে প্রবেশ করছে। ভেতরে এক পা রেখেই, থমকে গেল একটু! চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার।—এরা সব গেল কোথায়? আশ্চর্য হয়েই চন্দ্রশোভাকে জিজ্ঞেস করল।

চন্দ্রশোভা মৌন। দেখছে স্বপ্নমায়াকে! এ কোন্ স্বপ্নমায়া।

ভেতরে এসে জড়িয়ে ধরেছে চন্দ্রশোভাকে।—কিরে, কথা কইছিস না কেন? তোর আবার কি হল!

হাসছে স্বপ্নমায়া!

—আমাকে কি এত দেখছিস! ছোটবেলা থেকে দেখে দেখেও মনে রাখতে পারলি না। তোকেও নতুন করে দেখতে হয় চেনবার জন্য। হায় আমার পোড়া বরাত!

বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠেছে চন্দ্রশোভার। এ তো ছায়া নয়। যে স্বপ্নমায়া তাকে স্পর্শ করে রয়েছে, সে সত্যিই। রক্তমাংসের শরীরের তাপ অনুভব করছে চন্দ্রশোভা। বলল—তুই এখানে চলে এলি কেন রে এসময়?

—সকলে মিলে আমায় ডাকল কেন বলতে পারিস?

—ডেকেছে?

—হ্যাঁ, খালি আমার নাম আমি শুনেছি কানে। কোথা থেকে ডাকের আওয়াজ আসছে—শুনতে শুনতে একেবারে এখানে।

সোফায় বসিয়েছে স্বপ্নমায়াকে চন্দ্রশোভা। বলেছে, ছোটবেলায় এক সঙ্গে দু'জনে শুয়েছি কত। দিনের পর দিন। না শুলে ঘুমই হোত না কারো। দু'জনেরই কি কান্নাকাটি।

বিষাদের হাসি হেসেছে স্বপ্নমায়া।

চন্দ্রশোভার ভেতরটা ডুকরে কেঁদে উঠেছে। খানিক চুপ করে থেকে বলেছে, আজ আমার কাছে শো' না।

—শুভ্রাঞ্জন আসে নি আজ?

—তুই কোন খবরই রাখিস না! কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিস দিনকে দিন। জামাই মানুষের শ্বশুরবাড়িতে পড়ে থাকাটা কি ভালো?

হেসে ফেলেছে চন্দ্রশোভা।

বলেছে, আমিই বারণ করে দিয়েছি। লোক না বলে, বৌয়ের আঁচল ধরে ঘুরছে।

খিল খিল করে হেসে উঠেছে স্বপ্নমায়া।

হাত ধরে টানতে টানতে পাশের ঘরে নিয়ে গেল চন্দ্রশোভা।

বাচ্চা ছেলের মতন বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে।

স্বপ্নমায়ার দুচোখ জুড়ে ঘুম আসছে। মাথায় পিঠে মায়ের মতন হাত বুলিয়ে দিচ্ছে চন্দ্রশোভা। ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল স্বপ্নমায়া।

চন্দ্রশোভার চোখের পাতায় ঘুম নামবার নাম নেই। ঘুমোতে ইচ্ছেও করছে না। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে স্বপ্নমায়ার মুখের দিকে। বিধাতা বলে কি কেউ আছে, না কিছু আছে? এমন উজ্জ্বল কপালে কি লেখা! পড়তে জানলে পড়ে দেখত।

হাত-কপাল, জ্যোতিষের ওপর বিশ্বাস নেই। তবু মনে হয়, এত-দিন যখন চলে আসছে, সত্যি থাকলে কিছু থাকতেও পারে। না শিখে পণ্ডিত বলে, তাই হয়েছে অনেকে। কথায় মিল নেই, কাজে মিল নেই। কিছুই মেলাতে পারে না কারো ব্যাপারে। স্বপ্নমায়ার বেলায় হয়েছে যেমন।

জ্যোতিষীরা বলেছে, কি যশোভাগ্য!

হায়, স্বপ্নমায়াকে অপযশের ডালি মাথায় নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে। লাঞ্ছনা-গঞ্জনার একশেষ! পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হোত কবে।

হ্যাঁ, বেঁচে গেছে একবার শুভ্রাঞ্জনের জন্য। শুভ্রাঞ্জনের কার্যকলাপে মদত যুগিয়েছে অবিশ্যি চন্দ্রশোভা। মদত শুধু নয়। সেই অনুরোধ করেছে, প্রেরণা যুগিয়েছে, সাহস দিয়েছে।

শুভ্রাঞ্জন যেন দেবতার প্রসাদীফুল। আর স্বপ্নমায়া? ও যেন দেবতার অঞ্জলি। দুজনের দু'জনের ওপর আকর্ষণ বেড়ে উঠেছে ক্রমে। একজন একজনকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। শুভ্রাঞ্জনের আসার সময় পেরিয়ে গেলে, চন্দ্রশোভাকে প্রশ্নে করে করে নাস্তানাবুদ করে তোলে।

কেন এত দেরী, রাস্তা-ঘাটে কোন বিপদ-আপদ হয় নি তো? শরীরটা যে খারাপ বলে গেছে কাল। চন্দ্র! অসুখ-বিসুখ হয় নি তো রে। বাড়িতে একবার খোঁজ পাঠালে কেমন হয়?

চন্দ্রশোভা সব প্রশ্নের উত্তর একটা কথায় সেরে ফেলে—সে আসবেই।

আনন্দে নেচে ওঠে স্বপ্নমায়া। সজোরে জড়িয়ে ধরে চন্দ্রশোভাকে।

বাইরে থেকে মধুরস্বরে গলার আওয়াজে শুভাগমনবার্তা জানিয়ে দেয় শুভ্রাঞ্জন স্বপ্নমায়াকে।

—ভেতরে আসতে পারি?

—ওহো। অঞ্জন। নিশ্চয় নিশ্চয়।

—একটু দেরী হয়ে গেছে। জানি তুমি ভাববে। পড়িমরি করে আসতে গিয়ে একেবারে মোটরের সামনে। ড্রাইভার বুদ্ধু বানিয়ে ছাড়লে আমায়। গাড়ির মালিক ভদ্রলোক মালিকানা জাহির করার জন্য বোধহয় পানের পিক গিলে রুমালে ঠোঁট ঢেকে একটু কেশে ভারিক্কি চালে বলল, উটকানা নাকি হে ছোকরা। এত ধড়ফড়ানি কিসের! প্রাণটা যে খোয়াতে অকালে।

স্বপ্নমায়া ধপাস করে বসে পড়ল সোফায়। করুণ কণ্ঠে বলল, চন্দ্র! আমার বুকটা একটু চেপে ধর। বড্ড যন্ত্রণা। সব অন্ধকার দেখছি কেন রে? অন্ধকার—

ইদানীং স্বপ্নমায়ার একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ মরব বললে, কারো ভারী অসুখ শুনলে, ও নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। কেবল হারাই-হারাই ভাব ওর। প্রথমে বুকের যন্ত্রণা। তারপর অন্ধকার দেখা। তারপর অচেতন হয়ে পড়া।

চন্দ্রশোভার মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বপ্নমায়াকে নিয়ে। কিছুতেই ওকে শান্তি দিতে পারা যাচ্ছে না। পারা যাচ্ছে না আনন্দ দিতে। ডাক্তার বলেছে, মর্মান্তিক আঘাতের ফল এটা। দেহ-মন তছনছ হয়ে গেছে একেবারে। সহ্যক্ষমতা কমে গেছে খুব। সদাসর্বদা চোখে-চোখে রাখবে। যত্নে-যত্নে রাখবে।

আতরমণি ঘরে ঢুকে থতমত খেয়ে গেছে। ইশারায় চন্দ্রশোভা এক গেলাস জল আনতে বলেছে। নিজের শাড়ির আঁচলে নিজেরই চোখ মুছছে বাঁ হাতে, আর ডান হাতে স্বপ্নমায়ার বুকে হাত বুলোচ্ছে।

অপরাধীমুখে গালে হাত দিয়ে বসে সামনের কৌচে শুভ্রাঞ্জন—কেন বলল সে একথা। বারবার নিষেধ করে দিয়েছে চন্দ্রশোভা। কোন বিপদ-আপদের কথা, এমন কি সম্ভাবনারও কথা ওর কানে তোলা যেন না হয়।

কৌচ থেকে উঠে পড়ল শুভ্রাঞ্জন। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে, ইশারায় জানাল চন্দ্রশোভাকে, ডাক্তার নিয়ে আসবে কি?

একটু নড়ে উঠল স্বপ্নমায়া। হাত নেড়ে শুভ্রাঞ্জনকে বসিয়ে দিল চন্দ্রশোভা।

স্বপ্নমায়া বিড় বিড় করে কি যেন বলছে, চন্দ্র সত্যি বল! ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

জলের গেলাস নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে, হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাশ্মীরী লালকার্পেটের ওপর আতরমণি। লাল নক্সার ধারটা একটু ভিজে উঠেছে। যেন টকটকে তাজা রক্ত।

নজর পড়তেই শশব্যস্ত হয়ে পড়েছে চন্দ্রশোভা। জ্ঞান আসতে শুরু করেছে সবে স্বপ্নমায়ার। দেখে ফেললে, আবার অজ্ঞান হয়ে পড়বে।

আকার ইঙ্গিতে শুভ্রাঞ্জনকে কার্পেট গুটিয়ে ফেলতে বলল শীগগির।

জ্ঞান হতেই চোখ খুলে দেখেছে স্বপ্নমায়া তুজনকে। চন্দ্রশোভা আর শুভ্রাঞ্জন। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে বসেছে!—চন্দ্র! তোরা এরকম করে তাকিয়ে কেন রে! আমার কি হয়েছিল।

ঠোঁটের ফাঁকে হাসি এনে চন্দ্রশোভা বলেছে, কই! কিছু না। তুই ঘুমিয়ে পড়েছিলি একটু।

বারান্দার দিকে তাকিয়ে আছে স্বপ্নমায়া। দৃষ্টি অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। কি যেন কি দেখতে পাচ্ছে। স্পষ্ট দেখল। আকাশে প্লেনটা জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

জ্বলন্ত প্লেনটার কি গতি। এগিয়ে আসছে বারান্দায় পড়বে বলে।

হাঁফাচ্ছে স্বপ্নমায়া! ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। দু'চোখ স্থির। পলক নড়ছে না পর্যন্ত। চন্দ্রশোভা ডাকছে, স্বপ্ন, স্বপ্ন—এই স্বপ্ন!

কে জানে স্বপ্নমায়ার কানে ডাক পেঁাছুচ্ছে কিনা। কোন সাড়াশব্দ নেই। একই অবস্থা।

স্বপ্নমায়া দেখছে। জ্বলন্ত প্লেন থেকে জ্বলন্ত পোশাকে লাফিয়ে পড়ল কে বারান্দায়। 'সুমোহন' ব'লে ভীষণ চিৎকার করে উঠে সোফায় চন্দ্রশোভার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়েছে মাথা। আবার অজ্ঞান।

হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে আতরমণি।

চেতনা মানুষের কবার হয়?

যার চৈতন্য আছে, তার একবারে। যার নেই, তার বার বার ঠকেও হয় কিনা সন্দেহ। এক্ষেত্রে শুভ্রাঞ্জনের অকালে মরণের কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে যেতে মনের দিক দিয়ে যা ধকল গেছে সে আর কহতব্য নয়।

কথাটা কোন গণৎকারের গণনা করে বলা নয়। কোন ডাক্তারেরও মন্তব্য নয়। স্রেফ একটা মোটর মালিকের শাসন। শুনেই স্বপ্নমায়া যেতে বসেছিল।

নাকমলা কানমলা খেয়েছে শুভ্রাঞ্জন। আর এ ধরনের কথাবার্তা কস্মিনকালেও নয়।

এখন জ্বর অবস্থায়ও সুস্থ আছি বলে একবার করে দেখা দিয়ে যায় শুভ্রাঞ্জন। স্বপ্নমায়া খুশী। খুশী স্বপ্নমায়ার চেয়েও চন্দ্রশোভা বেশী।

শুভ্রাঞ্জন এলে, ঘরে বসিয়ে স্বপ্নমায়ার সঙ্গে গল্প করতে বলে. ঘর থেকে বেরিয়ে যায় চন্দ্রশোভা। ওদের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস।

নানা লোক নানা কথা কয়। বলে, চন্দ্র নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারছে। স্বপ্নমায়ার সুখের জন্য নিজের সুখ বিসর্জন দিতে হবে একদিন। হাড়ে হাড়ে টের পাবে তখন। ওর নিজের ননদই কতবার সাবধান করেছে। বলেছে, বৌদি! এটা তোমার ঠিক হচ্ছে না কিন্তু। একটা সমাজ আছে, লোকের চোখ আছে। সবই না হয় ছেড়ে দিলাম।

কিন্তু হেসে আবহাওয়াটা একটু হাল্কা করতে চেয়েছে চন্দ্রশোভা। বলেছে, রাজরাজড়াদের ঘরে দুয়োরাণী-সুয়োরাণীর কত গল্পই না পড়ছি। অত ভাবনা কিসের ঠাকুরঝি ? আমি না হয় তোমার দাদার দুয়োরাণী হয়ে থাকবখ'ন। স্বপ্ন সুয়োরাণী হোক। এতে আমার কোন আপত্তি নেই।

—পরে পস্তাবে। ননদের কথায় বেশ ঝাঁঝ মেশানো।
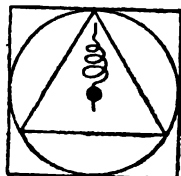
ধারণার সুতোয় অনেক গাঁট পড়ে যায় কথার নানা ফাঁসে। এক কথার অনেক মানে অনেকের কাছে। কথার হেরফেরে কারো কারো আবার নিজের প্রবৃত্তির-প্রকৃতির ছবি ফুটে ওঠে।

তাই চন্দ্রশোভাকে নিয়ে বা শুভ্রাঞ্জন-স্বপ্নমায়াকে নিয়ে কে কি বলল—গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না চন্দ্রশোভা।

অন্যদের সঙ্গে যখন একটা সমাজের বাঁধনে বাঁধা তখন গ্রাহ্য না করলেও, তারা ছাড়বে কেন ? তারা তো গ্রাহ্য করবে সব। দুপক্ষের চিন্তাধারা যদি এড়িয়ে যাওয়া হয়, সে-ক্ষেত্রেই পরস্পরে পরস্পরের কাছ থেকে রেহাই পাবার সম্ভাবনা। নচেৎ নৈব নৈব চ।

এমন বিপদে পড়তে হবে, এমন ঘটনা রটতে পারে—চন্দ্রশোভা কেন, তার বংশের পূর্বপুরুষের কারো মাথায় কখনো আসে নি বোধ হয়। প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে চন্দ্রশোভা। সামলাতে একটু-আধটু নয়, বেশ সময় লেগেছে।

এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত। এমনও হতে পারে মানুষের মন ! মনে হয়েছে চন্দ্রশোভার, সব ছেড়েছুড়ে স্বপ্নমায়াকে নিয়ে যেখানে দুচোখ যায়—সরে পড়বে। এরা এদের হীন মনোভাব নিয়ে থাক। থাকুক। তার যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়। শুভ্রাঞ্জন যদি সঙ্গে যেতে চায়, যাবে।

অবুঝদের নিয়ে থাকলে মর্যাদাহানি, জীবন বিপন্ন—সব কিছু ঘটবে। কিছু কিছু এগোচ্ছেও এরা।

ননদের আদেশ উপদেশ শিরোধার্য করে নি বলে যৎপরোনাস্তি হয়েছে চন্দ্রশোভার। একটা মেয়ে একটা মেয়ের নামে কি করে অন্যায় ভাবে এত অপপ্রচার চালিয়ে যেতে পারে—ভাবা যায় না।

শ্বশুরবাড়ি আর বাপের বাড়ির শুনতে কেউ আর বাকি রইল না। চন্দ্রশোভার নাকি মনোমত কেউ আছে, তা: জন্যই শুভ্রাঞ্জনকে এড়িয়ে চলে। ধড়িবাজ মেয়ে বলেই সাপের মুখে ভেককে নাচিয়ে নিজে ভাল মানুষ সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শুভ্রাঞ্জনটাও নিখাদ নিরেট। মোহিনীশক্তিতে এমন করে রেখেছে, বৌ যা বলবে, তাই শুনবে। কোন প্রশ্নবিচার নেই। মন্ত্রদাতা গুরুর আদেশ পালন করে ধন্য করছে নিজেকে যেন। চন্দ্রশোভার মুখে এক টুকরো হাসি দেখলে একেবারে কৃতার্থ হয়ে যায়। কি যে করবে, ভেবে খুঁজে পায় না কিছু।

মানুষটার এই দুর্বলমনের সুযোগ নিতে চন্দ্রশোভা এতটুকু ভুল করছে না একদম। বাড়িতে এলেই মুখে এক কথা। স্বপ্ন 'শুভ্র শুভ্র' ক'রে ছটফট করছিল একটু আগে। শীগ্‌গির দেখা করগে।

এমন ব্যবহারে কার না মনে সন্দেহের মেঘ জমে উঠবে। কথায় বলে, মেয়েরা স্বামীকে অন্য মেয়ের হাতে তুলে দেবে না মরে গেলেও। বরং যমের হাতে দিতে পারবে। চন্দ্রশোভার বেলায় বিপরীত। স্বপ্নমায়ার রূপ আছে, বয়েস আছে। একটা রঙিন স্বপ্নে ভরপুর তরুণকে তার সঙ্গী ক'রে দেয়া হয়েছে।

যুক্তি কি?

শুভ্রাঞ্জন তো তার চিরদিনের। স্বপ্নমায়ার ভেতরটা বড্ড ফাঁকা। এ সময় ওকে বাঁচাতে গেলে এরকম একটা সঙ্গীর বিশেষ প্রয়োজন।

শুভ্রাঞ্জন কি চন্দ্রশোভার মুখদর্শন করবে আর এরপর?

—করবে না মানে! স্বপ্নমায়াকে চিনতে পারে নি কেউ।

—স্বচক্ষে দেখছে লোকে কাণ্ডকারখানা। এতেও যদি চিনতে না'

পারা যায়, জানতে না পারা যায় তাহলে চিনবে আবার কি করে!

—ওপর-ওপর দেখে কাউকে বোঝা যায় না। অনেক ভুলচুক হয়। মানুষের মনের ভেতর প্রবেশ করতে হবে হিংসা-দ্বেষ শূন্য হয়ে। তবে—

—ওসব কথার বাঁধনেই কাটান দেয়া যায় বটে। রূঢ় বাস্তব বলে না তা।

—না বলুক গে। কি এসে যায় তাতে।

—একথা বেহায়া-নির্লজ্জ আর দুকান কাটাদের মুখেই সাজে। এখনো চেতনা হল না! স্বপ্নমায়া তো নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। শুভ্রাঞ্জনকে ভুলেও কি একবার চন্দ্রশোভাকে নিয়ে বেড়িয়ে আসতে বলেছে?

—বলবার দরকার বোধ করে নি।

—শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকবে কত? কথায়-কথায় নিজেকে নিজেই ধরিয়ে দিচ্ছ।

এইভাবে অবান্তর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে চন্দ্রশোভাকে কতবার। নয় কোন বন্ধুবান্ধব, নয় কোন আপনজনের প্রশ্নবাণে জর্জর হয়ে পড়ছে!

এসব বলি বলি করেও বলতে পারছে না চন্দ্রশোভা। না পারছে স্বপ্নমায়াকে, না পারছে শুভ্রাঞ্জনকে। মুখে বাধে। দুটি সরলপ্রাণে কে নির্দয় আঘাত হানতে চায়। পদ্মের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলতে পারে কি কোন নরম মনের মানুষ? দানব মনের অমানুষ ছাড়া পারে না।

উৎপীড়নে উৎপীড়নে বাড়িতে তিষ্ঠনো দায় হয়ে দাঁড়াল চন্দ্রশোভার। বাবা শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত। মা মেয়ে-জামাই নিয়ে বাইরে বেড়িয়ে যেতে চায় কিছুদিনের জন্য। দূরে—পশ্চিমের কোন জায়গায়। স্বপ্নমায়ার চোখের বাইরে।

চন্দ্রশোভা কারো কোন প্রস্তাবে রাজী হয় নি।—একান্তই যদি বাড়ি ছাড়তে হয় ছাড়বে। কিন্তু সকলের সাধে-আশায় ছাই দিয়ে দেবে। থাকবে না বাপের বাড়িতে। উঠবে না শ্বশুরবাড়িতে। পথে পথে ঘুরবে। তবু স্বপ্নমায়াকে ছাড়বে না কখনো। ওকে বলবে নাও

কোনদিন এমন বিচ্ছিরি ধরনের কথাবার্তা। শোনাবেও না কখনো নিজের মুখে।

চন্দ্রশোভা না বললে কি হবে। না শোনালে কি হবে। শুনতে কারো বাকি থাকে না। জানতে কারো বাকি থাকে না। হাওয়া এসে চুপিসারে কথা কয় কানে কানে।

স্বপ্নমায়া নিজে এসেই জানাল চন্দ্রশোভাকে। শুভ্রাঞ্জনকে নিয়ে লোকের অনেক অভিযোগ স্বপ্নমায়ার বিরুদ্ধে।

চন্দ্রশোভা চেয়ে থেকেছে একদৃষ্টে। মাঝে মাঝে চাপা নিশ্বাস ফেলতে একটু হাঁফিয়ে উঠছে। স্বপ্নমায়ার হাত দুটো ধরে টেনে বসিয়েছে পাশে। উলের টুপি বুনছিল, পশম-টশম রেখে দিল ডান-পাশে কার্পেটের ওপর। বলল, লোকের অভিযোগ খণ্ডন করতে কেউ পারবে না। কেউ কখনো পেরেছে বলে তো আমার মনে হয় না। তুই চুপ করে থাক্ দিকিনি। কারো কথায় গুরুত্ব দিলেই বিপদ জানবি। সে অমনি মনে করবে নিজেকে না জানি কি একটা কেউকেটা। মাথায় চড়ে বসবে। কারো সঙ্গে না মিশে, দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে থাকলেও নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করা যায় না।

—তা বলে আমাকে জড়িয়ে তোর ক্ষতি হবে, এটা কেমন করে সহ্য করা যায়। এ আমি পারব না! বিনা দোষে দোষী করবে তোকে?

—করুক। আমার গায়ে ফোস্কা পড়েছে কি? বরং যে বলছে, তারই মুখখানা জঞ্জাল ফেলা ডাস্টবিন হয়ে পড়ছে। কেমন, তাই না? জোরে হেসে উঠেছে চন্দ্রশোভা।

হাসিতে যোগ দেয় নি স্বপ্নমায়া। বড্ড বেশি গম্ভীর হয়ে উঠল মুখখানা।

চন্দ্রশোভা বুঝতে পারছে তার বোঝানো নিষ্ফল।

স্বপ্নমায়ার মন সায় দেয়নি একটা কথায়ও। দাগ কাটা তো দূরের ব্যাপার। ওর মুখ দেখে ভয় ধরছে ভেতরে। এমুখ দেখা আজ নতুন নয়। বছর চার-পাঁচ আগে দেখেছে। চোদ্দ পেরিয়ে পনেরোয় পা দিয়েছে সবে।

তিনতলায় মধ্যিখানের ঘরে জানলা-দরজা বন্ধ করে বসে থেকেছে দিনের পর দিন। একই আসনে একটি পাথর প্রতিমা। মুখে হাসি নেই, ভাষা নেই। চোখে জল নেই। শুকনো। চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে। কারো দিকে ঠিক নয়। অথচ দুচোখ খোলা।

কাছে এসে কতজনে কত ডাকাডাকি। শুনতে পায় নি বুঝি। ঘাড় ফিরিয়েও দেখেনি একবারের জন্য।

ডাক্তার বলেছে, সাংঘাতিক অবস্থা। ওকে হাসাতে কাঁদাতে না পারলে—কি যে হবে, কিছু বলা যাচ্ছে না। কত রাত স্বপ্নমায়ার পাশে বসে জেগেছে চন্দ্রশোভা। কাঁদানো-হাসানোয় ব্যর্থ প্রয়াস কেবল।

অতল অন্ধকারে ডুবতে ডুবতে একটা অবলম্বনের খোঁজে হাতড়ে হাতড়ে বেরিয়েছে, পায় নি। নিরাশ হয়ে ও-ও যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নমায়ার অবস্থা কি হয় কি হয়।

আচমকা বিদ্যুৎ চমকের মতন একটা ক্ষীণ বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। শুভ্রাঞ্জনকে মান্য করে, ভালবাসে। ওর কথা খুব শোনে। বরাত ঠুকে, ওকে এনে দেখলে কেমন হয়। কিসে কি হয় কে বলতে পারে।

মনের কথা শুভ্রাঞ্জনকে জানিয়ে রাজি করিয়েছে।

প্রথম তিন-চারদিন বিফলে কেটেছে। তবু হাল ছাড়ে নি। আঘাতের জগদ্দল পাথর যেখানে কায়েম হয়ে বসে আছে, সেটাকে নড়ানো চাট্টিখানি কথা নয়।

আর আসতে গররাজি হলে, চন্দ্রশোভা অনুনয় বিনয় করে বলে, আর বেশীদিন নয়। আর দু'চারদিন ভ্যাখ একটু। একটা মানুষ যদি বাঁচে, যদি নিজের মধ্যে নিজে ফিরে আসে—এটা কি চেষ্টা করা উচিত নয় কারো। সমাজে থাকতে গেলে, মানুষের এটা মহৎ পুণ্য, মহৎ ধর্ম। আমার বিশ্বাস, যদি তুমি কায়মনোবাক্যে চেষ্টা কর, নিশ্চয় সফল হবে। হতে বাধ্য।

ভেঙে পড়া মন আবার সতেজ-সবল হয়ে উঠেছে।

নিয়মিত রোজ আসতে শুরু করল শুভ্রাঞ্জন। সখের ওকালতি। না করলেও চলে। বড় উকিলের জুনিয়র। কোর্ট ফেরত আসে।

বাড়ি যেতে রাত হয়ে যায়। স্বপ্নমায়াকে মা-বাবা ভালবাসে বলে, বাধা দেয় নি। বরং ছেলে বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত মা অপেক্ষা করে বসে থাকে। খবরাখবর শুনবে। শুনতে শুনতে ওপরের দিকে তাকিয়ে বলে, ঈশ্বর ওকে রক্ষে করুন, ঈশ্বর ওকে রক্ষে করুন।

সকলের প্রার্থনা শুভেচ্ছার ফল, না সময়ের গুণে—কে জানে, শুভ্রাঞ্জনের ডাকে সেদিন একটু নড়ে উঠল স্বপ্নমায়া।

দারুণ হাঁপাচ্ছে। পাথর প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করল বোধহয় শুভ্রাঞ্জন।

সামনে বসে দুজনে—চন্দ্রশোভা আর শুভ্রাঞ্জন। শুভ্রাঞ্জনের চোখের তারা জলে ডুবে গেছে। চন্দ্রশোভার জল নামছে।

স্বপ্নমায়ার গলা দিয়ে একটা 'উঁ-উঁ' অস্পষ্ট আওয়াজ বেরোচ্ছে। বুক ঠেলে গলা ঠেলে আসতে চাইছে বুঝি কুলহারা আকুল কান্না।

বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, কাঁদতেও ওর খুব কষ্ট। হোক, তবু কাঁদুক ও। কাঁদুক কাঁদুক কাঁদুক !

ঠোঁট দুটো থর থর করছে। চোখের কোণে জলের ফোঁটা। উঁকি মেরেই হারিয়ে গেল। শুকিয়ে গেল। নির্দয় মরুভূমি ওর সর্বাঙ্গে। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে ও।

এ কষ্ট দেখা যায় না আর।—ঠাকুর ! নয় তুমি তুলে নাও, না হয় ফিরিয়ে দাও ওকে। দোটানায় রেখে দগ্ধে দগ্ধে মেরো না এভাবে। স্বপ্নমায়া কখনো কারো ভাল বই মন্দ চিন্তা করে নি। ওর এদশা কেন ? মাথা কুটে কুটে পাগলের মতন কাঁদছে চন্দ্রশোভা।

দোটানায় শুধু স্বপ্নমায়াকে একা ফেলে নি ওপরঅলা। শুভ্রাঞ্জনকে সেই সঙ্গে ফেলেছে। কি মুশকিলে না পড়েছে। একজনকে কাঁদানো আর একজনের কান্না বন্ধ করা মহাফাঁপর।

মহাফাঁপরে বেশীক্ষণ পড়ে থাকতে হয় নি শুভ্রাঞ্জনকে। বিধি বাম আর থাকতে পারে নি। সদয় হয়ে পড়ল আকস্মিকভাবে। বাঁধভাঙা স্রোতের মতন হু-হু করে বেরিয়ে আসছে স্বপ্নমায়ার চোখের জল। অসম্ভব রকমে কাঁপছে সারা শরীর। জাপটে-জড়িয়ে ধরল চন্দ্রশোভা।

স্বপ্নমায়া বেহুঁশ।

এরপর স্বপ্নমায়া স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। মন যে খারাপ একেবারে করে না—তা নয়। নিরালায় বসে বসে কাঁদেও অনেক সময়। চন্দ্রশোভা যতটা পারে চোখে চোখে রাখে।

কোথাও বেড়াতে যাবে, ওকে সঙ্গে নেবে। না যেতে চাইলে, জোর করে নিয়ে যাবে। স্বপ্নমায়া জিদ ধরে না, যায়। ছবি দেখার সময়ও একই অবস্থা। যেতে হবে।

দিনের বেশীর ভাগ সময় চন্দ্রশোভার ঘরে থাকে। রাতেও অনেকদিন। পাশে গিয়ে ঘুমোয়।

আতরমণি ভোরে ঘর পরিষ্কার করতে এসে বলে, ভাগ্যিস ছ্যালে তুমি চন্দরদি।

মুখে আঙুল দিয়ে বারণ করে কথা কইতে চন্দ্রশোভা। এখুনি ঘুম ভেঙে যাবে। যতটা পারে ঘুমুক। ভেতরের জ্বালা জুড়োবার মহৌষধ—ঘুম।

অতি সাবধানে লঙ্কাকাণ্ড বলে, তাই।

পা টিপে টিপে ঘর পরিষ্কার করছে আতরমণি। নিচু হয়ে ঝাড়ু দিতে গিয়ে জলের কুঁজো রাখা টেবিলে ধাক্কা খেল সজোরে। কুঁজোটা উল্টে পড়ল মেঝেয়। কাঁচের গোলাপী কুঁজো আর মুখে ঢাকা নীল গেলাস ভেঙে খান খান।

রাগে অগ্নিশর্মা চন্দ্রশোভা।

ঘাড় ধরে ঘর থেকে বার করে দিতে যাচ্ছিল আতরমণিকে। আতরমণি কোমরে হাত বুলোতে বুলোতে কাঁচের টুকরো কুড়োচ্ছে।

চোখ খুলে বলে উঠল স্বপ্নমায়া।—কে যেন জলতরঙ্গ বাজাল রে চন্দ্র। থামল কেন—দ্যাখ না কে, ভারী ভাল।

এ যাত্রা ঘাড় ধাক্কা খেতে খেতে বরাত জোরে খুব বেঁচে গেল আতরমণি। মনে মনে বলল, বাবা সত্যনারায়ণকে—আসছে পুন্নিমেতে সিন্নি চড়াইবেক।

রাগে জল পড়েছে চন্দ্রশোভার। স্বপ্নমায়ার খুশিতে ঘুম ভাঙছে। খাটে এসে বসল। স্বপ্নমায়ার চুলের বিনুনির পাক খুলতে খুলতে বলল, আর একটু ঘুমিয়ে নে না। পুব জানলায় রোদ আসেনি এখনো।

গুনগুন করে কাজী নজরুল ইসলামের গান গাইছে। এ গান শুনতে যেমন ভালোবাসে স্বপ্নমায়া, গাইতেও পারে সুন্দর। শুনতে শুনতে স্বপ্নমায়া নিজের আগোচরেই গলা মিলিয়ে চলেছে চন্দ্রশোভার গলার সুরে সুরে। 'আজ ভোরে মোর ঘুম ভাঙালে, অচেনা সই কোন অতিথি। আঁখিতে তার এ কোন্ ভাষা, অধরে তার এ কোন্ গীতি।'
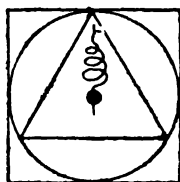
লোকে বলে, শকুনি নাকি কারো সুখ দেখতে পারে না। দেখলে, হা-হুতাশের নিশ্বাস ফেলে। ফেলে কি না ফেলে, এক শকুনি বিশেষজ্ঞরাই ঠিকমত বলতে পারে। তবে কেউ বিশেষজ্ঞ না হয়েও হলফ করে বুকে হাত দিয়ে নির্দ্বিধায় বলতে পারে। মানুষ সইতে পারে না মানুষের সুখ। চোখ জ্বালা করে।

সত্যি সুখে চোখজ্বালা মেনে নেয়া যায়। যেখানে যথার্থ সুখ নয়, একটা মানুষের যন্ত্রণা ভুলিয়ে রাখার প্রয়াসকে সুখ ভেবে নিয়ে গাত্রদাহ বরদাস্ত করা যায় না।

জ্ঞাতিগুষ্ঠির টিকাটিপ্পনী কি শুধু? ওদের বন্ধু-বান্ধবদের কেউ কেউ সুবিধে পেলে, কটু কথা বলতে কসুর করে না। অযাচিত উপদেশের ছলে গায়ে পড়ে ভৎর্সনা। দু'কথা শোনান।

কেউ বলে, বলিহারি সাজগোজের বাহার দেখে। এই সব মেয়েরই কই মাছের প্রাণ। সকলে ধরেই নিয়েছিল, নির্ঘাৎ যমপুরীতে যাবে। কত অভিনয়ই জানে। কত ঢঙই দেখাল পাথর সেজে বসে থেকে।

কেউ বলে, চন্দ্রশোভার আবার সোহাগ কত না! যত নষ্টের গোড়া

তো ওই-ই। স্বপ্নমায়াকে উনি সামলাচ্ছেন। মন ঘোরাচ্ছেন। শুভ্রাঞ্জন ছাড়া কি আর কেউ বোবা, কেউ কালা, কেউ অন্ধ ? তা নাহলে ছুটো মেয়ের এত বাড়-বাড়ন্ত !

কেউ বলে, স্বপ্নমায়ার একটা বিয়ে দিলেই তো সব ল্যাটা চুকে যায়। এত ঝামেলা পোহাতে হয় না আর কাউকে। সুমোহনের নাম গন্ধ নেই পোড়ার মুখে। 'শুভ্র, শুভ্র' করে পাগল। লজ্জাশরমের বালাই নেই। মাথা খেয়ে বসে আছে।

কেউ বলে, সব চেয়ে তাজ্জব ব্যাপার, এদের ধরন-ধারণ দেখে চোখ খোলে না বোকা ছেলেদের। সুমোহন তো স্বপ্ন বলতে অজ্ঞান ? হ্যাঁ, স্বপ্ন স্বপ্নই। সত্যি হয় না ! এটাও বুঝল না বাছাধনেরা। অকালে প্রাণ খোয়াল একজন। আর একজনের কি হয় কে জানে ! স্বয়ং ভগবানও জানেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ।

আতরমণি বলে তার বুড়োকে, কি আশ্চয্যি কথা মা গো। চন্দরদি হবেক দুয়োরানী, সোপনদি হবেক সুয়ো। লজ্জায় মরি লজ্জায় মরি। ঘেন্নায় মরি ঘেন্নায় মরি। বুড়ো, দেশকে চল। আর নয়। সৌতিনের তাপ সহন যাবে না মোর। তুই যদি চন্দরদির কথা শুনে দুসরা শাদী করিস, মাথা কুটে মরবেক।

সব রকমের আলোচনা কানে আসে চন্দ্রশোভার। বাদপ্রতিবাদ করে না মুখে, কিন্তু ভেতরে বড় যন্ত্রণা। আতরমণির কথা ছেড়ে দেয়া যায়। ও অজ্ঞ। কিন্তু অন্যের ?

অসহ্য অসহ্য অসহ্য। ওরা কি মানুষ !

স্বপ্নমায়ার হৃদয় দেখেনি কেউ। ওর ব্যথা-বেদনা বোঝেনি কেউ। বুঝলে, এমন মনোভাব আসতো না কারো। বুঝবেই বা কেমন করে— হৃদয় থাকলে না ! ওরা নিষ্ঠুর, ওরা হৃদয়হীন।

মুখে, কাজেকর্মে ওকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়েছে অনেক।

ছোটকাকার মেয়ে—খুড়তুতো বোন ইন্দুলেখার বিয়েতে এসে এক পর্ব। বিয়ের কোন মঙ্গলকাজেই স্বপ্নমায়ার স্থান নেই।

মর্মান্তিক আঘাতকে নির্মম আঘাতে আরো জাগিয়ে তোলা হয়েছে।

সিল্কের চাঁপাশাড়ী ব্লাউজ পরেছে স্বপ্নমায়া। চুড়ি-চুড় হাতে, গলায় গিনির মালা, কানে কানবালা। সব মিলিয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে। বিয়ে-বাড়ির সবার চোখ ওর দিকে।

এই নিয়ে কি হাসাহাসি, কি অন্তর বেঁধান কথা। জ্ঞাতিরা এসেছে। দূর সম্পর্কের পিসি জেঠি কাকিরাই বেশী করে ওকে নিয়ে পড়েছে। বাড়িতে কেউ কি শেখানোর নেই। কনের সাজে সাজতে আছে নাকি আর! বড় দৃষ্টিকটু। আরে, ভেতরে যাই থাক, বাইরেটা অন্তত ঠিক রাখ্। এমন বেহায়াপনা কেউ দেখেনি কখন। গয়নাগাটি শাড়ী ব্লাউজ কার ঘরে নেই! কিন্তু স্বামীর সম্মান বলে একটা আছে তো! যবে থেকে বাঁ হাতের লোহা খুইয়েছে আলমবাজারের নন্দপিসি, আলমারীর চাবি ফেলে দিয়েছে বৌমার হাতে। আলমারীর দিকে চোখও যায় না, হাতও যায় না। সব বিষ, সব বিষ। হ্যাঁ, স্বামীভক্তি দেখাল বটে। খালি ঢাক পিটিয়ে পাথর হয়ে বসে শোক দেখান হয়েছে সাতবাড়িকে। ছিঃ ছিঃ!

চন্দ্রশোভা ওখান থেকে ওকে সরিয়ে এনেছে তাড়াতাড়ি। স্বপ্নমায়া গয়না শাড়ী খুলে ফেলতে চেয়েছে। বাধা দিয়েছে চন্দ্রশোভা। ওরা জ্বলুক।

বর এসেছে।

ছাদনাতলায় বরণ করতে গেছে দৌড়ে স্বপ্নমায়া।—সরে যা, সরে যা! এর মধ্যে বিধবা! জয় মা মঙ্গলচণ্ডী। শুভ করো মা। শুভ করো বরকনের! বলে, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে নদীয়ার বিমলা জেঠি।

যারা মা-মাসির বয়সী, তাদের এভাবে শেলবেঁধানো কথা, বড় ব্যথা দেয়। সেখান থেকেও চন্দ্রশোভা টেনে এনেছে স্বপ্নমায়াকে।

ঘরে এসে আর বেরোয় নি স্বপ্নমায়া।

খুলে ফেলেছে গয়না, ছেড়ে ফেলেছে পরনের সাজ।

—কি করছিস পাগলী কোথাকার। চন্দ্রশোভা সাজিয়ে দিতে গেছে আবার।

—না। চন্দ্র আর নয়।

সুমোহনের ছবির দিকে চেয়ে হাপুস নয়নে কেঁদেছে, কেঁদেছে চন্দ্রশোভাও। ফাল্গুনের গোধূলী লগ্নে দুই বোনের শুভ পরিণয় হয়েছে। বাড়িতে আনন্দের হাট বসেছে সেদিন। সেদিন স্বপ্নমায়া ছিল সাক্ষাৎ দুর্গাপ্রতিমা যাদের কাছে, আজ তাদের চোখে ও একটা অমঙ্গল ও একটা অলক্ষণ!

সুমোহনের মৃত্যুর জন্য দায়ী কি স্বপ্নমায়া?

ওই প্লেনে আরও তো যাত্রী ছিল। প্লেনের আগুনের গ্রাসে তারাও তো নেই। সবার জন্যই কি দায়ী ও? এর উত্তর দেবে কে?

মা চায় তার ছেলে কোল জুড়ে বেঁচে থাকুক চিরদিন। অনেক সময় থাকে কি? থাকে না। এতে মায়ের দোষ কোথায়?

স্বপ্নমায়া আর সুমোহনের মধ্যে একটা পবিত্র প্রেমের আকর্ষণ ছিল। যে আকর্ষণের মধ্যে দিয়ে দুঃসংবাদ পাবার আগেই ঘরে বসে দেখতে পেয়েছে প্লেনে আগুন লাগার দৃশ্য। দেখতে পেয়েছে সুমোহনের মৃত্যুর দৃশ্য। কতখানি অন্তরের টান থাকলে তবে দেখা যায়! কতখানি দুজনে একাত্মা হয়ে থাকলে একজনের বিপদ অন্যজন বুঝতে পারে আগে।

একজনের বিচ্ছেদে আর একজনও কি মরে নি? বেঁচেছে কেবল শুভ্রাঞ্জনের জন্য। বাঁচা শুধু নয়, পুনর্জন্ম বললেও চলে।

কদিন সুখী হয়েছে ও। পনেরোর সিঁথির সিঁদুর সতেরোয় মুছে গেল। কোথায় লোকের মমতা আসা উচিত, তা নয় মনঃকষ্ট দেবে। এদের মন বলে কোন বস্তু আছে কি? নেই, নেই। কত লক্ষ্য রেখে কত আগলে আগলে কি করে মন ঘুরিয়ে রেখেছে একমাত্র চন্দ্রশোভাই জানে। আর জানে স্বয়ং ভগবান। আর একজনের কথা না বললে, বলা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শুভ্রাঞ্জন।

এবারে এত উর্ধ্বে উঠে গেছে কেউ কেউ যে, স্বপ্নমায়ার চরিত্র নিয়ে টানাটানি করতে কসুর করছে না। চন্দ্রশোভাকে যা বলে বলুক, কিছু এসে যায় না। কিন্তু স্বপ্নমায়াকে কেন বলবে? ওর মৃত্যু না দেখে কি এদের শান্তি নেই! ওকে পাগল না করে দেয়া পর্যন্ত কি এদের স্বস্তি-সুখ নেই!

মন একেবারে ভেঙে গেছে চন্দ্রশোভার স্বপ্নমায়ার গম্ভীর মুখ দেখে। আবার না ওর মনের জলতরঙ্গ বাজনা থেমে যায়। আবার না নিস্তব্ধ-নিঝুম আগেকার পাষাণ-প্রতিমা হয়ে যায়।

সেই মুখ দেখে সেই ভয় চন্দ্রশোভার।

চন্দ্রশোভার কাছে লোকের বিরূপ সমালোচনা আর অভিযোগের কথা জানাতে বসেছিল স্বপ্নমায়া। এসব কথা কানে নিতে নিষেধ করেছে চন্দ্রশোভা। বলেছে স্বপ্নমায়া, নিজেকে নি়ে ওসব গ্রাহ্য করি না। কিন্তু তোকে জড়িয়ে, তোর ক্ষতি হোক, এ সহ্য করতে পারব না…

আর বসে থাকে নি কোন কথা শোনবার অপেক্ষায়। উঠে পড়েছে চন্দ্রশোভার পাশ থেকে। মৌন-ম্লান মুখে ফিরে গেল নিজের ঘরে।

চোখের জল চাপতে পারে নি চন্দ্রশোভা। আঁচলে মুখ ঢেকেছে।
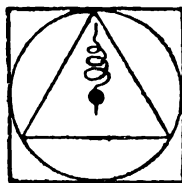
লোকের মনস্কামনা পূর্ণ হল।

স্বপ্নমায়া পড়ে থাকে একা ঘরে। বেশীর ভাগ সময় বিছানায় শুয়ে। কারও সঙ্গে কোন কথা নয়। শুধু একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। উদাস চাউনি। কাউকেই চেনে না বোধ হয়।

চন্দ্রশোভা অনেকক্ষণ ধরে কাছে থাকে, যেমন কোন অচেনা মানুষ, তেমনি। দুজনেই চুপচাপ। চোখের জল ঝরে পড়ে চন্দ্রশোভার। স্বপ্নমায়ার কিন্তু চোখের কোণ লালও হয়ে ওঠে না। শোনা যায় কান্না সংক্রামক। কই এখানে তো নয়? স্বপ্নমায়ার দুনিয়ায় আলাদা ধারা বয়ে চলেছে।

মানুষের অনুভূতি থাকলে না দুঃখ-কষ্ট সুখ-শান্তি বোধ আসবে। অনুভূতির মর্মস্থান আঘাতে-আঘাতে জর্জর হয়ে নিস্তেজ-নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে স্বপ্নমায়ার।

স্বপ্নমায়ার এই অবস্থা দেখে বাড়ির সকলের কেন, যারা হেনস্থা করেছে, কটু কথা বলেছে—তাদের মনও টলে গেল। গলে গেল সহানুভূতিতে। শত্রু-মিত্র কোন পার্থক্য রইল না আর। সকলের মুখে এক কথা—আহা বেচারা রে! জীবনে কি-ই বা পেল। ঈশ্বর ওকে শান্তি দাও, সুস্থ করে তোল! এ কষ্ট আর দেখা যায় না চোখে। নিষ্কলঙ্ক নিরপরাধ মেয়েটার একি শাস্তি গা। কখনো কারও সঙ্গে তর্কাতর্কি কি দুর্ব্যবহার পর্যন্ত করে নি। কত না সহ্য করেছে মুখ বুজে বাছা আমার। সুমোহনের জন্য পাগল ও। কি পতিপ্রাণা স্ত্রী। এমন দেখা যায় না এই বয়েসে। পতিধ্যান পতিজ্ঞান। সীতা-সাবিত্রীর সঙ্গেই একমাত্র তুলনা চলে স্বপ্নর।

আলমবাজারের নন্দপিসি বলল, এ বংশের লোকেরা সত্যি সত্যি মোক্ষধামে যাবে এই দুটি মেয়ের জন্য। একটি স্বপ্ন আর একটি চন্দ্র। আমি ঠাকুরঘরে ধ্যান করতে করতে দেখেছি, এরা কে। এরা দেবী। মানবদেহ ধারণের ইচ্ছে হয়েছিল বলে, এসেছে। এরা কি থাকে নাকি বেশীদিন? ঠাকুরের কাছে বলি, ঘর আলো করে রেখে দাও ঠাকুর এদের। রেখে দাও।

নন্দপিসির দুগাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে।

নদিয়ার বিমলা জেঠিরই বা কি কান্না। এরা দেখতে এসেছে। বলল, দেবী দেবী দেবী। দেবীর কখনো মানবস্বামী হয়। কুষ্ঠি বিচার করা উচিত ছিল আগে। আরে দেবীর কাছে থাকবে দেবতারা। মানুষ কখনো থাকতে পারে! মানুষের সে ভাগ্য কোথা! সুমোহন থাকতে পারবে কেন?

নন্দপিসি চোখ মুছে বলল, চণ্ডীপাঠের সময় ঠাকুর মশাইয়ের মুখে শুনেছি, মহাসুর শুম্ভেরও সাধ হয়েছিল দেবীকে স্ত্রীভাবে পাবার জন্য। পূরণ হয়েছিল কি? হয় নি। পূর্বজন্মের সুকৃতি ছিল সুমোহনের। দেবীকে স্ত্রীভাবে চেয়েছিল নিশ্চয় মানুষ হয়েও!

চন্দ্রশোভার দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, সত্যি সত্যিই সব শুনছে, দেখছে তো! মাথাটা বিগড়োই নি তো? এ যে ভূতের মুখে রাম নাম।

আর বলে কি হবে ? যার মহিমা গানে মেতে উঠেছে ওরা, সে তো কিছুই শুনছে না। ঈশ্বর স্বপ্নমায়ার মতন চন্দ্রশোভাকে করে দাও। চন্দ্রশোভার মতন স্বপ্নমায়াকে করে দাও। দোহাই তোমার। স্বপ্ন অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সয়েছে। ও একবার এদের মুখেই নিজের স্তুতি শুনুক অন্তত। আমার কোন প্রার্থনা পূর্ণ করবার দরকার নেই ঈশ্বর, এই প্রার্থনাটা পূর্ণ কর কেবল আর কিছু চাই না, আর কিছু চাই না।

দুঃখের ওপরও চন্দ্রশোভার হাসি আসছে ঈশ্বরও তো স্বপ্নমায়ার মতন পাথর। শুনবে কি, বুঝবে কি ! নিজে পাথর বলেই না পাথর করে রেখেছে স্বপ্নমায়াকে।

নদিয়ার বিমলা জেঠির খুব জানাশোনা কে যেন কে দীনবন্ধু একজন লোককে নিয়ে এল বাড়ীতে। লোকটি সুদর্শন। চোখের তারা নীল বলে হয়তো বা নীলনয়ন নাম। গ্রামেগঞ্জে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় যাযাবরের মতন। বাড়ি-ঘর কোথা জিজ্ঞেস করলে বলে, 'সব দেশেই মোর ঘর'।

এর আগমনের কারণ ?

নীলনয়ন দেখলে নাকি বুঝতে পারে কার আত্মা কাকে ধরে রেখেছে। মরা মানুষের জন্য যদি কেউ ব্যাকুল হয় দিনরাত, আর তারও যদি আকর্ষণ থাকে খুব, তাহলে কিন্তু মৃতের আত্মা আসে। প্রিয়জনকে আঁকড়ে ধরে থাকে। যতক্ষণ না প্রিয়জনের মৃত্যু হয়, ততক্ষণ। নিয়ে গিয়ে তবে নিস্তার।

স্বপ্নমায়ার এমন হল কেন ?

নিশ্চয় সুমোহন তাকে ধরেছে। সুমোহনকে না সরালে, স্বপ্নমায়ার মৃত্যু নিশ্চিত।

নীলনয়ন অনেকক্ষণ ধরে সুমোহনের ফোটো নিয়ে একভাবে দেখল। কি দেখল, ওই-ই জানে। ঘর নির্জন। সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে নীলনয়নের রায় শুনবে বলে।

খাটে অর্ধশয়ান স্বপ্নমায়া। ভাবলেশহীন মুখ। চেয়ে আছে।

কারো দিকে নয়। ওরই সামনা-সামনি চেয়ারে বসে নীলনয়ন। অন্যেরা ঘর জুড়ে দাঁড়িয়ে।

চন্দ্রশোভা স্বপ্নমায়ার পায়ের কাছ থেকে আরো একটু তফাতে। নীলনয়নের কঠোর নির্দেশ—সকলে একমনে সুমোহনের ছবির রূপটা চিন্তা করবে মনে মনে। যারা পারবে না, তারা এ ঘরে যেন না থাকে। কাজের অসুবিধে হবে বলে বলা হল।

ঘরের চারদিকে তাকাল একবার নীলনয়ন।—স্বপ্নমায়ার ওপর একদম নজর রাখবে না কেউ। মনে করতে হবে, ও নেই ঘরে। ওর বিছানা পর্যন্ত কেউ যেন না স্পর্শ করে।

সব নির্দেশ মেনে নেয়া যায়। একটা মানা যায় না কোনমতে। কেউ মানুক না মানুক, চন্দ্রশোভা মানবে না। মানতে পারে না··· স্বপ্নমায়ার ওপর নজর রাখবে না···।

নীলনয়ন আবার সুমোহনের ছবির দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে বলল, খাটের দিকে তাকিয়ে ছাখো এবার। ছোট-বড় সবাইকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে নীলনয়ন। ও নাকি জ্ঞান-বৃদ্ধ।

গম্ভীর গলায় বেশ জোরে জোরে বলতে লাগল, খাটে কে বসে আছে? কে? কে? সুমোহন, সুমোহন। কি দেখছ সব? কি দেখছ সব? কি দেখছ সব?

মৃদু গুঞ্জন উঠল ঘরে। সুমোহন সুমোহন।

চন্দ্রশোভা হতবাক। জলজ্যান্ত স্বপ্নমায়াকে সুমোহন দেখছে ওরা। স্বপ্নমায়ার এখনো আধশোয়া অবস্থা।

তাজ্জব ব্যাপার। এখানে সত্যি কথা বলতে যাওয়া মানেই মিথ্যুক বনা। এতলোক একদিকে, সে একা একদিকে। মনে পড়ছে নবদ্বীপের পণ্ডিতের গল্প। বাবার মুখে শুনে চন্দ্রশোভা আর স্বপ্নমায়া হেসে লুটিয়ে পড়েছে ঘরে। দম বন্ধ হয়ে যায় আর কি! মা এসে রক্ষে করে শেষে। বলে, জিভ কামড়ে রাখ, থেমে যাবে'খন।

গল্পটা এক্ষেত্রে খাটে খুব।

মূর্খের গাঁয়ে গিয়ে পড়েছে পথভুলে পণ্ডিত। গ্রামবাসীর একজনকে প্রশ্ন করল, কস্ত্বং—কে তুমি?

সে তাদের মোড়লের কাছে নিয়ে গেল বুঝতে না পেরে। মোড়ল প্রশ্ন শুনে উত্তর দিয়েছে, খস্ত্বং গস্ত্বং ঘস্ত্বং—।

শুনে বিস্ময়বিমূঢ় পণ্ডিত।

মোড়লের চেলাদের কি উল্লাস কি হাততালি।—নবদ্বীপের পণ্ডিতের এক কথার কত উত্তরই দিল দাঠাকুর।

প্রাণ নিয়ে পালাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে পণ্ডিত। বলেছে কর-জোড়ে, প্রভু দয়াল জ্ঞানী। আমি মূর্খ হয়েছি। ছেলেটা যেন না হয়। আপনার দাড়ির একটি চুলে তাবিজ করে রাখব ছেলের গলায়।

মোড়ল মহাগর্বে দাড়িতে হাত বুলিয়ে সকলকে দেখাল—দাড়ির কত গুণ তার। একটি চুল তুলে দিতে, পণ্ডিত চোদ্দবার মাথায় বুকে ঠেকিয়ে উড়নির খুঁটে বাঁধল। গেরোর পর গেরো, তারপর গেরো। অরূপরতন খোয়া যেন না যায়। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, সরে পড়ে প্রাণ-মান বাঁচাল।

এদিকে দাঠাকুরের দাড়ির এত গুণ জেনে ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্রামবাসী। মুহূর্তে দাড়ির সমস্ত চুল অদৃশ্য।

এখানে নীলনয়নকে ওরকম কিছু করে জব্দ করবার কোন ইচ্ছে নেই চন্দ্রশোভার। মনের সে অবস্থাও নয়।

চন্দ্রশোভা বেশ বুঝতে পারছে, নীলনয়নের কারসাজি। একটা জিনিসকে অনেকক্ষণ ভাবালে, সেই ভাবধারায় তন্ময় হয়ে পড়ে মানুষ। শুধু একজায়গায় নয়, সর্বত্রই সেই ভাবের ছবি দেখতে থাকে। চোখের ধোঁকা সত্যি বলে মনে হয়।

একথা শুনেছে চন্দ্রশোভা তার শ্বশুরবাড়িতে। শ্বশুরের গুরুদেব শ্বশুরকে বোঝাচ্ছিলেন। দেবতার ধ্যানে—চিন্তায় কেমন করে সব বস্তুর মধ্যে দেবতা দর্শন হয়। কেমন করে নিজে দেবতা হয়ে পড়ে মানুষ।

নীলনয়নের ব্যাপারও অনেকটা সেই ধরনের।

যাক, বাড়িসুদ্ধু সকলেই নীলনয়নের সঙ্গে গলা মিলিয়ে একবাক্যে স্বীকার করেছে, যা বলেছে ঠিক, যা দেখিয়েছে ঠিক। ওকে সুমোহনের প্রেতাত্মা ধরেছে। এর বিহিত খুব তাড়াতাড়ি না হলে জীবন নিয়ে টানাটানি। টানাটানি আর কি, সেই অবস্থায় এনে ফেলেছে মেয়েটাকে। উঃ, কি সাজাই না দিচ্ছে সুমোহন। মনেপ্রাণে ভালবাসার এই ফল !

প্রকৃত রোগ ধরিয়ে দেবার কৃতিত্বে বিমলাজেঠির সম্মান বেড়ে গেল বাড়িতে। দরদী মানুষ এখনো আছে। মানুষের উপকারের জন্য কত না ভাবে। আরে বাবা, এসব কি ডাক্তারবদ্যির অসুখ নাকি যে, ভাল করবে !

সকলে মিলে প্রতিকারের উপায় বাতলে দিতে অনুরোধ করল নীলনয়নকে। নীলনয়ন বিশেষজ্ঞ মানুষের মতন চোখ বুজে বসে রইল খানিক। আকাশ-পাতাল ভাবনা মাথায় চেপে বসেছে বুঝি মানুষটার। চোখ খুলে বলল, হুঁ, মেয়েটার জন্য আমার চিন্তা রইল। তবে, একটা কাজ করতে পারলে ভাল হয়। গয়ায় পিণ্ডি দেয়া। সুমোহনের মুক্তি হোক। মুক্তি না হওয়া অবধি ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব।

নীলনয়নের এ সিদ্ধান্তে গোটা বাড়ির মন সায় দিয়েছে অন্তরের সঙ্গে। সকলে যেন নিশ্চিন্ত হল স্বপ্নমায়াকে বাঁচাবার সত্যিকারের একটা পথ পেয়ে।

ঠাকুরমার বিমর্ষমুখে হাসি ফুটেছে কতদিন বাদে। ঠাকুরমা বলল, বলি বলি করেও বলা হয় নি আমার। রোজই মনে করি স্বপ্নকে গয়ায় নিয়ে গেলে কেমন হয়।

…বাড়ির কুলপুরোহিতের কাছে শুভ দিনক্ষণ জেনে নিয়ে আসা হল। ফাল্গুনের ছ তারিখ।

গয়ায় এসে পৌঁছল স্বপ্নমায়া।

একা নয়। চন্দ্রশোভা আর তার বাবা-মা। অর্থাৎ স্বপ্নমায়ার জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাইমা। নিজের মা-বাবা আছেই। আছে

ঠাকুরদা-ঠাকুরমা। ঠাকুরমা নাকি এতদিন তার বাবাকে পিণ্ডদান করে নি। কেন? বাবা বলেছিল, আবার আসব।

সে আশা মেটে নি ঠাকুরমার। জ্ঞাতিগুষ্ঠি কাউকেই কখনো স্বপ্ন দেয় নি—আসছি বা এসেছি বলে। কতযুগ চলে গেছে। ঠাকুরমা যখন এখনো বেঁচে আছে, আর তাছাড়া স্বপ্নর দৌলতে যোগাযোগই যখন হয়ে গেল, তখন কাজটা সেরে ফেলাই ভালো। বাবার হয়তো এইটাই ইচ্ছে।

...সকলে মিলে ভোরে চান করতে এসেছে ফল্গুনদীতে। পাণ্ডা সঙ্গে। গোবর্ধনপাণ্ডা বংশের কুলপাণ্ডা। ওরই বাড়িতে উপস্থিত বসতি। চান করতে নেমে কি নাকাল! নামেই নদী। জল কই! তবে বালি খুঁড়লেই জল।

মৃদুমন্দ স্রোত বয়ে চলেছে নিচে দিয়ে।

অনেকে পূর্বপুরুষের মুক্তিকামনা করছে পিণ্ডদানে।

বালি খুঁড়ে খুঁড়ে জল বার করে চন্দ্রশোভা স্বপ্নমায়াকে চান করিয়ে, নিজেও সেরে নিল। জলে দুধ ঢেলে দিতে বলল গোবর্ধন। স্বপ্নমায়ার হয়ে, ওকে ছুঁয়ে বিধিনিয়ম সব পালন করল চন্দ্রশোভাই। স্বপ্নমায়া কিছুই শোনে না। কিছুই দেখে না, কিছুই বোঝে না। ওর দায়-দায়িত্ব সমস্ত চন্দ্রশোভার।

ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, বাবা-মা, কাকা-কাকী কে কি করছে সেধারে ওর লক্ষ্য নেই, প্রয়োজনও নেই।

নদীতীরে পিণ্ডদানের কার্য সমাধার পর মন্দিরে নিয়ে এল গোবর্ধন। কালোপাথরের প্রকাণ্ড মন্দির। ওপরে বড় গম্বুজ, তার ওপর চূড়ো। মন্দিরে প্রবেশ করল সকলে। গর্ভমন্দিরে বিষ্ণুপাদপদ্ম। এখানে সুমোহনের মুক্তির উদ্দেশ্যে, শান্তির উদ্দেশ্যে স্বপ্নমায়ার হাত দিয়ে পিণ্ডদান করানো হল। মন্দিরে মূর্তি নেই কোন।

গোবর্ধন মুক্তিক্ষেত্র গয়াতীর্থের মাহাত্ম্য শোনাচ্ছে। শোনাচ্ছে পুরাণের বিষ্ণুসাধক গয়াসুরের কাহিনী।—

গয়াসুরের দেহ বিষ্ণুর বরে শুদ্ধ-সত্ত্ব-পবিত্রমন হয়ে উঠেছিল।

দেবত-ব্রাহ্মণ আর যোগীদের চেয়েও। যে যেমনই হোক তার দর্শনে মুক্তি পেয়ে যেত অনায়াসে।

প্রমাদ গণল যমপুরীর যমরাজ।

মুক্তির পথ এত সহজলভ্য হয়ে উঠলে যমরাজকে পরোয়া করবে না কেউ আর যে। নিবেদন জানাল যমরাজ স্বয়ং বিষ্ণুর কাছে উপস্থিত হয়ে।

মহাচিন্তায় পড়ল দেবতারাও। গয়াসুরকে আদেশ করল, তার দেহ দেবতাদের দান করতে। শেষে অরাজী গয়াসুরের বুকে ভারী কালো পাথর চাপা দিয়ে দিল দেবতারা। গয়াসুর তাতেও স্থির নয়।

বিশ্বম্ভর মূর্তি ধারণ করে বিষ্ণু এসে গয়াসুরের বুকের পাথরের ওপর নিজের একটি চরণ রাখলেন। স্থির হল গয়াসুর। নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর শরীরের কথা চিন্তা করে, হৃদয়ের পরিপূর্ণ ভক্তি উজাড় করে দিতে দিতে বিষ্ণুস্তুতি উচ্চারণ করতে লাগল গয়াসুর।

দেহ গেলেও আত্মা অমর—এই দিব্যজ্ঞান লাভ করল বিষ্ণুর আশীর্বাদে।

গোবর্ধন বলল, গয়াসুরের নামেই গয়াধাম। কুরুক্ষেত্র পুষ্কর প্রভাস গঙ্গা গয়া। পঞ্চতীর্থের মধ্যে গয়া। এই বিষ্ণু পাদপদ্ম দর্শনে নিমাইয়ের রূপান্তর হয়েছিল।

চন্দ্রশোভা প্রার্থনা করছে মনে মনে। স্বপ্নমায়ার এভাবের পরিবর্তন হবে না কি ঠাকুর। কৃপা কর! গাল বেয়ে জল পড়ছে দুচোখের।

মাথায় কার হাত! সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে গেল যে।

সত্যি কি দেবতা এলেন? চন্দ্রশোভার প্রার্থনা শুনতে পেয়েছেন!

চোখ খুলে মুখের দিকে তাকিয়েই পায়ে লুটিয়ে পড়ল চন্দ্রশোভা। দিব্যকান্তি পুরুষ। সন্ন্যাসীর বেশে দেবতা নাকি!

কাঁদতে কাঁদতে বলল, বাবা! আপনি অন্তরযামী। আমাদের অবস্থা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। স্বপ্নমায়ার কিসের জন্য এ সাজা জানি না। যদি অজ্ঞানে কোন অন্যায় করে থাকে ও—সে-সাজা আমার মাথায় তুলে দিন। আশীর্বাদে ওকে সুস্থ করে তুলুন।

শান্ত মৃদু স্বরে সন্ন্যাসী বলল, মা ওঠ!

বাবা! স্বপ্নর যদি কিছু না হবার থাকে, ওর মৃত্যু দিন! মুক্তি দিন। আর দেখতে পারা যাচ্ছে না এ অবস্থা।

যার জন্য এত কান্না, এত প্রার্থনা, সে কিন্তু নির্বিকার। অচল। চুপচাপ বসে। মন্দিরের সবার চোখে জল। ওর চোখের কোণে চিক-চিকে মেঘেরও দেখা নেই। এক কণারও না।

স্বপ্নমায়ার মাথায় হাত দিল সন্ন্যাসী। নরম হাতের তালুর চাপ দিচ্ছে স্বপ্নমায়ার ব্রহ্মতালুতে। স্বপ্নমায়ার অপলক চোখের পলক নড়ে উঠছে। জলে ভরে উঠছে দু'চোখ। শ্রাবণের আকাশের ধারা নামছে কোল উপচে।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছে চন্দ্রশোভা। আবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। একবার শুভ্রাঞ্জন করেছিল। আর একবার করল এই মহৎ হৃদয় সন্ন্যাসী। অন্তরের ডাক শুনে নিজে হতে এসে দাঁড়িয়েছেন বিপদভঞ্জনের ভূমিকা নিয়ে।
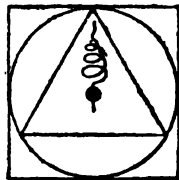
সন্ন্যাসীর পরিচয় জানা গেছে পরে, লোকমুখে শুনে। পরিব্রাজক ত্যাগানন্দ।

ত্যাগানন্দের আদেশ মত, যে ডেরায় এসে উঠেছেন—সেই ডেরায়—স্বপ্নমায়াকে নিয়ে হাজির হয়েছে চন্দ্রশোভারা।

স্বপ্নমায়ার নির্বিকার নিষ্ক্রিয় উদাস ভাবটা কেটেছে। সবার প্রণামের সঙ্গে ও-ও পায়ে মাথা রেখে ভক্তিভরে প্রণাম করেছে ত্যাগানন্দকে।

ত্যাগানন্দ মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতে করতে বলেছে, চাওয়ার শেষ নেই, পাওয়ারও শেষ নেই—এসবে শান্তি আসে না ঠিক। তুমি প্রকৃত শান্তি পাও।

উদাত্ত কণ্ঠে ভগবদ্গীতার শ্লোক শোনাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যাও শোনাচ্ছেন ?—'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদায়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।' আত্মা অমর। অস্ত্রে ছিন্ন হয় না। আগুনে পোড়ানো যায় না। বাতাস শোষণ করতে পারবে না। জল পারে না ডোবাতে, পারে না ভেজাতে।

পৃথিবীতে এটাই সত্য। এটাই স্থায়ী। আর সমস্ত অস্থায়ী। নিজের দেহ নিজের নয়। নিজের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব পুত্রকন্যা ভ্রাতাভগ্নী স্বামী-স্ত্রী—কেউ কারো নয়। হবেই বা কেমন করে যেখানে নিজেই নিজের নয়। অনন্ত শক্তি সূক্ষ্মভাবে অনেক ছোট হয়ে এসে, মানুষের মধ্যে দিয়ে নিজেই নানা কাজ করে যায়, করে যাচ্ছে।

ভাববার কিছু নেই। একই আত্মার প্রকাশ সকলের মধ্যে। প্রকাশ বহু দেহে বহুরূপে। এ জ্ঞান হলে মানুষের অনর্থক তুঃখ-কষ্ট আর শোক-তাপের অকরুণ যন্ত্রণাবোধ থাকে না। একটা অজানা আনন্দে বিভোর হয়ে যায়। অন্য কোন কিছু স্পর্শ করে না।

কয়েক পলক ধরে এক একজনের মুখের ওপর ত্যাগানন্দের চোখ আটকে রইল। তাঁর উপদেশ, তাঁর নির্দেশ এরা ঠিক মত মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পেরেছে কিনা।

জিনিসটাকে পরিষ্কার করে দেবার জন্য গীতার একটি শ্লোক শুনিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। 'সঙ্গাৎ সংজায়তে কাম, কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে। ক্রোধাদ্ভাতি সম্মোহঃ, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।'

মানুষের আসক্তি থেকে কামনা, কামনা থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে মোহ, মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম। স্মৃতিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ। বুদ্ধিনাশে মহাবিপদ। জীবন সংশয়ের মুখোমুখিও হতে পারে।

এসবে মনকে না রেখে, আত্মসাধনায় মগ্ন থাকলে, পূর্ণমাত্রায় শান্তি-আনন্দ মেলে।

যে কদিন গয়ায় ছিল স্বপ্নমায়া, আত্মসাধনার পাঠ প্রতিদিন নিয়েছে ত্যাগানন্দের কাছ থেকে।

ইন্দ্রিয় অনুভূতি থাকলে যত অনাসৃষ্টি। দেহে থেকেও দেহাতীত—সমস্ত ইন্দ্রিয়-রিপুর ওপরে আমি এ চিন্তায় মানুষ দুঃখ-সুখের ওপরে চলে যায়। অর্থাৎ তার মনে কোন ব্যথা-বেদনা রেখাপাত করে না কখনো। জগতের প্রকৃত ব্যাপারটা নখদর্পণে এসে যায়।—কিসের সুখ, কিসের দুঃখ। কিসেরই বা মোহ। যে কারো নয়, তার নিজেরও নিজে নয়, তখন বৃথা আমার ভেবে নেয়া।

আমি থেকে আমি নেই, কেমন করে এ চিন্তা আসবে? স্বপ্নমায়া বিনয়ের সুরে জানতে চেয়েছে।

ধ্যানের পদ্ধতি সহজ-সরলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন ত্যাগানন্দ।

অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে সমস্ত। গ্রহ-নক্ষত্র সব। গাঢ় অন্ধকার। আমিও নেই। একটি মাত্র জ্যোতির বিন্দু অন্ধকার ফুটে বেরিয়ে আসছে। আবার ফুটে উঠছে।

জ্যোতির্বিন্দু বড় হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। তার মধ্যে আমি। রক্তমাংসের শরীরের নয়। জ্যোতির। বড় বিন্দু আমাকে নিয়ে ছোট হয়ে এল আস্তে আস্তে। মিলিয়ে গেল। আবার বেরোল ছোট হয়ে। ছোটর মধ্যে আলোর ছোট আমি। বিন্দু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও বড় হয়ে উঠছি। আবার ছোট হতে হতে একেবারে মিলিয়ে যাওয়া। আবার বেরিয়ে আসা··।

যতটুকু পারা যায় মিলিয়ে যাওয়া আর বেরিয়ে আসা—এই ধ্যানে নিজেকে তন্ময় করে রাখা। পৃথিবীর সকল জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাবে এতে।

নিজের অবচেতন মনকে প্রতিরাতে শোবার সময় নির্দেশ দেবে। মৃদু হেসে বললেন ত্যাগানন্দ। এতে লোকের জ্ঞানচক্ষু খুলবে। শোকতাপের মিথ্যে হাহাকার থেকে রেহাই পাবে।

মনে মনে বলবে, আত্মা অমর। আত্মাই সব। কেউ কারো নয়, কে কার। আমার মনের কথা সকলের মনে প্রভাব বিস্তার করবে। নিশ্চয় করবে।

বেশীক্ষণ নয়। এক কথা এক মনে পাঁচ-সাতবার বললেই চলবে।

যার কথা মনে করে বলবে, ভাববে—তুমি যেন তার সামনে গিয়ে বলছ। ফল ফলবে। তারা প্রকৃত জিনিস বুঝে কারো অবর্তমানে কেউ পাগল হয়ে উঠবে না।

ত্যাগানন্দের দর্শনে-স্পর্শে সত্যি সত্যিই আবার নবজন্ম হয়েছে স্বপ্নমায়ার। স্বপ্নমায়া নতুন জগতের মানুষ যেন। ত্যাগানন্দের উপদেশ নির্দেশ শাস্ত্র ব্যাখ্যা ধ্যানধারণা অদ্ভুত অনুভূতি এনে দিয়েছে। দিয়েছে অপরিসীম আনন্দ, অফুরন্ত প্রশান্তি।

ত্যাগানন্দের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে গয়া থেকে শুভযাত্রা পথে পা বাড়িয়েছে চন্দ্রশোভারা।

কলকাতায় ফিরে এসেছে সকলে নির্বিঘ্নে-নিশ্চিন্তে। বাড়িতে সকলের ভেতর একটা নতুন স্বাদের আনন্দের রেশ খেলা করেছে কিছুদিন। সংসারের নানান চাপে রেশ নিঃশেষ হয়ে গেছে পরে। কিন্তু স্বপ্নমায়ার নিঃশেষ হয় নি। বরং পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে দিনে দিনে।

বছর দুই বেশ কাটল হেসে খেলে। বাড়ির প্রত্যেকের মুখে পরিতৃপ্তির আভা। কিন্তু আড়াই বছরের মাথায় সে-আভা অদৃশ্য হয়ে গেল আচমকা। তার জায়গায় চেপে বসল ত্রাস আতঙ্ক।

সকলের হারাই-হারাই ভাব। স্ত্রী স্বামীকে বলছে, কে কার স্ত্রী! স্বামী স্ত্রীকে বলছে, কে কার স্বামী! নিজের দেহ নিজের নয়। সব মিথ্যে। আত্মা, আত্মাই সত্যি।

বিচিত্র ব্যাপার। যেখানে একজনের বিচ্ছেদে অন্যজনের বাঁচা দায়, সেখানে কেউ কারো মুখ দেখতেই চাইছে না! যেন অচেনা-অজানা। হারিয়ে যাচ্ছে মায়া, হারিয়ে যাচ্ছে দয়া, হারিয়ে যাচ্ছে ভালবাসা আর অন্তরের টান।

এই সর্বনেশে ব্যামোর হাত থেকে কেউ কাউকে রক্ষে করতে পারছে না। বৃথা চেষ্টা। আজ যে স্ত্রী স্বামীর আনমনা ভাব দেখে বোঝাতে চেষ্টা করল। তার দিকে মন ফেরাতে চেষ্টা করল। কাল সে নিজেই আবার স্বামীকে বলে বসল, কে স্বামী…।

হৃদয় ছিন্নভিন্ন করে দেয়ার খেলা চলছে বাড়িময়।

সবার মুখে এক কথা—স্বপ্নমায়ারই কাণ্ড। চব্বিশ ঘণ্টা 'কেউ কারো নয়, কেউ কারো নয়' ফুসমন্তর কানে দিচ্ছে লোক ধরে ধরে। আর সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার ওর কথা হেলাফেলা করছে না তো কেউ। বরং যে শুনছে, সে একেবারে দৈবের আদেশ শুনছে যেন স্বকর্ণে। দিনে এই পর্ব। রাতে আবার আরো আশ্চর্য ব্যাপার। স্বপ্নমায়া সশরীরে প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে বলে আসছে। স্বামীকে বলছে, কে কার স্ত্রী। স্ত্রীকে বলছে, কে কার স্বামী। মন ঘুরে যাচ্ছে স্ত্রীর। মন ঘুরে যাচ্ছে স্বামীর। দুজনেই দুজনকে বলছে, স্বপ্নমায়ার কথাই ঠিক।

স্বপ্নমায়া বলে কিনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য রাতে ওকে তালা বন্ধ ঘরে রাখা হয়েছে। তবুও নিজের ঘরে দেখেছে স্বপ্নমায়াকে স্বামী, দেখেছে স্ত্রীও।

সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য বাড়ির লোকেরা এসে দাঁড়িয়েছে স্বপ্নমায়ার ঘরের দরজায়। সেইরকম তালা বন্ধ। জানলার পরদা সরিয়ে রেলিংয়ের ফাঁকে চোখ রেখে দেখেছে স্বপ্নমায়ার জেঠিমা—চন্দ্রশোভার মা আর চন্দ্রশোভা নিজে। শুয়ে ঘুমোচ্ছে স্বপ্নমায়া আগের মতন।

বাড়ির লোকেরা জড়ো হয়েছে চন্দ্রশোভাদের ঘরে। রীতিমতো জটলা চলছে স্বপ্নমায়াকে নিয়ে। ব্যাপারটা হল কি তাহলে! যে মানুষ ঘুমোয়, সে কেমন করে যায় অপরের ঘরে। নিশ্চয় কোন রহস্য আছে। ওর রূপ ধরে··।

স্বপ্নমায়া আসছে।

দেখতে পেয়ে, যে যেদিকে পারল কালবিলম্ব না করে গা ঢাকা দিয়েছে। ফাঁকা ঘরে একা চন্দ্রশোভা।

প্রবেশ করেছে ঘরে।

অবাক হয়ে গেছে। এরা গেল কোথায়!

চন্দ্রশোভার চোখে মুখেও বিস্ময়। জিজ্ঞেস করেছে, এসময়ে তুই···।

—আমায় যে ডাকছিল সকলে।

চন্দ্রশোভা নিজের খাটে শুইয়েছে নিজের পাশে স্বপ্নমায়াকে। কত-

দিন একসঙ্গে শুয়েছে দুজনে। শিশুর মতন ঘুমিয়ে পড়েছে স্বপ্নমায়া। স্বর্গীয় আনন্দের আমেজ ছেয়ে গেছে নির্মল-ঘুমন্ত মুখে।

চোখে ঘুম আসছে না চন্দ্রশোভার। রাত যে অনেক বাকি এখনো। স্বপ্নমায়ার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। দেখছে. অনেক কিছু দেখছে। স্বপ্নমায়ার অন্তর-বার। আগের স্বপ্নমায়া, পরের আর অজকের।···

রাত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। আপনার নিয়মে আসে, আবার চলে যায় নিয়মের পথ ধরে। চলে গেল।

ভোরের আলো পুব জানলায়। লাল আভা আকাশে উঁকি মারছে। লালের ভেতর থেকে সোনার আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে ঘরে এসেছে। ওপাশের মোরাদাবাদী ফুলদানের বাসি গোলাপ তোড়ায় কি সুবাস নিচ্ছে এত।

সন্ধ্যের সুবাস ফুরিয়েছে সকালে। যেটুকু আছে, তাও ফুরোবে আর একটু পরে। ঝরবে পাপড়ি। ওরা যে ফুটেছিল, এসেছিল—প্রমাণ থাকবে শিল্পীর তুলির আঁচড়ে। ছবিতে। তাতে কি সত্যি-কারের মন ভরে। গোলাপের পাপড়ি ছোঁয়ার অনুভূতি কি সত্যিসত্যি আসে? সত্যি কি ওই সুবাসের একটুও বাতাসে ঢেউ তুলে বেড়ায়?

স্বপ্নমায়ার ঘুম ভেঙেছে। ফিক করে হেসে ফেলেছে চন্দ্রশোভার চোখে চোখ পড়তে। বলল, কি দেখছিস রে? দেহ কিছু নয়। কেউ কারো নয়।···

মনে পড়ছে চন্দ্রশোভার ত্যাগানন্দকে। ওকে উপদেশ দিয়েছেন, তুমি লোকের মঙ্গল করবার ইচ্ছে রাখবে মনে সদাসর্বদা। যা সত্যি, যাতে কারো কোন কষ্ট না হয় ভবিষ্যতে—সে কথা শোনাতে কোন বাধা নেই। ঘুমোবার আগে মনে মনে বলে নেবে যাকে যা বলবার। তুমি বলছ, নিশ্চয় সে শুনবে। নিশ্চয়। একথা নিজের মনকে শোনাতে হবে পাঁচ সাতবার—আমি যা বলব, শুনবে! শুনবে, শুনবে।

তোমাকে চিন্তা করতে হবে—তুমি যেন সশরীরে গিয়ে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের নির্দেশ দিচ্ছ! চোখের সামনে ত্যাগানন্দের

বোঝানোর দৃশ্য ভেসে উঠেছে চন্দ্রশোভার। ভেতরের কানে যে উপদেশ ধরা ছিল সেদিনের, আবার শুনতে পাচ্ছে যেন বাইরের কানেও। তবে কি স্বপ্নমায়া নিজের গভীর চিন্তায় রাতে ঘরে থেকেও মনের শরীরে চলে আসে লোকের কাছে? ত্যাগানন্দের ধ্যানধারণা এত আয়ত্ত করে ফেলেছে নিষ্ঠা বিশ্বাসের জোরে!

চন্দ্রশোভা জিজ্ঞেস করল স্বপ্নমায়াকে, একটা কথা বলবি? রাত্তিরে তোর মতো কে আসে রে?

হাসতে হাসতে বলল স্বপ্নমায়া, কে আবার, আমিই আসি। এ শরীরে নয়, চিন্তার শরীরে।

খুব হাসছে। দমফাটা হাসি। হাসি থামতে বলল, কেন খারাপ কিছু করি কি? আমার কি হয়েছিল বলতো। ত্যাগানন্দ প্রকৃত জিনিস জানিয়ে দিয়ে কি শান্তি কি আনন্দই না দিয়েছেন।

আমি চাই না ভুল করে আমার কষ্টের মতো কেউ কষ্ট পাক। আমি চাই, আমার আনন্দের মতন সবাই আনন্দ পাক, শান্তি পাক। ওরা মিথ্যে শোক-তাপ থেকে মুক্তি পাক। এটা ভাল নয় চন্দ্র? তুই বল।

চন্দ্রশোভা উঠে বসে, গালে হাত দিয়ে শুনছে নিবিষ্ট মনে। স্বপ্ন তো সকলের মঙ্গলই চায় দেখছে সে! দোষ কোথায়! ঠিকই বলে। আগে থেকে সব জানা থাকলে, শত আঘাত এলেও মানুষ ভেঙে পড়বে না। অতিরিক্ত ভেঙে পড়লে, চতুর্দিকে শূন্য দেখলে—মানুষের মনের ওপর কি ভীষণ যে চাপ পড়ে, তার ফল যে কি হতে পারে—জ্যান্তে মরা—সে দৃশ্য দেখেছে স্বপ্নমায়ার বেলায়। আর যেন কারো না দেখতে হয় বেঁচে থাকতে!

স্বপ্নমায়াও উঠে বসেছে। বলল, কি রে! তুই হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলি কেন? আমার উত্তর দিলি না তো—ভালো কি মন্দ?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চন্দ্রশোভা বলল, ভাল, ভাল—নিশ্চয় ভাল।

স্বপ্নমায়া জড়িয়ে ধরেছে চন্দ্রশোভাকে বুকভরা আনন্দের পরশ নিয়ে।
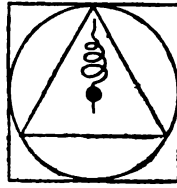
আবার বাইরে যাবার হিড়িক পড়েছে বাড়িতে। ঠাকুরমা গঙ্গোত্রী যাবে। অনেকে বাধা দিচ্ছে, দুর্গম পথ, তার ওপর বয়সও অনেক, আর কেন নিজের বাড়িঘর ছেড়ে পথেঘাটে মৃত্যু শেষে!

ঠাকুরমা বলে, তা হোক। সারাজীবন সংসার নিয়ে রইলুম। এখন ছাড়ো দিকিনি সবাই। পরকালের কাজ আমার হল কই! তীর্থে মৃত্যু তো পুণ্য।

সব সময়ে আবার সঙ্গী পাওয়া ভার। পাশের বাড়ির জ্ঞানদা-মোক্ষদারাও যাচ্ছে। ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক ওদের সঙ্গে। ঠাকুরমার পাতানো বোন বলে মনে হয় না! মনে হয়, নিজের। জ্ঞানদা-মোক্ষদার ছেলেরাও যাচ্ছে মাকে নিয়ে তীর্থ করাতে। মাতৃভক্ত ছেলেরা বটে। মাকে পুণ্যি করাবার জন্য কি ব্যতিব্যস্ত। এবাড়িতে খালি সব কাজে বাধা। মরে যাবে, আর মরে যাবে। আরে মরণ তো একদিন আছেই। কে কবে অমর হয়ে থেকেছে পৃথিবীতে। 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে।' রামচন্দ্রকে যেতে হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণকে যেতে হয়েছে। কাকে নয় শুনি?

ছেলেদের মুখে খালি, কিস্যু ভাবনা নেই মা। ঘটা করে এমন শ্রাদ্ধ করব। পাড়ার লোকের চক্ষুস্থির হয়ে যাবে। আত্মার সঙ্গতি হবেই তোমার। একেবারে বৈকুণ্ঠধামে গমন।

মাগো মা। মনের ইচ্ছে মনেই রয়ে গেল। ম'লে নাকি হবে। এ-ও বিশ্বাস করতে হবে। হেসে হেসে বলেছে ঠাকুরমা পরানীঝির-মাসির কথা—জ্যান্তে দিলে না ভাতকাপড়, মলে হবে দানসাগর।

পাশের বাড়ির ওরা দলবল বেঁধে যাবে। অতএব একদম সুযোগ হারাতে রাজি নয় ঠাকুরমা।

বাইরে বেরোনোর জন্য গোছানো-গাছানো হয়ে গেল সমস্ত তড়ি-ঘড়ি। সঙ্গে স্বপ্নমায়াও যাবে। স্বপ্নমায়া যাবে শুনে চন্দ্রশোভা নাছোড়বান্দা। ও আর শুভ্রাঞ্জন যাবেই।

ওদের মুখের দিকে চেয়ে থেকেছে ঠাকুরমা। তারপর বলেছে, আমার মতন পাকা মাথা হলে যাস্। এ বয়সে তোদের আবার এ সমস্ত বাতিক এল কেন?

ওদের ধনুকভাঙা পণ। কথার মারপ্যাঁচ শুনতে চায় না ওরা। যাবে বলেছে তো, যাবেই।

তা তো যাবেই। এ বংশের মেয়েপুরুষের রক্তে বয়ে চলেছে সর্বনেশে জেদ। বংশের মর্যাদা রাখতে হবে না?

পানের খিলি মুখে পুরেছে ঠাকুরমা।—তীর্থে আবার খেতে পারব না। হ্যাঁ-লা, দাঁড়িয়ে কেন? জিনিসপত্তর কি নিতে হয়, ঠিক ক'রে নে। যাবার দিনে কোন অজুহাত শুনব না বলে দিচ্ছি। এতটুকু সময় অপেক্ষা করব না।

চন্দ্রশোভা স্বপ্নমায়ার হাত ধরে হাসিমুখে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

·· গঙ্গোত্রী যাবার পথে ভাটোয়ারী হয়ে এগিয়ে চলেছে সকলে। পাহাড়ী রাস্তা, উঁচু-নিচু ঘোরানো ফেরানো। চীরগাছের সারি আর ঝরনা পেরিয়ে পাহাড়ের কাছ বরাবর পোঁছুতে শুভ্রাঞ্জন বিশ্রাম নিতে বলল। পাহাড়ের খালি গুহা আছে ছুটো। লোকজন সাধু-সন্ন্যাসী নেই কেউ। পরিষ্কার করে থাকা যাক না ছুদিন। দরজাও রয়েছে। তেমন অসুবিধে হবে না কোন।

শুভ্রাঞ্জনের কথায় সায় দিল প্রথমে ঠাকুরদা—উত্তম প্রস্তাব।

ঠাকুরমা বলল, যেতে যেতে থেমে গেলে আবার কোন বিপত্তি না ঘটে। শুভ কাজে নানান বখেড়া।

—ওসব মনগড়া। ওঁর আর কি! লোকের কাঁধে চেপে চলেছেন উনি। মাটিতে পা পড়ছে না। কষ্টটা বুঝবেন কেমন করে। এখানেই থাকা হবে।

পর পর দুদিন বেশ কেটেছে এই পাহাড়ী জায়গায়। কখনো রোদ কখনো বৃষ্টি। কখনো মেঘ আকাশ থেকে নেমে আসছে পাহাড়ের ওপর। কখনো আকাশের নীল আলো।

শুভ্রাঞ্জন প্রত্যেককে হাসিখুশিতে মাতিয়ে রেখেছে। এখানে এসে আগের মতন সহজ হয়ে গেছে আবার। স্বপ্নমায়াও অতিচেনা মানুষকে অচেনা ভাবছে না ত্যাগানন্দের দয়ায়। শুভ্রাঞ্জনের সঙ্গে প্রাণখুলে কথাবার্তা কইছে খুব। এতে চন্দ্রশোভা দারুণ খুশী।

পাহাড়ের ওপর উঠে যায় স্বপ্নমায়া-শুভ্রাঞ্জন। বসে বসে অনেক গল্প করে দুজনে। ভাল লাগে চন্দ্রশোভার। ও-ও ওদের গল্পে যোগ দেয়। কোন রকমের সন্দেহ উঁকি দেয় নি মনের কোণে।

শুনেছে, আত্মা-পরমাত্মার কথা। অর্জুন আত্মা, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা। শ্রীকৃষ্ণ যেমন চালাত অর্জুনকে, অর্জুন তেমনি চলত। পরমাত্মা যেমন চালায় দেহের আত্মাকে—শক্তিকে, তেমনি চলে আত্মা শক্তি। তেমনি চালায় দেহকে আবার আত্মা। পরমাত্মা নিজেই অনন্ত শক্তি।

হ্রৌং বীজ জ্যোতি বীজ। অপরের মনকে আদেশ করতে গেলে, নিজের সৎপ্রভাব বিস্তার করতে গেলে, 'হ্রৌং' বীজ জপ।

কপালে মধ্যিখানে 'হ্রৌং' বীজ জ্বল জ্বল করছে শুভ্র জ্যোতিতে মাখামাখি হয়ে। ক্রমে নেমে এল ভেতর দিয়েই। কণ্ঠে এসে স্থির হল। যত কথা কণ্ঠে 'হ্রৌং' বীজের স্পর্শে জ্যোতির অক্ষর হয়ে উঠেছে।

যাকে কিছু বলা হচ্ছে, তার মাঝখানের কপালে গিয়ে জ্যোতি-অক্ষর আঘাত করছে। মিলিয়ে গিয়ে প্রবেশ করছে। তারপর ভেতর দিক দিয়ে তার মাথার পেছনে জমা হচ্ছে সমস্ত অক্ষর। তারপর মনে দাগ কেটে কেটে বসছে এক এক করে। এই কথার মর্মার্থ নিয়ে তারই অবচেতন মন ঠিক পথে চালাবে তাকে। সত্যি রাস্তায় নিয়ে যাবে।

গোড়ায় বোঝে নি চন্দ্রশোভা এ বোঝানোর কি মর্ম। আর তাছাড়া ত্যাগানন্দ এসব উপদেশ উপযুক্ত পাত্র ভিন্ন কারো কাছে বলতে মানা করে দিয়েছে। কি উপযুক্ত পাত্র পেয়েছে স্বপ্ন চন্দ্রকে, তা নিজেও জানে কি?

উল্টোদিকে না উজান বয় শেষে।

ভাবতে যেটুকু দেরী হয়েছে চন্দ্রশোভার, কাজে কিন্তু খুব শীগগির ঘটে গেছে কাউকে চিন্তা-ভাবনার সময় না দিয়েই। বনের অনেক পশু যেমন বিপদের আঁচ পায় বাতাস শুঁকে। কোন্ দিক থেকে আসছে, ধরে নিতে পারে—চন্দ্রশোভাও কি ঠিক পারছে তাই ? পারছে না বোধ হয়। মনের ধারণা ছাড়া সত্যি কিছু নয়, সত্যি কিছু নয়।

তৃতীয় দিনে সকাল থেকেই মাথাটার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে কেমন। শুভ্রাঞ্জন না এলে পারত। শুভ্রাঞ্জনের কি একাই দোষ ? চন্দ্রশোভারও তো সম্পূর্ণ ইচ্ছে ছিল।

ভোরের কথাটা কানে যেতে চমকে উঠেছে। এ কি ? এ যে তার ঘরে সর্বনাশ উপস্থিত। শুভ্রাঞ্জন বলছে, স্বপ্ন ঠিক বলেছে। কে কার স্ত্রী, কে কার স্বামী। আধাঘুমে বলে চলেছে বিড়বিড় করে শুভ্রাঞ্জন।

নিজের কপাল চাপড়েছে চন্দ্রশোভা নিজে।

বেলা একটু বাড়লে স্বপ্নমায়া শুভ্রাঞ্জনকে নিয়ে পাহাড়ে উঠতে চেয়েছে। নিচের চেয়ে ওপরটা বেশ ভাল। আকাশের কাছাকাছি পৌঁছনো যায় যেন। যাবার আগে বিদায় নিয়ে আসা যাক।

চন্দ্রশোভা বাধা দিয়েছে দুজনকে। যেতে হবে না আর, নিচে থেকে মাথা নুইয়ে বিদায় জানালেই হবে। ওঠা-নামা করে ক্লান্ত হয়ে পড়লে, চলতে কষ্ট বাড়বে বই কমবে না। কি যাচ্ছেতাই রাস্তা একে। বিশ্রামের জন্য যখন দু'দিন থাকা হল, এ সময়ে বিশ্রাম ফেলে ঝুটমুট পরিশ্রম।

গ্রাহ্য করেনি ওরা। ওপরে উঠতে শুরু করেছে স্বপ্নমায়া, শুভ্রাঞ্জন।

নিচে থাকতে মন চায় নি চন্দ্রশোভার। ও-ও পেছু পেছু উঠেছে ওপরে। নিজের কানকে অবিশ্বাস করবে কেমন করে ? স্বপ্নমায়ার স্বভাব যা হয়ে গেছে তাই করছে ও। ওর মোক্ষম মন্ত্র কানে ঢালছে শুভ্রাঞ্জনের। কে কার স্ত্রী, কে কার স্বামী। আত্মাই সব।

চন চন করে রক্ত উঠে গেছে মাথায়। দৌড়ে গিয়ে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিয়েছে স্বপ্নমায়ার গালে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলেছে, সর্বনাশী ! এতদিনে চিনেছি, মতলব বুঝেছি। নিজের সর্বনাশ হয়েছে

বলে সকলের সর্বনাশ করতে চাস তুই। আমারও—

হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে আসছে শুভ্রাঞ্জনকে। পেছু ফিরে দেখছে চন্দ্রশোভা রাক্ষুসী না এসে পড়ে। যতটা সম্ভব পা চালিয়ে চলেছে পড়িমরি করে। বিবেকশূন্য দিশেহারার মতন।

খাড়াইয়ের দিকে এসে পড়েছে শুভ্রাঞ্জন। নামছে সন্তর্পণে। যেটুকু খাঁজ-খোঁজ পাচ্ছে, ধরছে আঁকড়ে আঁকড়ে। ওদিকে স্বপ্নমায়ার করুণ চিৎকার, চন্দ্র ওদিকে নয়—ওদিকে নয়। ফিরে আয় বলছি। ফিরে আয়। শুভ্র, উঠে এস, উঠে এস।

কে কার কথা শোনে!

স্বপ্নমায়া বারণ শুনছে না দেখে, এগিয়ে আসছে। উৎকণ্ঠা-উত্তেজনায় আকাশ ফাটানো চিৎকার করে উঠল চন্দ্রশোভা! শীগগির, শীগগির। মহাপতকী এসে পড়ল বলে।

ভয়ে আঁতকে উঠেছে শুভ্রাঞ্জন। দৃষ্টিভ্রম হল বুঝি। পাথর ছেড়ে শূন্যে অবলম্বন ধরতে গিয়ে যা ঘটবার তাই ঘটল। অত উঁচু থেকে একেবারে নিচে। দুচোখে হাত চাপা দিয়ে বসে পড়েছে চন্দ্রশোভা। জোরে কেঁদে উঠেছে। বাঁচাও, বাঁচাও!
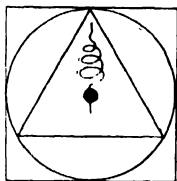
গঙ্গোত্রী যাওয়া আর হল না ঠাকুরমার। চোখের জল মুছতে মুছতে ফিরে আসতে হয়েছে শেষে। চন্দ্রশোভা তো কাঁদছেই। চিরজীবনের সম্বল এখন কান্না আর কান্না।

চন্দ্রশোভাকে মা বলে জানে না অরুণিমা। জানে, শাশুড়ী ওর মা। হবার পর চন্দ্রশোভা শয্যাগত ছিল অনেক দিন। নানান অসুখে ভুগেছে। একটার পর একটা। এমন অবস্থায় এসে পড়েছিল, বাঁচে কিনা সন্দেহ।

শাশুড়ীই কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। ছাড়ে না কারো কাছে। মায়ের কাছেও না। বছর দুয়েকের হল। মাকে চিনল না।

একদিন চিনবে, তখন চন্দ্রশোভা বাপের ব্যাপারে কি জবাব দেবে অরুণিমাকে! ঝর ঝর করে চোখের জল ঝরছে। শাশুড়ীর কাছেই বা কি মুখ নিয়ে দাঁড়াবে। স্বামীহারাকে কি সান্ত্বনা দেবে।

বাড়িতে শোকের ছায়া।

চন্দ্রশোভাকে নিয়ে শুধু নয়। স্বপ্নমায়াকে নিয়েও। স্বপ্নমায়া আসে নি ফিরে। কিছুতেই আসতে চায় নি। ত্যাগানন্দের নির্দেশ পালন করে যাবে ওই গুহায় বসে। আত্মসাধনা নিয়ে মগ্ন থাকবে জীবনভোর। তার জন্য কারো ভাবনা-চিন্তার কারণ নেই। একা থাকার জন্য ভয় কি?

আত্মাকে কে জ্বালাবে কে আঘাত করবে কে অনিষ্ট করবে। আত্মা অমর! মরে না পোড়ে না জলে ভেজে না। আমিই আত্মা। ঠিক আছি। ঠিক থাকব। বলে, গুহায় প্রবেশ করেছে স্বপ্নমায়া। সকলের জলে ভেজা চোখের সামনে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে ভেতর থেকে।

ফিরে এসেও নিস্তার নেই চন্দ্রশোভার স্বপ্নমায়ার এদৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে রাতে দিনে বার বার। ভুল করেছে চন্দ্রশোভা। শুভ্রাঞ্জনকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছে নিজেই। স্বপ্নমায়া ওধারে যেতে নিষেধ করেছে। শোনে নি। মতিভ্রম আর কাকে বলে। দুর্ভাগ্য তার। ওধারে টানা হেঁচড়া করে নিয়ে না গেলে এমন হত না হয়ত।

স্বপ্নমায়ার গায়ে জীবনে হাত তোলে নি। হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে তাই করে বসল। মাথায় ভূত চেপে গেছল যেন। ওকে ভালো করে জেনেও যা-তা ভাষা উচ্চারণ করেছে মুখে। কেমন যেন একটা অজ্ঞান পাগলামো পেয়ে বসেছিল ওই সময়!

স্বপ্নমায়া তো যেতে বারণ কবেছে চন্দ্রশোভাকে প্রথমে। চন্দ্র! যাস নি। ঘুরে আসছি আবার আমরা। বাচ্চা মেয়েটা যদি খোঁজে, কি বিপদ হবে বলতো!

—রাখ দিকি—নি। ও কস্মিনকালে খুঁজবে না আমায়। যা শাশুড়ী রয়েছে—নিশ্চিন্ত।

অনুতাপ দুঃখু ব্যথা শোক—চারটে মিলে একসঙ্গে বুক চেপে ধরে চন্দ্রশোভার। মৃত্যু হলে বাঁচে। না। বেঁচে থেকে যন্ত্রণা পাক সে। তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাক। ভুলের মাশুল দিতে হবেই।

দীর্ঘদিন হয়ে গেছে। প্রায় দু যুগ বললে চলে। আজ বুড়োদের কোঠায় এগিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে চন্দ্রশোভা। মাথার চুল রুপোলী। চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ।

এতদিনের মধ্যে একদিনের জন্যও স্বপ্নমায়ার নাম না করে জল খায় নি চন্দ্রশোভা। সকলকে মন থেকে সরিয়ে রাখা যায় তবু কিছু সময়ের জন্য, কিন্তু স্বপ্নমায়াকে কিছুতেই সরানো গেল না। ও যেন ইষ্টদেবতা। ওর নাম ওর ধ্যান না করে জলগ্রহণ করা চলবে না। কেন? কেন এমন হয়?

এ প্রশ্নের সমাধান করতে পারে নি আজো।

এক এক সময়ে প্রবল ইচ্ছে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ওকে দেখবার জন্যে মন ছুটে যায় ওই গঙ্গোত্রী যাবার পথে ওই পাহাড়ের ওই গুহায়। কেমন আছে স্বপ্নমায়া? এখন কি অবস্থায়? বলেছিল, যাবার আগে মানা করার সময়—ফিরে ত আসছি আবার আমরা।

ফেরা আর হল না ওর। কার জন্য? চন্দ্রশোভার জন্য কি নয়? নিশ্চয় তারই জন্য। সেও তো চেয়েছে, এ আপদ না ফেরে আর। একবারও বলেনি, ফিরে চ'। মনের অবস্থা তেমন ছিল না। এখন ও তার চোখের বিষ।

শুভ্রাঞ্জনকে বার বার ঠেলে দিয়েছে স্বপ্নমায়ার কাছে চন্দ্রশোভা নিজে। স্বপ্নমায়া বলেছিল, শুভ্রকে নিয়ে গিয়ে আবার মিছিমিছি অত কষ্ট দিবি কেন? বয়েস হলে যাবে'খন। এখন কেন?

—তোর বুঝি বয়েস হয়েছে অনেক?

—তুই বুঝবি কি, আমার বয়েসের কি গাছ-পাথর আছে নাকি!

আত্মার বয়েস গুনে শেষ করা যাবে না সারা জীবনে। বলে, হেসেছে খুব স্বপ্নমায়া।

বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে চন্দ্রশোভার।

অরুণিমার এখন বয়স প্রায় ছাব্বিশ। দেবরতনের বত্রিশ। মেয়েকে বলেছে, গঙ্গোত্রীতীর্থে যাবার বড় সাধ। মরণের আগে পূর্ণ হবে কিনা জানে না। সদাসর্বদা মন পড়ে থাকে ওখানে।

অরুণিমা দেবরতনকে জানিয়েছে।—মাকে আমরা না নিয়ে গেলে, কে নিয়ে যাবে আর বল? আমি ছাড়া আর একটা নেই যে···। আমরাই ছেলে আমরাই মেয়ে। বলতে গেলে আমরাই সব। যা মরণের খবর শুনছি জানাশোনা লোকেদের মধ্যে থেকে, ভয় ধরে। মায়ের আশা পূর্ণ হবে না।

দেবরতন মত দিয়েছে নিয়ে যাবার। ছেলের বয়স দশ, মেয়ের আট। দুজনেই দার্জিলিংয়ে পড়ছে। ওদের জন্য ভাবনা নেই কোন। নিজের একরকম ঝাড়া-হাত পা। অর্থাৎ দেখাশোনার দায়দায়িত্ব থেকে উপস্থিত মুক্ত।

আবার সেই জায়গা।

ভাটোয়ারীর আগে পর্যন্ত বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চন্দ্রশোভার। ভাটোয়ারী পেরিয়ে যাবার পর কেমন থিতিয়ে পড়তে লাগল। ও ঝিমিয়ে পড়ছে।

এখানকার বাতাসে কি এখনো সেই ঘটনা ভেসে বেড়াচ্ছে? এখানকার মাটিতে এখনো কি সেই মর্মান্তিক দৃশ্যের ছবি আঁকা রয়েছে। যে মন নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, যে মন নিয়ে এতখানি পথ অক্লেশে এসেছে, সে মন হারিয়ে যাচ্ছে। ভয় ভয়। চতুর্দিক থেকে ঘন কালো ত্রাসের ছায়া এগিয়ে আসছে। ঘিরে ধরছে তাকে।

অরুণিমা-দেবরতনকে এ রাস্তায় যেতে বারণ করেছে চন্দ্রশোভা। এটায় তাড়াতাড়ি হবে, ওরা বুঝিয়ে দুজনে দুপাশের দুহাত ধরে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

চন্দ্রশোভার বুক কাঁপছে। চেপে ধরেছে হাতে। পা চলছে না

আর। সেই পাহাড়, সেই গুহা। কাছাকাছি এসে পড়েছে। গুহার দরজার ফাঁক দিয়ে যে ধোঁয়া বেরোচ্ছে সরু রেখা ধরে বাইরে, কি করে ছড়িয়ে পড়ছে অত! অনেক জায়গা জুড়ে ঘন হয়ে উঠছে। ধোঁয়ার সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে সব।

হাঁপিয়ে উঠছে। বাতাস বড্ড ভারী। দম নিতে খুব কষ্ট। পা তুলতে পারছে না আর। চলবে কেমন করে। দেহের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলছে। বসে পড়ল।

নিজেকে একটু ঠিক করে নেবার জন্য অরুণিমা-দেবরতনকে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে দেখতে বলেছে। বলেছে, আমি এখানে একটু বিশ্রাম করে নি। চোখের সামনে থেকে তাড়াতাড়ি সরাতে চাইছে ওদের। নিজে না বেসামাল হয়ে পড়ে শেষে।

এমনিতে মা রাশভারী। ঘাঁটাতে সাহস করে না কেউ। তবু তো ওদের অনুরোধে এপথ দিয়ে এসেছে। গোঁ ধরলে কারো সাধ্যি নেই যে, একচুল নড়ায়। যদিও অরুণিমা-দেবরতনের মোটেই ইচ্ছে ছিল না চন্দ্রশোভাকে ছেড়ে যেতে, যেতে হল।

ভয়—ওর অবাধ্য হলে না আবার বলে বসে আর এগোবে না। ফিরে যাবে।

অরুণিমা-দেবরতন এদিক ওদিক দেখতে দেখতে পাহাড়ের কাছ বরাবর আসছে। দেখে, মাথাটা কেমন যেন হয়ে গেল চন্দ্রশোভার। বিভীষিকার দৃশ্য দেখছে। কি ভীষণ ত্রাস। ওদের কাছে ডেকে না আনলে, যে কোন মুহূর্তে ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে যেতে পারে।

ডাকতে চেষ্টা করছে। গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। দুরমুশ পিটছে বুকে কে?

একি করল চন্দ্রশোভা!

নিজের খেয়ালখুশির বশে মারাত্মক ভুল করল আরো একটা। এখানে এল কেন? কেন?

ওই রাক্ষুসে গুহার কাছে এগোচ্ছে অরুণিমা-দেবরতন। দরজা খুলে বেরিয়ে আসবে এক্ষুনি শঠের শিরোমণি মায়াবিনী। ওর কথায়

সম্মোহন, ওর হাতছানি দিয়ে ডাকায় সম্মোহন, হাসিতেও।

সর্বনাশী রাক্ষুসী মহাপাতকী ও।

ওর হাত থেকে কেমন করে দেবরতনকে বাঁচাবে! মানুষকে মরণ ফাঁদে ফেলে ওর মহানন্দ।

গুহার দরজা খুলেছে। বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে কে ও? স্বপ্নমায়া। সেই স্বপ্নমায়া। হ্যাঁ। ডাকছে কাছে অরুণিমা-দেবরতনকে। মুখের কথায় নয়, হাতের ইশারায়।

কেমন করে চব্বিশ বছর আগের সেই চেহারা থাকতে পারে স্বপ্নমায়ার! সেই কুচকুচে কালো চুল।

চন্দ্রশোভা দেখছে, পাহাড়ের ওপরে বাঁচবার জন্য এদিক ওদিক ঘুরে চলেছে শুভ্রাঞ্জন। স্বপ্নমায়ার হাত থেকে কি করে রেহাই পাওয়া যায়। পেছনে চন্দ্রশোভা। শীগগির নেমে পালাতে বলছে বার বার। ভুলপথে এলেও, পাহাড়ের খাঁজ ধরে ধরে নামবার চেষ্টা করছে প্রাণ-পণে। পেছু ফিরে দেখে, আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল চন্দ্রশোভা। এসে পড়ল যে। আতঙ্কে আলগা হয়ে গেল শুভ্রাঞ্জনের দুহাত।

চোখে হাতচাপা দিয়ে বসে পড়েছে চন্দ্রশোভা। বুকফাটা কান্নায় আকাশ বাতাস মুখর হয়ে উঠেছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনি ঘুরে বেড়াচ্ছে 'বাঁচাও, বাঁচাও।'

নিচের চন্দ্রশোভা আর পাহাড়ের ওপরের চন্দ্রশোভা একসঙ্গে কেঁদে উঠেছে যেন। দুহাতে চোখ ঢেকে কাঁদছে। স্মৃতি তো বিস্মৃতির অতলে চলে যায়। তবে এমন হল কেন? কেন তার স্মৃতির চোখ এত সচেতন হয়ে উঠল? কেন সেই নির্মম অতীতকে টেনে নিয়ে এল চোখের সামনে, যেন সত্যি সত্যি এই মুহূর্তে ঘটে গেল সমস্ত।

কান্না শুনে, দৌড়ে এসেছে অরুণিমা-দেবরতন। এসেছে স্বপ্নমায়া। চন্দ্রশোভার পাশে বসে পড়েছে। পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছে, ...আত্মার মৃত্যু নেই, কতবার বুঝিয়েছি তোকে।

চোখের হাত খুলে তাকাল চন্দ্রশোভা। বলল, তুই বেঁচে আছিস? হ্যাঁ, কেন মরব কিসের জন্য মরব।

চন্দ্রশোভার মহাভয়। ভয়চোখে তাকাচ্ছে একবার অরুণিমা-দেবরতনের দিকে, আর একবার স্বপ্নমায়ার দিকে। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। কাঁপা গলায় বলল, মেয়ে-জামাই।

স্বপ্নমায়া তাকিয়ে রইল খানিক।

চন্দ্রশোভার বুক ঢিব ঢিব করছে, কে জানে কি করে বসে!

হাসির-রেখা ফুটে উঠেছে স্বপ্নমায়ার ঠোঁটের ফাঁকে। পেছু ফিরল।

চলে যাচ্ছে। ফিরে তাকাচ্ছে না একবারও।

গুহায় প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

টসটস করে গাল বেয়ে চোখের জল ঝরছে চন্দ্রশোভার। ঝাপসা চোখে তাকিয়ে আছে। গুহার দরজা আর বুঝি খুলবে না।

স্বপ্নমায়া কে? আজো চিনতে পারল না তো চন্দ্রশোভা। ওকি তার মন, না আত্মা? না বিবেক বুদ্ধি? সত্যি কি স্বপ্নমায়া আছে? না ও স্বপ্ন, ও মায়া। ও কি চন্দ্রশোভার ভেতরের ছায়া? কে, কে ও?

স্বপ্নমায়ার ডানপাশে প্রথম মনোবীণা।

মনোবীণার জীবন বড় বিচিত্র ধরনের। জীবনযুদ্ধে কতো না ঝড়-ঝঞ্ঝার সংঘাতে মুখ-থুবড়ে আছড়ে পড়েছে। কি নিদারুণ মর্মবেদনার ছবি ফুটে উঠেছে মনের পরদায়। চিতোরদুর্গের ভেতর প্রবেশ করতে।

চিতোরদুর্গ।

এখানেও নিরাপদ নয়।

ঘোড়ার খুরের খট খট আওয়াজ। তলোয়ারের ঝনঝন। মৃত্যু-পথযাত্রীদের আর্তনাদ। এখানের আকাশে শোকের ছায়া, বাতাসে প্রিয়জন হারানোর কান্না।

এ শোক এ কান্না কি অনন্তকালের ?

এগিয়ে চলবে যুগ যুগ ধরে। থামবে না কখনো বোধ হয়। থামতে জানে না বুঝি।

ভেতরে দুরন্ত ঝড় বয়ে যাচ্ছে মনোবীণার।

একদণ্ড দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না আর।

ওই সর্বনেশে প্রদীপের আলো চোখের তারায় ভেসে উঠতেই যত অনাসৃষ্টি। তখন থেকেই স্থির হতে পারছে না এতটুকু। কোথা থেকে কতশত মুখ এসে ভিড় করছে আশেপাশে। কত ব্যথার নিশ্বাস ঝরে পড়ছে মাথায় গায়ে—অঙ্গে অঙ্গে।

প্রদীপের শিখা বড় হয়ে উঠছে ক্রমে।

লকলকে আগুন হয়ে উঠেছে। পতঙ্গের মতো ছুটে আসছে রূপসী ললনারা এক এক করে। নির্দ্বিধায় হাসিমুখে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আগুনে। সম্মান রক্ষার পরম বন্ধু এই আগুন। তাই জীবন উৎসর্গে এত প্রতিযোগিতা চোখেমুখে এত পরিতৃপ্তি।

এ যে নরক স্পর্শ করার আগের মুহূর্ত। বিজয়িনীর আত্মবিজয়। শুদ্ধ মুক্তআত্মার আনন্দমুক্তি এ যে, মহাপুণ্য ব্রত রমণীর। জহরব্রত।

চিতোরদুর্গে প্রবেশের সময় থেকেই মনোবীণার শোনা-স্মৃতির দরজা খুলে গেছে। পাগল ক'রে তুলেছে। মামাকে বলেছে, তোমরা যাও। বাইরের হাওয়ায় থাকি একটু।

মামা বলেছে, তা হয়না। তোকে নিয়েই তো যত ভয়। সঙ্গে যেতেই হবে। কুহকমের মতো আবার কারো পাল্লায় পড়লে তো গেছি।

এমন সময় মামা যে কুহকমের নাম করবে, ভাবতে পারেনি কেউ। মনমরা হয়ে গেছে মনোবীণা।

মামীর নজর এড়ায় নি।

পাশে এসে হাত ধরেছে, স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়েছে পিঠে। মুখে বিষণ্ণ হাসি। হাত ধরেই নিয়ে এসেছে ভেতরে। ইতিহাসের অক্ষয়কীর্তি অমরস্মৃতির আঙিনায়।

কালীমন্দিরে প্রদীপ জ্বলছে। অনির্বান। জ্বলে চলেছে অহর্নিশি। জ্বলছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে মনোবীণা।

দুর্গ রক্ষার জন্য কত রাজপুত বীর জীবন আহুতি দিয়েছে সম্মুখ সমরে। নির্ভীক হৃদয়ে। এরা মরণজয়ী। মরে বেঁচে থাকতে জানে।

মনোবীণা তো অনেকবার মরেছে জ্বলে জ্বলে। কই, বেঁচে থাকে নি তো তবুও। এখন তার দেহে তারই প্রেতাত্মা শুধু ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে মানুষের খোলসে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে দিয়ে।

মুক্তি হয়েছে রাজপুতদের, মুক্তি হয়েছে রাজপুতানিদের। কিন্তু মুক্তি হচ্ছে কই মনোবীণার? সত্যি, আগুন কি সত্যিসত্যিই মুক্তি দেয়। আঘাতের আগুন, হেনস্থা-অবহেলার আগুন আর নিজের ভেতরের প্রতিহিংসার আগুনে মুক্তি নেই কখনো কারো।

তার জলজ্যান্ত সাক্ষী প্রত্যক্ষ উদাহরণ মনোবীণা স্বয়ং। হয় না, হয় না। মুক্তি হয় না। হয় প্রেতাত্মা, বিভীষিকার দূত।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দুচোখে হাত চাপা দিল মনোবীণা।

প্রমাদ গনল মামী। সুন্দর সুন্দর থাম দেখে আর দরকার নেই।

দুর্গ থেকে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য মামাকে চোখের ভাষায় জানিয়ে দিল।

…বাইরে বেরিয়ে এসেও নিজেকে খুব একটা সামলাতে পারল না মনোবীণা।

ফোঁপাচ্ছে। বিড়বিড় করে একই কথা বলছে বার বার।—কুহকমের ব্যাপারটার জন্য কি আমিই দায়ী? রেণুপরাগের চলে যাওয়ার জন্য দায়ী আমি? আমি আমি আমি?

সারা শরীর কাঁপছে থর থর করে। চতুর্দিক শূন্য। ফিকে সবুজ আলো ঘন হয়ে উঠছে। অন্ধকার, মিশমিশে কালো অন্ধকার। অবলম্বন-হীন শূন্যে দুলছে যেন মনোবীণা। পড়ে যাচ্ছে। ধরে ফেলল মামী, মামীর বুকে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে।

মামীর বুকে যেভাবে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে মনোবীণা ঠিক সেইভাবে হাওড়ায় হাজারহাত কালীতলার কাছে কুহকমের ডেরায়ও হয়েছিল। অবিশ্যি সেখানে মামীর বুকে নয়, দিদিমার।

রেণুপরাগ আমেরিকায় গিয়ে আর ফেরেনি। শেষ চিঠিতে লেখা—মনোবীণার সঙ্গে দেখা আর হ'ল না। খুবই দুর্ভাগ্য। চলে যেতে হচ্ছে।

চিঠির বয়ানে মনোবীণা ভেঙে তছনছ হ'য়ে গেছে। যাকে বলে পাগল একেবারে। মাসের মধ্যে দিন দুই-তিন নিজেদের বাড়িতে, আর বাকিটা মামার বাড়িতে থাকতো বলে মায়ের চেয়ে দিদিমার ওপরই টান বেশী। আর দিদিমারও কম মমতা ওর ওপর নয়। বলতে গেলে মায়ের সমস্ত স্নেহ উজাড় করে ঢেলে দিয়ে মানুষ করেছে ওকে দিদিমাই। তার কারণও আছে যথেষ্ট।

রেণুপরাগের চিঠিটা যেন কেমন গোলমেলে। লোকটা বেঁচে, না জগৎ ছাড়া—ঠিক সন্ধান জানবার জন্যই কর্ণপিশাচসিদ্ধ কুহকমের কাছে যাওয়া। তাও বছর চারেক বাদে। অপর পক্ষের কাছ থেকে, শত চেষ্টাচরিত্র সত্ত্বেও কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে। ওখানকার পরিচিতের কাছে খোঁজখবর ক'রেও হদিশ মেলে নি। কেবল এটুকু জানা গেছে, ওখানে সে নেই।

কুহকমের নামের সঙ্গে ঘরের খুব মিল। চতুর্দিকে মায়া রহস্য ছড়ানো। যে দেবীর পুজো করে, তার নামও অদ্ভুত। নামের সঙ্গে কি বিতিকিচ্ছিরি গা ছমছমে রূপ। এরকম মূর্তি জীবনে দেখে নি মনোবীণা।

আলোআঁধারি ঘরে বীভৎস মূর্তি দেখে দাঁতকপাটি। বিপদে পড়েছে দিদিমা। সঙ্গিনী প্রতিবেশিনীর কথায় এসে একি দুর্ভোগ। একে মেয়েটার মন বড় হালকা, কিছু না নতুন বিপত্তি এসে জোটে আবার।

কুহকমের ব্যবহারে কিন্তু মুগ্ধ হয়েছে খুব দিদিমা। শুইয়ে দিয়ে মাথায় জল, ঘাড়ে জল, চোখে জল, ঘন ঘন তালপাখার বাতাস।

জ্ঞান হতে গরম গরম দুধ একবাটি মুখের কাছে এনে সযত্নে ধরা।

মনোবীণা সুস্থ-স্বাভাবিক হ'তে কুহকমই সুস্থ-স্বাভাবিক হ'ল যেন।

দুঃখের মাঝেও আনন্দের অনুভূতি নাড়াচাড়া দিয়ে উঠেছে ভেতরে দিদিমার। হাসিমুখে প্রতিবেশিনীর মুখের দিকে তাকিয়েছে। সত্যিই একটা সৎ-মানুষের আশ্রয়ে এসেছে বটে।

প্রতিবেশিনীর চোখে খুশির ঝিলিক। গর্বে বুক দশহাত।

মূর্তিতে যত ভয়, কুহকমের চেহারায় কিন্তু এতটুকু ভয়ের ছাপছোপ নেই! নধরকান্তি দেহ, পাকা সোনার রং। সরল শিশুর নির্দোষ চাউনি। মাথায় থাক থাক কোঁকড়ানো চুল, ঘাড় অবধি। হাসি হাসি মুখ। গলার স্বরও বেশ সুরেলা মিষ্টি। প্রতিটি কথায় প্রাণ জুড়িয়ে যায় মন জুড়িয়ে যায়।

খানিক চেয়ে চেয়ে দেখল মনোবীণা। দেখল পা থেকে মাথা অবধি। না, নিখুঁত।

ভয়ঙ্করী প্রতিমার দিকে মুখ ফিরোতে ইচ্ছে করছে না আর। মাথা ভর্তি জটা, তাও আবার উর্দ্ধমুখী। আকাশে কি দেখছে, কে জানে। তিন চোখই রক্তবর্ণ। জিভ লাল। চারহাতের দু'হাতে বর আর অভয়। এ দুটোই মানুষের আশা ভরসা তবু। অন্য দু'হাতে নর কপাল। দেবী

শবের ওপর। কালো ছোটখাটো শরীরের। চঞ্চলভাব ফুটে উঠছে মুখে চোখে বেশী করে!

মূর্তির দু'পাশে ধুনির মতো কাঠ জ্বলছে কেন? মনোবীণার প্রশ্নের জবাবে বলেছে কুহকম, দেবীর সারা দেহ থেকে আগুনের ধোঁয়া বেরোচ্ছে, ধ্যানের সঙ্গে মিল রাখার জন্য এটা করা।

যাই করা হোক, মনোবীণার কিন্তু ভক্তিশ্রদ্ধা আসেনি মোটে। ভয়ে বুকের ভেতর গুরগুর করছে। লোকে বলে নাকি ভয়ে ভক্তি! তাই-বা আসছে কই! এমন মানুষের কেমন ক'রে এরকম বীভৎসদেবীর সাধনা করতে মন চাইল—সেটাই ভাববার বিষয়।

মুখ দেখে মনের ধারণা কিছু কিছু আচ ক'রেছে বোধ হয় কুহকম। ঠোঁটের হাসি ঠোঁটেই চেপে কুহকম বলল, শরণাগত ভক্তের কাছে মা আমার অপার করুণাময়ী। সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করেন। সবার সব কিছু—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সাধকের কানে কানে এসে বলে দেন।

কুহকম প্রতিমার দিকে চেয়ে বলে উঠল, জয় কর্ণ-পিশাচী! জয় কর্ণ-পিশাচী! জয় কর্ণ-পিশাচী!

কণ্ঠস্বরে বুকের ভেতর ছাঁৎ ক'রে উঠেছে মনোবীণার। কার কণ্ঠস্বর! একটু আগে যে মানুষটা কথা কয়েছে। তার গলায় অন্য কারো গলা বুঝি! কি বুক কাঁপানো গুরুগম্ভীর আওয়াজ!

কুহকমের চোখের রং বদলেছে মুহূর্তে। দেবীর তিন চোখের মত লাল, সবটুকু নিংড়ে নিঃশেষ ক'রে নিয়ে কুহকমের দু-চোখে সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছে যেন কে। অমন গৌর বরণ কি করে কালোভূতের মতো হয়ে উঠল বোঝা ভার। ভয় পেলে মানুষ অনেক কিছু ভুল-ভাল দেখে। এটা সেই জাতেরও হ'তে পারে, দৃষ্টিভ্রমের মায়াজালে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে, অনেক আশ্চর্য রূপদর্শনও হয়।

কুহকম উঠে দাঁড়াল। দেবীর মুখের কাছে কান নামিয়ে কোন কথা শুনতে চেষ্টা ক'রছে।

মনোবীণার ভেতরে হাসির তুফান তোলপাড় ক'রে উঠছে। নিজেকে সংযত ক'রে রাখতে প্রাণপণ প্রয়াস চলেছে। একটা কেলেঙ্কারি না ঘটে

শেষে। প্রথম প্রবেশে অজ্ঞান, পরে হাসির ফোয়ারা। মানায় না।
মনোবীণাকে মানুষটা না অভদ্র ভেবে নেয়, ভেবে না নেয় উচ্চণ্ড-পাগল।

কুহকমের অবাক করা কথায় স্তব্ধ পাথর হয়ে গেল মনোবীণা।

কুহকম বলছে, একজনই এসেছিল শুধু। যে বুঝেছিল মনোবীণাকে। বুঝেছিল হৃদয়, মন, ব্যথা-বেদনা। রেণুপরাগ। ওকে ফিরে পাওয়ার আশা আর বৃথা। মর্মস্থানে আঘাত লাগলে কে না ভেঙে পড়ে। মনোবীণার সহ্যশক্তি অনেক। আঘাত সয়ে সয়ে পাথর হয়ে গেছে। নিঝ্ঝুম নিথর হয়ে বসে আছে। দৃষ্টি কোন সুদূরে খুঁজে বেড়াচ্ছে কাকে। দিদিমার চোখে কান্নার বন্যা নেমেছে।

দেবীর মুখের কাছ থেকে কান ফিরিয়ে এদিকে তাকাল কুহকম। চোখের লাল নিশ্চিহ্ন। গায়ের রংয়ে সোনার জেল্লা। এত শিগগীর এত পরিবর্তন এটাও অসম্ভব ব্যাপার। যাদু-বিদ্যার প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে।

ধারণায় যাই আসুক, সে সব বাদ দিলেও একটা সত্যিকে অস্বীকার করা যায় না। কুহকম যা বলেছে, মনোবীণারও মন জানিয়েছে অনেক আগে থেকেই। অবিশ্বাসী মন বিশ্বাস ক'রতে না চাইলেও বিশ্বাস না ক'রে উপায় নেই এখানে। অনেকটা স্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছে মনোবীণা। খুব আস্তে আস্তে বলল, তাহলে রেণুপরাগ এ জগতে নেই? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, এর জন্যে দায়ী কি আমি?

কুহকম সামনাসামনি আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসল। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে কি যেন ভাবলে একটু, তারপর চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, ভাল ক'রে, দেখে নিল বুঝি মনোবীণাকে। নরম গলায় থেমে থেমে বলল, না না। শুধু এর জন্য নয়, কোন ঘটনারই দায়ী তুমি নও। মানুষের স্বভাব নিজের কর্মফলের ভোগান্তির দোষটাকে অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তৃপ্তি পাওয়া।

কুহকমের কথায় সহানুভূতি, কথায় মানুষকে সরল করে তোলা। এটা ভাল লেগেছে মনোবীণার। ভাল লাগছেও। এমন ক'রে আর

একজনই বলেছিল তাকে, সে রেণুপরাগ। আর কেউ নয়। আর কেউ নয়।

নির্যাতনের পর নির্যাতনই চলেছে কেবল। এ থেকে ব্যতিক্রম দিদিমা। মায়ের করার কোন হাত ছিলনা কিছুতেই। ভালয়ও নয় মন্দয়ও নয়। অসহায়ের নির্বিকারের ভূমিকা।

বসে থাকতে থাকতে চমকে উঠল কুহকম। চনমন ক'রে তাকাল চতুর্দিকে। অস্থির অস্থির ভাব। দেবীমূর্তির চঞ্চল ভাব ওর দেহে ফুটে উঠছে। তাড়াতাড়ি বলে উঠল বাচ্ছা ছেলের মত, রেণুপরাগকে দেখতে চাইলে আমি দেখাতে পারি।

কিছু বিশ্বাস এসে গেলেও, অবিশ্বাসী মন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল মনোবীণার তখনই আবার। এ আবার হয় নাকি! আজব দুনিয়ার তাজ্জব ব্যাপার।

শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মাঝে, কত দুঃখ কষ্টের ভেতরেও একটা কৌতুকী মন বার বার তাকে হালকা করে তুলতে চেষ্টা করেছে। এমন একটা ভয় শোক দুঃখের আবহাওয়া মেশানো পরিবেশেও কৌতুকপ্রিয় মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল কিছু করে বসার জন্য। স্থান কাল পাত্রের বিকার আকার ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে পড়ল।

মনোবীণার মুখের হাসি ফুটে উঠেছে। হাসতে হাসতেই বলেছে, মুখে বলা যত সহজ, সত্যি সত্যি কাজে কি সম্ভব হয়? হয় না! বই-পত্রের লেখায় শুধু পাওয়া যায় এইসব।

সারাজীবন খুঁচুনি-বিঁধুনি খেয়ে খেয়ে সুযোগ পেলে কথার খোঁচায় কাউকে আঘাত করতে এতটুকু পেছপাও হয় না মনোবীণা। বলল, আমি বিশ্বাস করি না। ওসব বুজরুকি।

অট্টহাসি। ঘর ফাটানো সারাদেহে কাঁপন ধরানো হাসি। হাসছে কুহকম। কাঠি নিয়ে প্রদীপের সলতে উস্কে দিল একটু। প্রদীপের শিখায় একদৃষ্টে কি দেখল। কয়েক মুহূর্ত। তারপর বড় বড় চোখ ক'রে, নিজের বুকে হাত চাপড়ে জোর গলায় বলল, আমাকে বিদ্রূপ? সত্যি কি মিথ্যে দেখিয়ে দোব। অমাবস্যার রাত্তিরে এসো! দেখব

কত সাহস তোমার।

অসম্ভব রকমের জেদী মেয়ে মনোবীণা। দেহের প্রাণের মায়া নেই একদম। জিদই ওর প্রাণ বুঝি। জিদ বজায় থাকলে ও বেঁচে থাকবে যেন অক্ষয় বট হয়ে। বলল, নিশ্চয় আসবো।

এসেছে মনোবীণা। ঠিক সময়েই এসেছে কুহকমের কাছে। দেবী-পূজোর তোড়জোড় চলছে। কালো কুচকুচে বাচ্চা ছাগলের মুখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লাল সুতো দিয়ে বাঁধা, বলি হবে।

মনোবীণাকে দেখে, একটু হাসল কুহকম।

আসার লগ্নের আগে থেকে মনোবীণার মন খুব ছটফট ক'রেছে। কেন বুঝতে পারে নি। এরকম কোন জায়গায় যাবার আগে হয় নি। বেশ আশ্চর্য লেগেছে। আসার জন্য দিদিমাকে তাগাদা দিয়েছে বারবার।

দিদিমা মানা করেছে, যেতে হবে না। দূর ছাই, যেয়েই বা কি হবে। আর দেখেই বা কি পাচহাত-পাঁচপা বেরোবে?

তবু শোনে নি। কথা কথা। হাকিম টললেও হুকুম টলবে না।

লালকম্বলের আসন দেবীর সামনে বিছানো। তার এপাশে বাঘছাল। বাঘছালের আসনে বসল কুহকম। হোমকুণ্ডের দিকে মুখ ক'রে।

জ্বলে উঠেছে হোমের আগুন।

আহুতি দিচ্ছে আর মন্ত্র উচ্চারণ করছে কুহকম।

মনোবীণা আর দিদিমা দরজার বাইরের চাতালে পাশাপাশি বসে দুজনে।

সৈন্ধব নুন কোশার ঘিয়ে ঢেলে হোমের আগুনে আহুতি দিচ্ছে কুহকম। সব কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। তবে বলার ধরণ আর কিছু কিছু শুনে বুঝতে পারা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে, কাউকে আকর্ষণ ক'রছে। ··শ্রীং ক্লীং হ্রীং ওঁ ত্রিপুরাদেবী···আকর্ষয় আকর্ষয় স্বাহা ·।

হবেও বা রেণুপরাগকে আকর্ষণ। এ আবার হয় নাকি! দেখা যাক। দোনামনা হতে বারণ করেছে কুহকম। তাহলে কিন্তু দায়ী

নয় ও। একমনে বসে বসে ব্যাপার স্যাপার দেখতে চেষ্টা করছে মনোবীণা। দিদিমা কি বুঝছে না বুঝছে—কে জানে। হতবাক হত-ভম্ব হয়ে বসে আছে।

আবার আহুতি দিচ্ছে কুহকম। ওঁ হ্রীং কর্ণপিশাচি মে কর্ণেকথয় হুঁ ফট্ স্বাহা ·।

পুজো শেষে ফিরে তাকিয়ে বলল কুহকম, মন ঠিক রাখতে পারছো না তুমি। আজ তোমার কাজ হবে না আর। আবার আসতে হবে। বার বার আসতে হবে। বল, আমি যা বলছি ঠিক কিনা? অবিশ্বাস এসেছিল কিনা মনে?

চাতালে যেন বাজ পড়ল সরবে। উঠে দাঁড়িয়ে ধমকানির সুরে মনোবীণার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে কুহকম, আমি শুনতে চাই অবিশ্বাস এসেছিল কিনা মনে?

দিদিমা ভয়েময়ে চেয়ে রয়েছে নাতনীর দিকে। নাতনীর মন তো জানে। নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে। না হলে কুহকমের এমন রণং দেহি মূর্তি কেন?

দিদিমার ভাবখানা সত্যি কথাটা খুলে বলনা বাপু। চুপ ক'রে থেকে অকারণ ঝুটঝামেলা।

মনোবীণা চুপ করে থাকার পাত্রী নয়। বরং কুঁদুলী-মুখরা হিংসুকী বিশেষণ ছিল তার নামের আগে এক সময়। রেণুপরাগ আসার সময় থেকে অনেক—অনেক শান্ত হয়েছে। তবে সত্যি কথা বলার সাহস হারায় নি এখনও।

খুব আস্তে নয়, একটু জোরেই···উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, এসেছে। আসবে নিশ্চয়। এমন কিছু অঘটন ঘটাননি আপনি যে বিশ্বাস করতে বাধ্য হব। কাজে বিশ্বাস করান। চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়ে মন দুর্বল করে দিয়ে যাকে ইচ্ছে বিশ্বাস করাতে পারেন, আমাকে নয়।

জোঁকের মুখে নুন পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

মুহূর্তে কুহকমের রণমূর্তি অদৃশ্য।

গলার স্বরে স্নিগ্ধশ্যামল পরশ। বলল, ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ।

আজ রাত হয়ে যাচ্ছে। এসো, আবার এসো।

…বাড়িতে ফিরে এসেও কুহকমের শেষের কথা কানে বেজেছে কেবল মনোবীণার। এসো, আবার এসো।

কত লোককে কত মুখ ক'রেছে। কারণে অকারণে কত রাগ দেখিয়েছে। এক রেণুপরাগ ছাড়া কারো বেলাতে মনে কখনও অনুশোচনা-আফসোস আসে নি। সত্যি কথা বলে বরং আত্মতৃপ্তি এসেছে। এখানে অন্যরকম।

কুহকমের করুণ মুখ ভেসে উঠেছে। কেবলি মনে হচ্ছে—অন্যায়, মস্ত বড় অন্যায়। অতখানি উদ্ধত না হলেই ভালো হত। ভেতরে খচখচ ক'রেছে বড্ড। তার কথা শুনে মানুষটা তুমড়ে-মুচড়ে ঝুলে পড়ল একেবারে সামনের দিকে। নিস্তেজ-নিষ্প্রাণের মতো।

করুণা এসেছে, এসেছে মমতা মনোবীণার।

দিদিমার ঘরে গিয়ে বলেছে, দিদু! ঘুমোও। কাল সকালে তোমাতে আমাতে যাব ওখানে।

দিদিমার চোখে বিস্ময়। মুখে কুলুপ। নাতনীকে দেখেছে অপলকে।

ভোরের আকাশে তখনও তারা নজরে পড়ছে কোথাও কোথাও।

যে দালানে বসেছিল মনোবীণা আর দিদিমা—ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে কুহকম।…চোখ রাঙিয়ে কাউকে বিশ্বাস করালেও, কাউকে আবার করানো যায় না। কাজে করানোই আসল করানো। জপছে মনে মনে মন্ত্রের মতো।

তারা মেলাল। এলো ভোরের আলো। এলো মিষ্টি রোদের আভা। মুখে এসে ছড়িয়ে পড়ছে কুহকমের।

মনোবীণা আসছে, সেধারে লক্ষ্য নেই। চেয়ে আছে বটে কিন্তু নজরে পড়ছে না কাউকে। নিজের চিন্তায় নিজেই বিষাদের অতলে ডুবে গেছে।

কাছে এসে দাঁড়াল। মৃদু হেসে বলল মনোবীণা, দূর থেকেই

দেখছি এই অবস্থা। ভাবলুম, ধ্যানভঙ্গ না ক'রে ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু যা বলার জন্য আসা, না বলেই বা যাই কেমন ক'রে। এখুনি চলে যাবো, একটু শুনুন।

কাকস্য পরিবেদনা। কোন উত্তর নেই।

ফিরে যাচ্ছে মনোবীণা। বাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে কে যেন ডাকল। পেছু তাকাতেই, ওপরের যুবকটি হেসে, হাতের ইশারায় দাঁড়াতে বলল।

নেমে এসেছে যুবক। ঠাকুরঘরের দালানে বসিয়ে কুহকমকে ডেকেছে জোরে জোরে। নামধরে নয়। 'দাদা-দাদা' বলে। যুবক কুহকমের সাধনসঙ্গী ছোটভাই।

চিন্তার রাজ্য থেকে কুহকম নেমে এসেছে এই পৃথিবীর মাটিতে। আশ্চর্য হ'য়ে গেছে মনোবীণাকে দেখে। একি সাজসজ্জা। আগে দেখে নি তো এরকম !

সিঁথিতে টকটকে লাল সিঁদুরের রেখা। কপালে টিপ। চওড়া লাল পাড় গরদের শাড়ি। হাসছে। সুশ্রী না হলেও একটা মাধুর্য ফুটে উঠছে তপস্বিনীর। চোখের কানায় কানায় উপচে পড়ছে দেবতার চরণামৃত। এমনিতেই মনোবীণার ভাসাভাসা জলভরা চোখ। এখন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

মোলায়েম গলায় বলল মনোবীণা, আমার মন আমারই বশে নয়। আগে ঠিক ক'রে নিই, তারপর না দেখাদেখির পর্ব।

কুহকম মৌন। শুধু দেখে যাচ্ছে একদৃষ্টে।

মনোবীণা বলেছে, আসবো আমি। আসতে বলেছেন।

আর কোন কথা না কয়ে, উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে চলে গেছে।

চলে গেলে কি হবে, পরদিন আবার এসেছে। প্রতিদিনই শুরু করল আসা। আসতে-আসতেই দুজনের—মনোবীণা আর কুহকমের—সহানুভূতির ভিতে গড়ে উঠল ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা।

মনোবীণা জিজ্ঞেস করেছে কুহকমকে। এপথে এবয়েসে কেন আসা ? নিজের বাড়িঘর বিদ্যাবুদ্ধি থাকতে চাকরিবাকরি না ক'রে নানা

ফন্দি ফিকিরের আশ্রয় নেওয়ার কি কোন মানে হয়? না লোকের কাছে সহজে সম্মান পাবার লোভে?

একটু চুপ ক'রে থেকে, কর্ণপিশাচির মূর্তির দিকে তাকিয়ে বলেছে কুহকম। হ্যাঁ, শুধু সম্মান নয়, লোকে ভয় পাবে বলেও।

—আপনি তো খুব সাংঘাতিক লোক দেখছি।

—সাংঘাতিক হ'য়ে উঠতে বাধ্য ক'রেছে আমার আপনজনেরা।

বাবার অথর্ব হয়ে পড়ার সুযোগ নিয়ে কিনা অত্যাচার হয়েছে বাবার ওপর। বসতবাড়ি থেকে উৎখাত করার কি না চেষ্টা। এই অবধি বলে একটু থেমেছে কুহকম। তারপর মনের আগল খুলে গেছে। গরগর করে বলেছে অনেক কিছু। হয় তো ব্যথা হালকা ক'রে ফেলার জন্য একটু।

কুলক্ষণে ছেলে কুহকম—জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই শুনে এসেছে কেবল। অপরাধ? ছেলে জন্মানোর দিনপনেরো আগে পাঁচবছরের বোন বাড়ির সকলের নয়নমণি চলে গেলো অকালে। ছেলে নয় তো, সাক্ষাৎ রাক্ষস।

উঠতি দশা সব সময় থাকে না মানুষের। পড়তিও আছে। বুঝবে কে? দোষ হ'ল অলক্ষুণে রাক্ষুসে ছেলের। একমাত্র মা ছাড়া প্রত্যেকেরই দু-চোক্ষের বিষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

অনাদর আর তুচ্ছতাচ্ছিল্যে মানুষ। স্বভাবতই হিংসা-প্রতিহিংসায় বিদ্রোহী মন গড়ে উঠেছে। সকলে সহজে সাজা পায় কিসে, পথ খুঁজেছে। লোকের মুখে মুখে নানা ক্রিয়াকলাপ আর পুজোপাঠের সার্থক কাহিনী শুনে, সেই দিকেই ঝুঁকে পড়েছে শেষে মস্ত অবলম্বন ভেবে।

সত্যি কি সার্থক হওয়া যায়?

মনোবীণার প্রশ্নের উত্তরের জবাবে জানিয়েছে, হোক না হোক—সে কথা পরে। তবে মূর্তি প্রতিষ্ঠার পরে ভিটে ছাড়তে হয় নি আর। আর বড় একটা কেন, মোটেই উত্যক্ত করে না কেউ কোন বিষয়ে। তাছাড়া সমীহ করে চলে প্রত্যেকে। যা নিয়ে এত উপকার সে অবলম্বন ছাড়ে নি তাই দুভায়ে।

কুহকমের জীবনের আয়নায় নিজেকে নতুন করে আবার অনেকখানি দেখেছে মনোবীণা। অনেকটা প্রায় কুহকমের কাছাকাছি। কিছু কিছু রকমফের তো আছেই।

অপবাদের গয়নায় কত না সেজেছে মনোবীণা। অপয়া অমঙ্গল ডাইনি ডাকিনী। এতেও কি শেষ আছে! বলার নির্যাতন—দেহের নির্যাতন কিছু আর বাকি থাকে নি। বাড়ির লোকের অসুখ হয়েছে, সেও নাকি ডাকিনীর কোপদৃষ্টিতে। ওর নিশ্বাস মহাকাল। জ্যান্ত মানুষের প্রাণবায়ু চুরি করে নেয়। ওকে বিদায় করে না দিলে বাড়ির কেউ আর প্রাণে বাঁচবে না বুঝি। সরাও সরাও সরাও। শীগগির সরাও। বাড়িতে পুষে রাখাটাই অন্যায় হয়েছে খুব, একটা না উঠতে উঠতে পড়ছে আর একটা।

শুনে শুনে কাঁহাতক ধৈর্য ধরে আর মা। দিদিমা চেয়েছে নিয়ে যেতে। মা গররাজী। না কারো কাছে রাখা হবে না আর। রাক্ষুসী যেমন অপযশের বরাত নিয়ে জন্মেছে, তেমন লোকচক্ষুর বাইরে মৃত্যু হওয়াটা ভালো।

মনোবীণাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে বলেছে, আমি যে পারছিনা আর। একটা শিশু কি অপরাধ করল যে, এত দূরছাই। ঈশ্বর থাকলে কি এমন হয়। হতে পারে। এ কেমন তর বিচার। যদি থাকে, এটুকু করুক—আমি থাকতে থাকতে যেন বীণুকে তুলে নেয়। আমি ম'লে কি হবে এর। কি হবে?

বাঁকুড়ায় পাত্রসায়েরে অজ পাড়াগাঁয়ে মায়ের দূর সম্পর্কের পিসির বাড়ি নিয়ে গিয়ে তুলল মনোবীণাকে। প্রথমটায় মাটির ঘরে বাস আর পুকুরে চান করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে প্রায়।

মা অসুস্থ মেয়ের কাছে বসে জোড়হাত করে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেছে। ভগবান স্বকর্ণে শুনেছে মায়ের কথা। দয়া করে যাতনা দিওনা আর। যত শীগগির পার ওকে উদ্ধার কর।

ঈশ্বর উদ্ধার করেনি। লোহা পুড়িয়ে পুড়িয়ে ইস্পাত করে তুলেছে। ধাতে সয়ে গেল ওখানকার জলবাতাস। সাত বছরের

মেয়ে হ'য়ে উঠেছে সমর্থ নীরোগ সুস্থ। এই দেশেরই কষ্টিপাথরে খোদাই মেয়ে।

মেয়ে যখন তখন চলে যায় ছাতিম তলায় কাউকে না বলেকয়ে। চলে যায় পুকুরের ধারে। জিজ্ঞেস করলে বলে, খেলা করতে যায়। কার সঙ্গে? তার মতো, ঠিক অবিকল তার মতো মেয়ের সঙ্গে।

সে ওকে ডাকে। ডেকে নিয়ে যায়।

কলকাতায় বারণ মেনে চলত। দিবারাত্র ঘরে বন্দী সঙ্গীসাথী ছিল না কেউ। মা'ও কারো সঙ্গে মিশতে দেয় না ভয়ে। বাঁকুড়ায়ও কারো সঙ্গে মিশতে মানা। তবু মেয়ে মিশছে অবাধ্য হয়ে।

ভয় ধরল মায়ের। এখানে আবার কোন বিপত্তি না এসে হাজির হয় শেষে।

আড়াল আবডাল থেকে উঁকি মেরে অবাকই হয়েছে। মেয়ে একা, দ্বিতীয় কেউ নেই ওর সঙ্গে। তবে মেয়ে দৌড়াচ্ছে হাসছে খেলছে কার সঙ্গে আবার হাত-মুখ চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা বলছে কার সঙ্গে। দেখে শুনে চক্ষুস্থির। মেয়েটা পাগল হল নাকি।

অন্যকে ডেকে এনে দেখিয়েছে, দেখাটা সত্যি কিনা। ঘাড় নেড়ে উত্তর দিয়েছে ওরা, সত্যি।

অনেকে বলেছে, শ্মশানে-মশানে ঘুরছে রাত নেই দিন নেই। কোন দুষ্টু ভূত মাথায় চেপেছে কে জানে। বাগদি ভূত একবার ঘাড়ে চাপলে তাকে না নিয়ে যায় না।

ওঝাদের ঝাড়ফুঁকে কিছুই হল না। মেয়ের নাচুনি কুঁদুনি বাড়ল বই কমল না এতটুকু। বরং শ্মশানের কাছে পঞ্চমুণ্ডের আসনে গিয়ে বসা শুরু হল। চোখ বুজে বসে থাকে।

পিসি বলল মাকে, এমন ডানপিটে দেখিনি ভূ-ভারতে। ভূতের সঙ্গে দিনরাত ছুটোছুটি। কখন ওরা রুষ্ট হবে কে জানে। শেষে আমার না সর্বনাশ হয় মা। তার চেয়ে তোমার মেয়েকে নিয়ে সরে পড় এখান থেকে। কে জানে কখন চিতায় ঝাঁপ দেবে, কখন পুকুরে ডুবে মরবে। আজকাল তো নতুন ঢং শুরু করেছে! কি না, পুকুরের ভেতর থেকে

সানাই বেজে উঠছে। কেউ শুনছে না, ওই শয়তানীটা শোনে কেবল নাকি!

পিসি বাড়িতে রাখতে চাইল না একদম। বিচারকের কড়া রায় না মানলে জলগ্রহণ করবে না। অনশনে মরবে সেও ভালো।
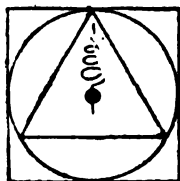
পিসির মরণপণ জিদ দেখে, মনোবীণাকে ভামরী ডাইনির কাছে নিয়ে গেল মা। এদেশে পাত্রসায়েরে ভামরী ডাইনি প্রবাদের মানুষ। ভূত-প্রেত ছাড়াতে ওর জুড়ি আর কেউ নেই নাকি। অসাধ্য সাধন করার ওর অশেষ ক্ষমতা। এর করুণায় নিশ্চয় অপদেবতাদের হাত থেকে মুক্তি পাবে মনোবীণা।

ভামরী ডাইনির চেহারা দেখে, অন্ধকারে আঁতকে ওঠারই কথা।

এমন মুখ কি কোন মানুষের সম্ভব! স্ত্রী কি পুরুষের?

দেখার সঙ্গে সঙ্গে ছোটরা বুজে ফেলেছে দু'চোখ। হাত চাপা দিয়ে রেখেছে ঢেকে। যাতে আর দ্বিতীয়বার না দেখতে হয়। বড়দেরও কম ত্রাসের নয়। যাদের বুক কম জোর, তাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। কলিজার খুন জমে যাবার উপক্রম। দু'চোখ উলটে মরণ-খাবি খেয়ে প্রাণ যায় আর কি। কেউ আবার দেখামাত্র বেহুঁশ।

শোনা যায় রাতদুপুরে দেখে কেউ-কেউ আবার হিম হয়ে গেছে। যাকে বলে যমের দক্ষিণদোরে যাওয়া।

কঙ্কালের মানুষ। হাড়ের দেহে একটা তামাটে চামড়া ঢাকা। মাথার চুল শনের দড়ি। সারা শরীরের চামড়া কুঁকড়ে গেছে। মুখের চামড়ায় অদ্ভুত ধরনের চিত্রবিচিত্র ভাঁজ। যেন শুকনো নদীনালা সব। খনখনে গলার স্বরে বুক গুরগুর। ওই স্বরে পিশাচের হাসি ঝরে।

গাঁয়ের সকলেরই ভয় ভামরী ডাইনিকে। কখন কার কি অনিষ্ট

করে দেয় কে জানে। এদের ঠিকুজি-কুষ্ঠিতে নেই বুঝি অসাধ্য বলে কোন কিছু। সকলেই স্তুতি করে।

ডাইনির দয়ায় আবার অনেকে রোগমুক্তও হয়েছে নাকি। অনেক গোপন ব্যাপারের মনস্কামনা পূর্ণও।

অনেকে চায় ভামরী ডাইনি ম'লে আপদের শান্তি হয়ে যায় গোটা গ্রামে। অনেকে চায় বেঁচে থাকলে নিশ্চিন্ত তবু।

ভামরীর বয়স কেউ ঠিক ক'রে বলতে পারে না। কেউ কেউ বলে, বয়সের গাছপাথর নেই ওর। প্রিয় কেউ সাহস করে জিজ্ঞেস করলে, ভয় ধরানো পেতনির হাসি হাসে ভামরী। আঙুলের ইশারায় দেখিয়ে দেয় শ্মশান। চেয়ে থাকে ভৈরবের থানের দিকে। টিলার ওইটুকু জায়গা জুড়ে সারি সারি অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে কটা গাছ দাঁড়িয়ে। তলায় পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া। ওখানে ভৈরব পুজো করে মানুষ সিদ্ধিলাভ করার জন্য।

সামনে—একটু তফাতেই জ্বলে ওঠে চিতার আগুন। তখন মনে হয় এই নানা নামের অজানা গাছ সাক্ষাৎ দানব হ'য়ে উঠেছে। ডালপালা বড্ড বেশী নড়ছে।

পাত্রসায়েরের শ্মশানে অমাবস্যার রাতে আরও ভয়াবহ মূর্তি ধরে এই গাছ। সাধকের পুজোয় জেগে ওঠে তখন শ্মশান ভৈরব। গাছের ফাঁকে ফাঁকে কার চোখের আগুন দপদপ করে জ্বলে ওঠে। আঁতুপাতু ক'রে খুঁজে ফেরে যেন কাকে।

বাঁকুড়ার এই অজ পাড়াগাঁয়ের কতক লোকের ধারণা রুদ্রভৈরবের চোখ। কতকের ধারণা, না, না। ভামরী ডাইনির।

নানা মুখে নিজের কাহিনী কত না শুনেছে ভামরী। লেখা-জোকা হ'লে কাগজের ডাঁই জমে জমে একটা নতুন ধরনের পাহাড় গড়ে উঠত। শ্মশান-গাছের বয়স বলতে পারে না যেমন কেউ, ভামরীর বয়সও বলতে পারে না তেমনি। বয়স জানতে চাইলে শ্মশান গাছের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে নীরব ভাষায় ভামরী সেই উত্তর দেয় কি—কে জানে!

সকলের চোখে একটা রহস্য-রোমাঞ্চের অস্পষ্ট ছবি ভেসে উঠতে শুরু করেছে ইদানীং। বলার কারো দুঃসাহস নেই, যারা যাচ্ছে—তাদের বারণ করারও না।

যত দিন যাচ্ছে, তত আতঙ্কের পরিমাপ মাত্রা ছাড়িয়ে উঠছে। কি হয় কি হয়। ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে আর বুঝি দেরী নেই বেশী।

প্রাণ গেলেও কেউ মিশতে চায় না তার সঙ্গে, তার সঙ্গে এত মেলামেশা এত আত্মীয়তা—ভয়ের কারণ নিশ্চয়।

ছোট মেয়ে মনোবীণা। সে অতশত বোঝে না কিছু, বোঝার মতো বুদ্ধিসুদ্ধিও হয় নি ঘটে। সাতে কি সাতাশের বুদ্ধি আসে? আসে না। কিন্তু ওর মা-ই বা কেমনতর। মেয়ে আগলায় না!

মুখে বলা সহজ, কাজে অনেক শক্ত। বিশেষ করে ভামরীর বেলায়। ওর খপ্পরে পড়লে রেহাই পাওয়া মুশকিল।

মনোবীণাকে যখন-তখন শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। চাউনিটাও ঠিক স্বাভাবিক নয়। কেমন উদাস-উদাস। ও যেন ওতে নেই।

বুকে সাহস বেঁধে দু'একজন মায়ের কাছে গেছে আরজি নিয়ে। এরা পরোপকারী হয়েই জন্মায়। এই জাতের। মরণকে জীবন সঁপে দিতে পেছপা নয় এতটুকু। জননীর মমতা ভরা প্রাণ এদের।

বুঝিয়েছে মাকে, এমন লোকের হাতে কেমনে ছাড়ি দিয়া থাকো গো! ডর নাই বটে। কলকাতার মানুষ বোঝ না কেনে!

মনোবীণার মা কি বোঝে নি? বুঝেছে। শুধু বোঝা নয়, হাড়ে হাড়ে। বকুলফুল কুড়োতে গিয়ে তেঁতুলতলায় বাস হয়ে গেল তার। মেয়ের দৃষ্টিতে নাকি বাড়ির সবাই যেতে বসেছিল। সরিয়ে নিয়ে এলো নিজের বুড়ি পিসির কাছে। মেয়ের দৃষ্টির দোষ যাতে কেটে যায়, সেই ভরসায় ভামরীর কাছে নিয়ে যাওয়া। ভামরী মনোবীণাকে দেখে ছেঁড়াকাঁথায় বসে বসে কি ভাবল খানিক চিবুকে আঙুল ঠেকিয়ে রেখে। তারপর মুখে হাসি, চোখে হাসি, চোখের তারা ঘুরেছে বন বন করে তিনবার। বলেছে এ মেয়্যা মুদিগের জাত গো!

মনোবীণার চোখে চোখ রেখে কি কান্না। সকলের চোখ কপালে। ভামরীর কাছে উপস্থিত ছিল যারা, একবাক্যে স্বীকার করেছে—ভামরীর এমন অবস্থা আজ পর্যন্ত দেখে নি কেউ। ওর এত মায়া-মমতা ভাবা যায় না। লোকের যে ব্যথাবেদনা বোঝে না, এমন তো নয়! অনেক সময় নজরে পড়ে না। সময়ে প্রকাশ হয়ে যায়। মনোবীণার নজরদোষ কাটিয়ে দেবে নিশ্চয় ভামরী।

আশায় মরে চাষা।

আশা নিয়ে যেমন গেছে মা, তেমনি পরিপূর্ণ আশা নিয়ে ফিরেছে। ভামরীর যাতায়াত বেড়েছে মায়ের কাছে।

রোজ একবার করে মনোবীণার মাথায় হাত রেখে, কি বিড়বিড় করে বলে যায় একনাগাড়ে কয়েক মুহূর্ত ধরে। তারপর নিজেই চলে যায় আপন মনে। কারো সঙ্গে কোন কথাবার্তা না কয়ে।

শুনেছে মা, ভামরীর হ্যাংলাপনা খুব। মা কিছু দিতে চাইলে হাত নেড়ে জানায়, না। একগেলাস জলও না।

মায়ের আনন্দ আর ধরে না। মেয়ে এবারে সুলক্ষণা হয়ে উঠবে। ভামরীর ক্রিয়াকলাপে। প্রতিরাতে শ্মশানে যায়। গাছতলায় রুদ্রভৈরবের পুজো করে। ভোরে এসে চিতার বিভূতির টিপ পরিয়ে দিয়ে যায় মনোবীণার কপালের মাঝখানে।

সারাদিন মনোবীণার মুখে একই কথা, ভামরীদির কাছে যাবো।

প্রথম-প্রথম আটকে রেখে দেখেছে মা, কাঁদে খালি। খেতে চায় না, শুতে চায় না। বসতেও না। ঘুম তো নেই-ই।

শুনে ভামরী বলেছে, হা-মরি! ছাড়ি দিস, ছাড়ি দিস।

রাত নেই দুপুর নেই—কোন সময়েরই ঠিকঠিকানা নেই। যখন-তখন ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মনোবীণা। চব্বিশ ঘণ্টা টো-টো করে ঘুরছে ভামরীর সঙ্গে।

মা কানাঘুষা শুনেছে, ভামরী তার ডাইনির আসন ত্যাগ ক'রে তীর্থধর্ম করে বেড়াবে এবার। ভালো লাগে না আর এসব নিচু কাজ। পূর্বজন্মের কর্মের ফলে এজন্মে ডাইনি। পরজন্মেও এ

পাপের বোঝা বয়ে বেড়াতে চায় না আর। এ কাজে কি সুখ পেয়েছে সে!

ভরাযৌবনে রূপসী না হ'ক—রূপ ছিল চেয়ে দেখার মতো। কিন্তু, রূপের মর্যাদা দিতে পারত যে, সর্বপ্রথম তাকেই হারাতে হয়েছে। বিয়ের আগে পতিবিয়োগ! দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে!

যমনী ডাইনির ভায়ের নজর ছিল ভামরীর ওপর। ভামরী নারাজ। যত রাগ গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মানুষটার ওপর। অপরাধ? কারো বাধা মানবে না ও, কারো কথা শুনবে না। ভামরীকে বিয়ে করবেই করবে।

ধক ক'রে জ্বলে উঠল যমনীর দু'চোখ।—বটে! দেখায়ছি। ঘর থেকে ডেকে নিয়ে গেল মানুষটাকে নিশুতি রাতে। আনন্দ উৎসব হবে রুদ্রভৈরবের।

রাতের শ্মশানে দলবেঁধে নাচছে যমনী ডাইনির ভক্তরা। কাঠের বড় বড় গুঁড়ি জ্বলছে মধ্যিখানে। আগুনের শিখা লকলক ক'রে উঠছে। একবার নেশা আর একবার নাচ। চলল খানিক।

গাছের তলায় মাটির কলসী থেকে গেলাস-গেলাস নেশা এনে নেশা ধরাচ্ছে মানুষটার। ভক্তরা এত ভালোবেসেছে ওকে যে, রুদ্রভৈরবের ভোগ নাকি ওকেই গেলাচ্ছে স্রেফ। অন্য সবার আলাদা নেশার কলসী।

ভেতরটা 'জ্বলে গেল জ্বলে গেল' ক'রে, জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছে সেই মানুষ। তারপর? তারপর যা হবার তাই হয়েছে। চিতার আগুনে মানুষটার দেহ পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভামরীর নসিব পুড়েছে।

লোকের রটনা—সত্যি-মিথ্যে কেই বা প্রমাণ করে কার—ভামরীও প্রতিশোধ নিয়েছে নির্মমভাবে। বিয়ের রাত্তিরে বিধবা।

এ যেন লোহার বাসরে কালনাগিনীর দংশনে মৃত্যু লখিন্দরের।

সকলের অলক্ষ্যে সরবতের গেলাস ধরেছে ভামরী যমনীর ভায়ের মুখে। এত আদর এত প্রেম—একি ফেরানো যায়। আহ্লাদে আটখানা যমনীর ভাই। এক নিশ্বাসে শেষ করেছে। পরম তৃপ্তি। মাথা লুটিয়ে পড়েছে ভামরীর কোলে।

বাচ্চা ছেলের মতো ককিয়ে কেঁদে উঠেছে ভামরী। কপাল চাপড়ে চাপড়ে লাল ক'রে ফেলেছে। কি বরাত কি বরাত! বিয়ের আগে গেল একজন, বিয়ে হবার পরেই একজন। এমন ভাগ্যের কথা কেউ কি শুনেছে কখনও।

যমনী ডাইনির দু'পা আঁকড়ে ধরে জানিয়েছে ভামরী। আর ঘরে ফেরা নয়। এই চরণে স্থান যেন পায় সে। কোথাও স্থান নেই আর। বিয়ে শাদী আর নয়। যমনীর দোসর হ'য়ে থাকবে। সাধনা ক'রে জীবন কাটাবে।

করুণা এসেছে যমনীর। আহা! সাচ্চা প্রেম বটে ভামরীর! বাগদির ঘরের মেয়ে আবার বিয়ে করতে চাইলে নিষেধ করার নেই কিছু। নিষেধই বা করবে কেন? এটাই তো নিয়ম।

যমনী প্রাণ ঢেলে ডাইনি-বিদ্যা শিখিয়েছে ভামরীকে। ভামরীর মাথা খুব ভালো। শিখে নেয় শীগগির। ওর কাছে জলের মতো সহজ সব। উপযুক্ত মেয়ে, উপযুক্ত উত্তরাধিকারিণী তার।

ভালো ভাবে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে ভামরীর। ক্রিয়াকলাপ ছেড়েছে তাড়াতাড়ি। ঠাকুর দেবতার মন্দিরে ভজন কীর্তন শুনে দিন কাটাবে, যে কটা দিন আছে।

···মুক্তি পেল যমনী এত শীগগির, কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। অমন শক্তসমর্থ চেহারা।

গাঁয়ে নানা গুজব। মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। ভামরীর হাত আছে। নিজে প্রধান হয়ে বসবে বলে মানুষ সব কিছু করতে পারে। কারো মত আবার অন্য। কে জানে কারো কোপে পড়েছিল কিনা। অসম্ভব তো নয়।

দলের প্রধান হ'য়ে দাপটের সঙ্গে অধিশ্বরীর আদেশ করেছে ভামরী। নিজের ইচ্ছেমতো নির্দেশও দিয়েছে। মাথা পেতে গাঁয়ের লোক আদেশ নির্দেশ পালন করেছে। ভামরী মহাখুশী।

ভামরীর কাছে মনোবীণা দিন দিন প্রিয় হয়ে উঠছে। বাতাসে কথা ভেসে বেড়াচ্ছে। গ্রামের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত খবর পৌঁছে যাচ্ছে নিমেষে।

ভামরী স্থির ক'রে ফেলেছে তার আসনে মনোবীণা বসবে। মেয়ের চোখে ডাইনি সাধনার সমস্ত লক্ষণ বর্তমান। দলের ওপর কড়া হুকুম। ওকে মেনে না চললে নির্ঘাত সর্বনাশ। ভামরী দেবদর্শনে বেরোবে এবার। তীর্থে-তীর্থে জীবন কাটাবে এবার। ডাইনির মৃত্যু বড় দুঃসহ। দেখেছে স্বচক্ষে যমনীর বেলায়।

ভামরী কি-ই বা পেয়েছে! কি পেল!

সারা জীবনটা আঘাতে আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন। কান্না জমা থাকলে, পাত্রসায়েরের মতো একটা ভামরীসায়েরের সৃষ্টি হয়ে যেত।

দলের কাছে ছেড়ে দেবার আরজি করেও মুক্তির আলো দেখার আশা পায়নি। বরং হতাশই হ'য়ে পড়েছে। ওরা ছাড়বে না উপযুক্ত কাউকে বসিয়ে না দিলে।—কুথায় কারে পাই বেল্। মনের আকুতি মানতে চায় নি ওরা—না বসাতে পারলে ছাড়া হবে না। আলাদা ঘরানার ডাইনিবিদ্যা লোপ পেয়ে যাবে বরাবরের জন্য—এটা হ'তে দেওয়া হবে না মোটে।

প্রত্যেকের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে ভামরী। অত জোরাল গলা, মিইয়ে গেছে একেবারে। ছ'মাসের শীর্ণকায় রুগীর কণ্ঠে বলেছে একটি মাত্র শব্দ।—আচ্ছা!

লোক খোঁজার পালায় হাঁপিয়ে উঠেছে। মনোমতো পাওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই।

যখুনি বিফল হয়, ভেতর বিদ্রোহ ক'রে ওঠে। যারা মুখের ওপর মুখ তুলে, চোখে চোখ রেখে কথা বলতে সাহস করে নি, ভয় পেত— তারা এত উদ্ধত। সম্মান আর আছে কোথায় ভামরীর!

সে বন্দিনী তাহলে!

স্বাধীনভাবে কোন কিছু করার নেই! এদের আদেশ মতো কাজ করতে হবে! না, না, না।

ভামরী এসেছে দলে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। আর প্রয়োজন নেই

তার এখানে। কোথা ভালোবাসা পেয়েছে এখানে। যেটুকু মানুষ ক'রেছে তার, শুধু ভয়ে। প্রাণের ভয়ে, অনিষ্টর ভয়ে, সর্বনাশের ভয়ে। নিজেকে সদাসর্বদা ভয় দেখানোর আবরণ দিয়ে চলতে হয় তাকে—আচারে ব্যবহারে চলনে বলনে।

মাঝে মাঝে ভামরী কি যেন কি ভাবে। বড্ড আনমনা হয়ে ওঠে। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর উৎসব যত এগিয়ে আসছে, ততই।

...চতুর্দশীর মাঝরাতে ভামরীর দল এসে গেছে শ্মশানে। হাঁসে হাঁসে ছেয়ে গেছে। প্রত্যেকেই ছু'টো-তিনটে করে নিয়ে এসেছে।

ভামরী এলো। সারাদিন মৌন আছে। উপোসীও। ভৈরবের থানে গাছতলায় নিজের আঙুলে ছুঁচ ফুটিয়ে রক্ত বার ক'রে বেল পাতায় কি যেন কি লিখল। গাছতলায় রেখে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল।

প্রত্যেকের হাতে নেশার বোতল। ভৈরবের তলায় খানিকটা ঢেলে দিয়ে নিজেদের গলায় ঢালছে ঢকঢক ক'রে। দাউদাউ ক'রে কাঠের গুঁড়ি জ্বলছে। ঘিরে নাচ্ছে অনেকে। অনেকে হাঁস ধরে ধরে আছড়ে মারছে, ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে জ্যান্ত হাঁস আগুনে। কি বীভৎস দৃশ্য। পোড়া হাঁস দাঁত দিয়ে টেনে টেনে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

শ্মশানে ভৌতিক ব্যাপার চলেছে যেন। রাক্ষস-রাক্ষুসীর সমাগম হয়েছে বুঝি। আজ মুক্তি পাবে ভামরী।

হাসিতে মুখ উজ্জ্বল।

ছুঁছছে না হাঁসের মাংস। স্পর্শ করছে না নেশার এক বিন্দু। আজ তুলে দিতে হবে মনোবীণাকে এদের হাতে। এরা শেখাতে রাজী, মানুষ করে তুলতে রাজী। আজ মুক্তি ভামরীর এই শর্তে।

এখনও আসছে না কেন! এক মুহূর্ত এক বছর হয়ে উঠছে যে!

মন স্থির হয়ে এলো। যাক নিশ্চিন্ত। আসছে মনোবীণা আর মা। সকলে পৈশাচিক উল্লাসে আকাশ ফাটিয়ে ভূতের গলায় বিকৃত-স্বরে চিৎকার করে উঠল।—ভামরী ডাইনি কি জয়! মনোবীণা ডাইনি কি জয়।

মনোবীণার মায়ের চোখে জল। মনোবীণা কিন্তু নির্বিকার নিরুদ্বিগ্ন।

দলের লোকেরা প্রতিমা আনার মতো মনোবীণাকে মাথায় তুলে নাচতে নাচতে নিয়ে এসে হাজির করল একেবারে ভামরী ডাইনির সামনে। মনোবীণা দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ !

মা পেছনে। হতভম্ব হতবাক। নিষ্প্রাণ-নিস্পন্দ দেহ একখানা দাঁড়িয়ে। মনোবীণার চোখে ভামরীর চোখ।

দেখছে ভামরী। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। অসহ্য যন্ত্রণা বুকে। ভামরীর জীবনের প্রতিটি দুঃস্বপ্ন এসে হাজির হ'চ্ছে কেন ওই সরল নিষ্পাপ মেয়েটার চোখে !

দেখতে পারছে না আর ভামরী। নিজের আগের জীবন আগের চেহারা সইতে পারছে না আর। কেন এমন হ'চ্ছে।

একি দেখছে ভামরী। সামনে নেই মনোবীণা। দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোট ভামরী। মুখ দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না ভামরীর। মনে মনে বলছে, কে আছো সরিয়ে নিয়ে যাও সামনে থেকে, সরিয়ে নিয়ে যাও শীগগির। শীগগির শীগগির শীগগির···।

কই, কেউ তো আসছে না ওকে সরাতে ! কেউ কি তার মনের কথা শুনতে পাচ্ছে না ! ভামরী কি করবে ! নিজেকেই সরাতে হবে। সারা জীবন জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গেছে ভামরী। নিজের মনের নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে চলতে হয়েছে বার বার। এ যন্ত্রণা বুঝবে কে ! বলা তো যায় না কাউকে গোপন মনের গোপন কথা। আবার ছোট থেকে নতুন ক'রে যন্ত্রণা পেতে হবে, জ্বলতে হবে ভামরীকে !

—না, আর নয়, আর নয়।

নিচু হয়ে মনোবীণাকে বুকে তুলে নিল ! বুক জুড়িয়ে যাচ্ছে। এমন শান্তি কোনদিন কখনও পায় নি।

ইশারায় ডাকল মাকে। পুতুলের মতো চলেছে মা।

নিয়ে এলো গাছের তলায়। চুপু চুপু কানে কানে বলল, আমি উয়াদের আটকাইব, তুরা পালা। ধাক্কা মেরে মায়ের চেতনা ফিরিয়ে

এনে বলল, পালা পালা।

গাছের ফাঁক দিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো ভামরী। পেতনীর গলায় চিৎকার ক'রে বলে উঠল—তুরা লাচ গা। হাঁস বলি দে। যেই খুন না কই থামবি না।

ভামরী একটা বোতল খুলে ঢেলে দিল নিজের গলায় সবটা। গেয়ে উঠল নিজেদের ঘরানার বিচিত্র গুপ্ত মন্ত্রের গান।—যাহাং ভেজোং উহাং যাহি—তিনি লোক উথাল ডারা ডারা…। নাচতে শুরু করেছে। হাঁস আছড়ে মারছে আবার, নিজেই একটু নাচ থামিয়ে। আগুনে ছুঁড়ে ফেলছে। পোড়া হাঁস টেনে বার ক'রে একটু চিবিয়ে ভাগ করে দিচ্ছে সকলকে।

আবার নাচ শুরু করেছে ভামরী। নাচছে নাচছে নাচছে। নেচেই চলেছে অবিরাম পাগলের মতো। দেখছে, হাঁসের মতো তাকে টানছে ওরা চতুর্দিক থেকে। আগুনে ফেলে দেবে। বুঝতে পেরেছে—সরিয়ে দিয়েছে মনোবীণাকে।

পুড়িয়ে মারলেও কোন ক্ষতি নেই ভামরীর। প্রকৃত মুক্তি তার হয়ে গেছে। মনোবীণা বিপদের বাইরে এখন। অনেক দূর।

নেশায় নেশায় ভরপুর হয়ে যাচ্ছে ভামরী। দাঁড়াতে পারছে না। ভয়ঙ্কর ভাবে টলছে।

কে যেন পেছন থেকে ধাক্কা মারল। সব কারসাজি এর।

পড়ে গেছে ভামরী। মুখে হাসি। মুক্তি পেয়েছে যে।…

মনোবীণার এমন দৃষ্টি যে, ভালো করা তো দূরের কথা, শেষ পর্যন্ত মনোবীণাকে বাঁচাবার জন্য ভামরী ডাইনিকেও প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। কি নির্মম মৃত্যু। এ মেয়ে নিজেই সর্বগ্রাসী আগুন। জেনেও ছাড়তে পারছে কই। একে নিয়ে কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে। সবাই ছেড়েছে একে। মা পারছে কই!

এ পেটের দুশমনের হাত থেকে বুঝি কোন রেহাই নেই মায়ের।

ফিরে এল হাওড়ার দিদিমার কাছে।

দাদু আশ্বাস দিল বিণুর ব্যাপারে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত।

পরামর্শ করতে আর হল না। মনোবীণা সুস্থ স্বাভাবিক! দাদুর কাছ ছাড়া হতে চায় নি মোটে। লেখাপড়ায় মন বসিয়েছে নিজেই শান্তশিষ্ট মেয়ের মতো।

বাড়ি গেলেই যত অনাসৃষ্টি।

কেউ কোন কথা বললেই রেগে আগুন। একেবারে তাণ্ডব নৃত্য। জিনিস পত্র ভাঙাভাঙি, মারামারি, দাপাদাপি। সকলে অতিষ্ঠ দস্যি-পনার জ্বালায়। খেয়ে সুখ নেই, বসে সুখ নেই, ঘুমিয়ে সুখ নেই, দিবারাত্তি অশান্তি।

কিন্তু যেই সরিয়ে নিয়ে আসা হল দিদুর বাড়ি। অমনি অন্যমূর্তি।

এইভাবেই ছোট থেকে বড় হয়ে উঠেছে মনোবীণা, শিক্ষায়দীক্ষায় ওকালতির দরজাও পেরিয়েছে।

আসে কুহমকের কাছে রোজ একবার করে মনোবীণা।

কুহমক মন দিয়ে শেখায় কামাখ্যার মন্ত্র। বলে, তোমার শেখা দরকার। কেউ কোন অনিষ্টর চিন্তা করলেও, পারবে না। এই মন্ত্রে তার ক্রিয়া-কলাপ সমস্ত পণ্ড হয়ে যাবে। এটা পরীক্ষা করে দেখা।

মনোবীণা হাসি চাপতে গিয়েও হেসে ফেলেছে। এত বলেও মানুষটাকে বোঝান গেল না। অন্ধ বিশ্বাসে ভাঙন ধরানো গেল না। ভুলই হোক আর ঠিকই হোক। যে মতে যার বিশ্বাস অচল অটল, সেই মতেই সে আনতে চায়, আনতে চাইবে অন্যকেও। এটাই মানুষের ধর্ম।

কুহকম হেসে বলল, দেখো এ মন্ত্র অবিশ্বাস করেও স্মরণ করলে ফল হবে, বিপদে পড়লে ক'র। বলা রইল আমার, আমার অনেক বিপদ উদ্ধার করেছে কিন্তু। আমার জীবন শুনে তোমার দারুণ করুণা সহানু-ভূতি। আজ অবধি কারো কাছ থেকে পাইনি যেটা। আমারও কিছু দেওয়া উচিত তোমায়।

মনোবীণা বলেছে, ঠিক আছে। অবিশ্বাসেও যদি কাজ হয়, দোষ

নেই। পরীক্ষার সময় এলে, দেখতে পারি পরীক্ষা ক'রে।

মন্ত্র দেওয়ার সময় হৃদয় দিয়ে ফেলার কথাটাও শোনাতে ভুল করেনি কুহকম। মনোবীণাই তার জীবনের মোড় ঘোরাতে সক্ষম।

চুপ করে থেকেছে মনোবীণা।

কোন জবাব না দিয়েই চলে গেছে বাড়িতে। এখন আর দিহু আসে না। আসে একা একা।

জবাব না দিলেও প্রতিদিন নিয়ম ক'রে আসছে। ঠিক সময়েই আসে আসবনা মনে ক'রে বসে থাকলেও, থাকতে পারা যায় না। অদ্ভুত আকর্ষণ।

এই অদ্ভুত আকর্ষণে একটা কিন্তু ছেদ পড়ে মাঝে মাঝে। যখুনি বিয়ের প্রস্তাব তোলে কুহকম। সারা শরীর অবসন্ন হয়ে যায়। কতদূর থেকে ভেসে আসে কানে রেণুপরাগের আগের শোনা কথা। চোখের সামনে ভেসে এসে দাঁড়ায় আগের সেই শান্ত সুন্দর চেহারা। সেই মিষ্টি হাসি।

মনোবীণা জানে তার মাথায় মনে বুকে এসব সঞ্চয় হয়ে আছে। থাকবেও চিরদিন। বেশী আশ্চর্যের কথা মনে পড়ে না অন্য সময়। কল্পনার চোখে দেখাও যায় না তো। কুহকমের কাছেও হয় না ওই একটা বিশেষ কথার সময় ছাড়া।

রেণুপরাগের সঙ্গে মনোবীণার প্রথম পরিচয় রুগী হিসেবে। রুগী মানে যা-তা রুগী নয়। একেবারে মনোবিকারের রুগী।

মনোবীণার বিয়ে বিয়ে করে মা একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে। অন্ন-জল ত্যাগ করবার উপক্রম।

বিদুষী হলেও মেয়ে পছন্দ হয় না কারো। কালো, উঁচু কপাল, উঁচু দাঁত, বেঁটে চেহারা। মাথার চুল কম। শুধু চোখ দুটি সার।

পাত্ররা এসে খবর দোব বলে সেই যে চলে যায়, একটা পত্রও আসে না কোন পক্ষ থেকে। হ্যাঁ কি না।

মা তো কেঁদে সারা।

বাপমরা মেয়েকে কারো হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারলে, নিশ্চিন্ত।

তার বিয়ে হোক না হোক, তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই মনোবীণার। ছেলেদের অপছন্দতেও মনে কোন ক্ষোভ নেই। নেই কোন বিরক্তি। বরং খবর না এলে খুব খুশি।

দেখতে এলে পাত্রকে বিতর্কে এমন নাস্তানাবুদ ক'রে দেয় ইচ্ছে ক'রে, যাতে পালাতে পথ পায় না পাত্র। সন্দেশে আঙুল ঠেকানোই সার হয়। মুখে আর ওঠে না। যার মুখেও ওঠে, গলা দিয়ে নামতে চায় না। বিষম লেগে কাশতে কাশতে দম আটকে যাবার যোগাড়, মুখ-চোখ রক্তবর্ণ।

জলের গেলাস হাতে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে মনোবীণা। আহা, গলায় সন্দেশের কুঁচি আটকেছে বোধ হয়।

কপালে হাত ঠেকিয়েই মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেছে ঘর থেকে।

কৌচে বসে পরেছে ধপাস করে মনোবীণা। হাসতে হাসতে জল টলমল করে উঠেছে চোখের কোণে।

বিয়ে ভাঙার খেলায় মায়ের দুঃখ হয় জানে। তবু বন্ধনের বশে মন যে যেতে চায় না। কেন চায় না? জানে না, জানে না, জানে না।

মাকে একটু সতেজ সবল ক'রে তুলতে হবে। বড্ড শরীরে-মনে ভাঙন ধরেছে। মাথা থেকে একটা মতলব বার করতে হবে নিজেকেই, মনোবীণাকে।

আচমকা এক ভোরে মনোবীণাকে আস্তিক হয়ে উঠতে দেখে, মায়ের বিস্ময়ের অবধি নেই আর।

মেয়ে শিবপুজো করবে নিত্য। শিবচতুর্দশীতে পুজো-ব্রত শেষ।

কেন—কি বৃত্তান্ত। কে বলেছে—জিজ্ঞেস ক'রে মেয়েকে ঘাঁটাতে আর সাহস করল না মা। ভাবল, ব্যথা বুঝেছে তবু। ছোটবেলা থেকে তো শুনে এসেছে শিবপুজোয় মনোমতো স্বামী পাওয়া যায়। সেই জন্যই পুজো ব্রত হবে বা।

পাথরের ছোট শিবলিঙ্গ এনে দিয়েছে মা। শ্বেতপাথরের। উদ্দেশ্য, কালো মেয়ের ফর্সা বর হোক। রোজ বেলপাতা ফুল আসে শিবের জন্য আলাদা ক'রে। মা চন্দন ঘষে দিয়ে আসে ঠাকুর ঘরে।

মেয়ে তো ঠাকুর ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেয়। আধঘন্টা বাদে খোলে। নিরামিষ খাওয়া চলছে প্রতিদিন। খুব নিষ্ঠাকাষ্ঠায় রয়েছে মনোবীণা। মা-ও পুজোর শেষে ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রার্থনা করে আসে: ভোলা মেয়ে আমার পুজোপাঠ জানে না। যেমন ইচ্ছে করে। ওর দোষ ত্রুটি ধরোনা। ক্ষমাঘেন্না ক'রে পুজো নিও। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

যা ভাবা যায় নি, যা কল্পনা করা যায় নি, সেই অজানা-আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল শিবচতুর্দশীতে।

রাতে পুজো ক'রে ঘর থেকে বেরোল যখন মনোবীণা, দেখেই চমকে গেছে মা। সিঁথিতে সিঁদুর কপালে টিপ। দু'হাতে লাল রুলি শাঁখা। বাঁ হাতে লোহা। পায়ে আলতা। পরনে লালপাড় শাড়ি। এলো চুল। হাতে ত্রিশূল।

বেরিয়ে মায়ের দিকে বড় বড় চোখে তাকাল। বলল, শিবের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে আমার। তুমিও মুক্ত, আমিও মুক্ত।

বিয়ের ব্যাপারটায় সকলেরই এক ধারণা, মনোবিকার। বাড়িতে নিয়ে আসা হল মনের ডাক্তারকে। মনের ডাক্তার ছাড়া মনের রোগ আর সারাবে কে!

এলো ডাক্তার রেণুপরাগ।

বাইরে যাবার কথা। থিসিসের জন্য। ডক্টরেট পাবে। মন নিয়ে যত কারবার এর। খুব নাম করেছে।

প্রথমে একদৃষ্টে একমনে সামনে বসিয়ে মনোবীণাকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে রেণুপরাগ। তারপর সামনে থেকে সকলকে সরিয়ে দিতে বলেছে, তোমার কিছু বলার থাকলে নির্দ্বিধায় আমাকে বলতে পারো। আমি দেখছি তোমার কোন রোগ নেই। মনে-দেহে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ। তোমাকে লোকে ভুল বোঝে।

একগাল হেসে সমস্ত বলেছে মনোবীণা। শিবের সঙ্গে বিয়ের কারণটাও লুকোয় নি। দুঃখ ক'রে বলেছে, ডাক্তারবাবু, বলতে পারেন—সত্যি কি অপয়া? একটা দাঁত নিয়ে জন্মানোটা কি আমার

দোষ? এশিয়াটিক কলেরায়—একদিনে বাপ-ঠাকুর্দা চলে গেল। আমারই দোষে কি? আমার দৃষ্টিতে নাকি ছারখার হয়ে যাবে সবার কিছু—আমার চোখ ডাকিনী-ডাইনির? যাকে দেখবো, যে বাড়িতে থাকবো—অসুস্থ হয়ে পড়বে সে। অসুস্থ হয়ে পড়বে সে বাড়ির সবাই। সত্যি কি?

রেণুপরাগ স্থির হয়ে শুনছে।

এমন মনের কথা শোনাবার লোক পায় নি মনোবীণা আজ অবধি। ব্যথা জানাবারও না।

কাঁদছে মনোবীণা। হাপুসনয়নে কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে বলছে, সঙ্গ করতে ভয় ছিল ছোটবেলায়। কারো অমঙ্গল হয় পাছে। নিজের সঙ্গে নিজেই খেলা করেছি হেসেছি কেঁদেছি। কথা কয়েছি। সময়ে সময়ে দ্বিতীয় আমি আমার চোখের সামনে মূর্তি ধরে দাঁড়িয়েছে যেন। বড় হয়ে বুঝেছি এসব। আমার নিজের মনই নিজের প্রধানসঙ্গী।

রেণুপরাগের চোখে জল।

—ডাক্তারবাবু! পৃথিবীতে আমি একা। আদর স্নেহ পেলুম না। খালি অবহেলা আর অবহেলা। ঈশ্বর রূপের বেলায়ও কৃপণ। সেখানেও হাত গুটিয়েছে। সকলের চোখে আমি ঘেন্নার বস্তু। বেঁচে কিছু সুখ আছে কি আমার! বলতে পারেন?

—আছে, আছে। ধরাগলায় বলেছে রেণুপরাগ। কোন দোষ নেই তোমার। কারো কোন ক্ষতি হয় নি তোমার জন্য। তুমি ডাকিনী নও, তুমি ডাইনি নও, অপয়া নও।

বাড়ির লোককে বলেছে, একে সবাই মিলে যা-তা বলে বলে পাগল করবার চেষ্টা ক'রেছে। এর চিকিৎসার চেয়ে তাদের চিকিৎসারই প্রয়োজন আগে।

ডাক্তার একথা বলবে, ভাবাও যায় নি।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, কোন ভয় নেই। ওষুধের দরকার নেই কোন। রুগী দেখার পথ আমার এখান দিয়েই। একবার ক'রে দেখা ক'রে যাবো'খন।

কি নজরে যে দেখেছে অসহায়কে, রেণুপরাগ নিজেই জানে।

কথামতো ঠিকই এসেছে।

আসতে-আসতে অযোগ্যকে নিজের বাঁ পাশে বসিয়ে যোগ্য ক'রে তুলতে চেয়েছে। তার রূপসাগরে কুরূপকে ডুবিয়ে দিয়ে অরূপরতন তুলে নিতে বলেছে।

মনে দুরুদুরু ভয় মনোবীণার। ভাগ্য কি এতখানি প্রসন্ন হবে তার। একি মরীচিকার মায়া, না সুখ-স্বপ্নের ছায়া।

আমেরিকা থেকে ফিরে এসেই শুভ-পরিণয়। রেণুপরাগ ঘোষণা করেছে নিজমুখে সবার কাছে।

আমেরিকা থেকে চিঠি এসেছে যতবার, তাতেও ওই একই কথা। শেষের চিঠির আগের চিঠিতে লেখা—মনখারাপ। থিসিস বোধ হয় ভালো হয় নি। তারপরেই চলে যাওয়ার।

চারবছরে কত খোঁজা-খুঁজিই না হয়ে গেল। মানুষটার হদিশ মিলল কই। ওখানকার খবরে—অবিশ্যি তার চলে যাবার পর বেরিয়েছে—থিসিস খুব ভালো হয়েছে। ডক্টরেটও পেয়েছে রেণুপরাগ।

সবই ভালো। কিন্তু সব ভালোয় মানুষটা মনোবীণার জীবনে আনন্দের আলো জ্বেলে আর এলো কই !
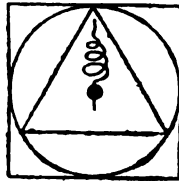
কুহকমকে আঘাত দিতে চায় নি মনোবীণা।

বলেছে, বিনয়নম্র সুরে।—আমার মনে-ধ্যানে-জ্ঞানে জ্বলজ্বল করছে আজও রেণুপরাগ। চিরকাল থাকুক, এটা আমি চাইও। তবে আপনার সহানুভূতি আমার স্মৃতিতে অক্ষয়-অমর হয়ে থাকবে বরাবর।

কুহকম একটাও উত্তর দেয় নি। বোঝানোর চেষ্টাও করে নি। নির্বিকার-উদাসীন।

নির্বিকার-উদাসীন দেখেছে মনোবীণা কুহকমের বাইরের চোখেমুখে। ভেতরের মনটা দেখতে পায়নি বলে, মনোভাব বোঝে নি তখন।

বুঝেছে পরে।

সকালে আসতে আসতে বিকেলেও আসতে ইচ্ছে ক'রেছে। কি প্রবল আকর্ষণ।

সকাল-বিকেল দুবারই আসছে। তবুও মনে তৃপ্তি নেই। বাড়ি গেলেই তিষ্ঠতে পারছে না মোটে। মন চাইছে কেবল কুহকমের কাছে চলে যেতে। রাতে হঠাৎ হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। তখনও এই অবস্থা। ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

মহাসমস্যায় পড়ল মনোবীণা।

চেতনাতে ধাক্কা লাগল সেদিন। যেদিন রাত্তিরে এসে হাজির হয়েছে কুহকমের দেবী-চাতালে।

হোমের আগুনে আহুতি দিয়ে চলেছে কুহকম একমনে—মনোবীণার নাম ধরে ধরে!…ওঁ শ্রীং কমলাক্ষি……আকর্ষয় আকর্ষয় স্বাহা।

বারণ সত্ত্বেও শুনছে না লোকটা। ওকে ফেরাতেই হবে! আর তার সঙ্গে মনোবীণাকেও! ওরই দেওয়া কামাখ্যার পরবিদ্যা আকর্ষণ মন্ত্রে ওকে এধরনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ থেকে মুক্ত করে তুলতে হবেই।…

এরপর বাড়ি ছেড়ে যখুনি কুহকমের কাছে ছুটে যেতে চেয়েছে মন। মনে মনে জপ করেছে মনোবীণা।—ওঁ ভগীং শ্রীং…পরবিদ্যামাকৃষ্যাপি… ছেদয় ছেদয় ক্রুট ক্রুট সর্বং জগদ্বশমানয় হ্রীং স্বাহা ‥।

মন স্থির হয়ে গেছে। যাবার ইচ্ছে চলে গেছে একদম। কোন সময়েই আর যায়নি মনোবীণা। না সকাল না বিকেল না রাত্তির।

এইভাবেই চলল দিন সাতেক।

মনোবীণার নির্বিঘ্নে নিরুদ্বেগে কেটেছে কটা দিন কিন্তু কুহকমের অবস্থাটা কি? মনোবীণার মনে এই একটা প্রশ্নই তোলপাড় করছে অনবরত। একবার দেখে আসতে হবে, দেখে আসা উচিত।

গেছে।

কুহকম বিছানায় শুয়ে। মুখেচোখে কালি ঢেলে দিয়েছে। খুব দুর্বল দেখাচ্ছে, যেন ছ'মাসের রুগী, গলার স্বরও ক্ষীণ। কথা কইতে কষ্ট বলে মনে হল। আস্তে আস্তে বলল, সমস্তই বুঝেছি। নিজের বাণে নিজেই মরেছি। আমার ওপরই শেষে—।

মনোবীণা আর্তস্বরে বলে উঠেছে, না না! এরকম হবে বুঝতে পারি নি। অনিচ্ছায় কষ্ট দিয়ে ফেলেছি।

কুহকম বলেছে, কাজের সময় আমায় সব মন্ত্র ভুলিয়ে দিয়েছে বুকে সজোরে আঘাত করে করে। মন্ত্রজপের সময় বুদ্ধি ক'রে একটু যদি জোর ইচ্ছে করতে—আকর্ষণক্রিয়া পণ্ড হোক, কিন্তু মানুষটার যেন কোন ক্ষতি না হয়—তাহলে এহাল আর হ'ত না।

মনোবীণার দু'চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে নীরবে। বলেছে, এটা চাই নি। আমি রোজ প্রার্থনা করব এবার। আপনার ব্যথা আমার হোক, আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন।

—না, আমি সেটা চাই না। তুমি সুস্থ থাকো। কর্মফল ভোগ করতে দাও। তুমি তো বারণ করেছিলে, আমিই শুনিনি। দোষ আমার।

দিনের বেলায় রাতের ঘুম নেমে এলো ঘরে।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মনোবীণা।

ঘুমজড়ানো গলায় বলল কুহকম, বীণু। আমার একটা অনুরোধ রাখবে? কথা দাও।

বলুন! সম্ভব হ'লে, নিশ্চয়ই।

দিনকতকের জন্য বাইরে ঘুরে এসো। মনটা শান্ত হোক। সত্যি বলছি, আমি চাই তুমি শান্তি পাও। আমি আপনা হতেই সুস্থ হ'য়ে উঠব'খন। কিছু ভেব না।

সেই চেষ্টাই করব।

মনমরা হয়েই ফিরেছে বাড়িতে মনোবীণা।

মামাকে-মামীকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাইরে যাবার বন্দোবস্ত ক'রেছে। একঘেয়ে একজায়গায় থাকাটাও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

মন-দেহ অসুস্থ হ'য়ে পড়ে ক্রমে। মাঝে হাওয়া বদল ভালো। অনেক দিন বাদ হ'য়ে গেছে।

এসেছে সদলবলে চিতোরে।

দুর্গের ভেতর কালীমন্দিরের সামনে আসতেই ভেতরের আগুনটা আরও বেশী করে জ্বলে উঠল। জ্বলে উঠল প্রদীপের অনির্বাণ শিখায় চোখ পড়তে।

এ শিখা তো দেবতাকে আলো দিতে পেরে নিজে ধন্য হচ্ছে। নিজের সাধনায় নিজে সিদ্ধ হচ্ছে—দেবতার মূর্ত্তি দেখে আর সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে।

মনোবীণার ভেতরের শিখার কি একই গুণ? মোটেই নয় ধারে-কাছে নয়। তার শিখা জ্বালাচ্ছে নিজেকে। জ্বালাচ্ছে যে সংস্পর্শে আসছে। জ্বালাবে সবাইকে।

আপনজন বলতে দরদী-মরমী বলতে এসেছে জীবনে দু'জন। এক রেণুপরাগ আর দুই কুহকম। তার শিখার তাপে একজন দূরে গিয়েও রইল না বোধ হয় পৃথিবীতে। আর একজনের তো অনিশ্চিতের পথে দু'পা বাড়ানো! কি হয় কে জানে।

এ সর্বনেশে সর্বগ্রাসী আগুনের শিখার হাত থেকে কোন দিন কি মুক্তি নেই মনোবীণার? সত্যিই কি মুক্তি নেই! সর্বশরীর কেমন অবশ হয়ে আসছে।

বেহুঁশ হয়ে পড়ছে বুঝতে পেরেই মামী দুর্গের বাইরে বার ক'রে নিয়ে এসেছে। ধরে না ফেললে, যে কোন মূহূর্তে যে কোন বিপত্তি ঘটে যেতে পারত:

মামীরই বুকে লুটিয়ে পড়েছে মাথা।

চেতনা ফিরে পেতে শিখার তাপ অনুভব করেছে চতুর্গুণ। ছুটে পালাতে ইচ্ছে করছে কোথাও। কেমন ক'রে কোথায় গেলে জ্বলুনি জুড়োবে। চিরশান্তি পাবে!

চনমন করে চাইছে চতুর্দিকে।

লক্ষ্য পড়ল এক বয়স্ক সন্ন্যাসী রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে

তাকিয়ে খুব হাসছে। প্রাণখোলা হাসি। হাতছানি দিয়ে ডাকল কাছে।

মুখ ঘুরিয়ে নিল মনোবীণা। যাবে না। নিশ্চয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে সমস্ত। অজ্ঞান হয়ে যাওয়াও। ছিঃ, মানুষের ব্যথাবেদনা নিয়ে উল্লাস। লোকের জ্বালা ঠাণ্ডা করতে পারে না যারা, কি অধিকার আছে তাদের জ্বালা বাড়ানোর হাসি-বিদ্রূপ ক'রে।

ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে, সন্ন্যাসী সকলের মঙ্গল। সকলের শান্তি। শান্তি-মঙ্গলের নমুনা দেখেই আক্কেল হয়ে গেছে। সন্ন্যাসী নিলয়ানন্দ ওপার থেকে এপারে নিজেই এসেছে।

মাথাটা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে উঠেছে জোরে।

ঘাড় তুলে তাকাতেই বিরক্তির বিষ ভরে উঠেছে মনে। কি হাসি, আহ্লাদে আটখানা একেবারে।

বলল, এত রাগ কেন? মারবি? মার। গালাগালি দিবি, দে। তবু বলব, তোর জ্বালা জুড়ুক তুই শান্তি পা। মনটাকে বিশ্বাসী ক'রে তোল রে। মনকে খালি বলবি, 'তুই ডাকিনী', 'ডাকিনী'!

আঁতকে উঠেছে মনোবীণা! একি—একি বলছে! এও যে বলছে। সত্যিই কি? এতদিন কি সকলে সান্ত্বনা দিয়ে চেপে রাখতে চেয়েছে?

নিলয়ানন্দ মাথার ঘাম মুখের ঘাম গেরুয়া চাদরে মুছে নিয়ে বলল, ডাকিনী শক্তিরে। সৃষ্টির আদি শক্তি। মানুষের ভেতরের জ্ঞান, জ্ঞানের আলো। জগতকে শান্তির আলো দেখানোর শক্তি। নিজের ভেতরকে জাগিয়ে তোল। জাগিয়ে তোল।

মনোবীণার ভেতরটা শান্ত হয়ে আসছে। কে এ? এ কোন দৈব মানুষ, না রক্তমাংসের মানুষ।

চেয়ে চেয়ে দেখছে শুধু।

হাসছে নিলয়ানন্দ।

হাসির শব্দে শুনছে মনোবীণা, ডাকিনী ডাকিনী ডাকিনী। না নিজের নিশ্বাসের আওয়াজেও শুনছে যে!

মনোবীণার দক্ষিণে সুনয়নী।

সুনয়নী একসময় শ্যামকিশোরের চোখে ছিল অন্যরকমের। অন্য মানুষ।

হিমালয়ের স্নিগ্ধকোমল-সবুজ কোলে ঘুরতে ঘুরতে শ্যামকিশোরের কি মানসিক যন্ত্রণা। শান্তি-পবিত্র পরিবেশ এমন হবার কথা নয়। যেখানে ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ অগুনতি লোকের মুখে-চোখে-বুকে অজানা আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত, সেখানে কেন এমন মনমরা-মনমরা ভাব শ্যামকিশোরের।

শ্যামকিশোর তার বাইরের চোখে দেখা, বাইরের কানে শোনার সঙ্গে কি মনের চোখে দেখা, মনের কানে শোনার কোন মিল খুঁজে পেয়েছে? কোন্ সুনয়নীকে দেখতে পেয়েছে সে বৈষ্ণোদেবী দর্শনের পথে যেতে যেতে? পাহাড়ি পথের চড়াই-উতরাই ভাঙতে ভাঙতে?

শ্যামকিশোরের চলার গতি কমে গেল আচমকা।

উত্তেজনাও থিতিয়ে আসছে! চনমন করে তাকাচ্ছে চতুর্দিকে শ্যামকিশোর। তার ভেতরে এসে কে যেন ভিড় সরাতে চেষ্টা কোরছে। কিসের ভিড়? মানুষের মুখের ভিড়, ওদের বিচিত্র ধরনের প্রকৃতির ভিড়।

এখানে কেন? এই উঁচুনিচু রুক্ষ-ধূসর পাহাড়ি পথে?

কে জানে। শুধু একটা গানের কলি, একটা পবিত্রমধুর সুর পাহাড়ি বাতাসে ভেসে আসছে। বাজছে কানে একনাগাড়ে। শ্যামকিশোরের মনের আনাচে-কানাচে অবধি আলোড়ন তুলছে। পাগলপারা দিশেহারা অবস্থা শ্যামকিশোরের। মনে হোচ্ছে এখান থেকে ছুটে পালায় কোথায় এখুনি।

শ্যামকিশোরের অস্থির-অস্থির ভাবটা লক্ষ্য কোরেছে রঞ্জনা। কাছে এসে, কানের পাশে মুখ এনে বোলেছে, তুমি অমন কোরছ কেন? কি

হোলো, হোলো কি তোমার! মন ঠিক কর। যেখানে আসা, যার কাছে আসা, যে কাজের জন্য আসা—মনে যেন থাকে। ভুললে চলবে না। অনেকদূর থেকে অনেক কষ্টে, এই কাশ্মীরে এই হিমালয়ের কোলে আসা। কি উদ্দেশ্যে কিসের টানে?

রঞ্জনার দৃষ্টির আওতা থেকে এতোটুকু রেহাইয়ের উপায় নেই শ্যাম-কিশোরের। ধরে ফেলবেই ফেলবে। ওর চোখের আয়নায় যেন অন্যের মনের ছবি ফুটে ওঠে।

ছবি ফুটে উঠুক আর না উঠুক, শ্যামকিশোর কিন্তু নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না আর কোনো মতে। মনের রাশ টেনে ধরে রাখার ক্ষমতা বুঝি হারিয়ে ফেলেছে।

তবুও চলতে হোচ্ছে এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

পেছনে যতোখানি পথ ফেলে এসেছে, সামনে পৌঁছুতে তার চেয়েও কম। ফেরার প্রশ্নই ওঠে না। আর তাছাড়া ওর অবসন্ন দেহ-মনকে চড়াইয়ের পর চড়াই ভাঙিয়ে নিয়ে চলেছে ওই সুরের হাওয়া, ওই গানের আকর্ষণ! ওপর থেকে ধসে ছুটে আসছে শ্যামকিশোরকে ঘন ঘন। ও স্পর্শে আছে মাতন, আছে কাঁদন। বাঁধন আছে কি?

আছে বৈকি! তা নাহোলে এগোচ্ছে কেমন কোরে!

আচ্ছা, তোমার কি হয়েছে—সত্যি কোরে খুলে বলো তো!

রঞ্জনার প্রশ্নে চমকে উঠেছে শ্যামকিশোর।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে, আমতা-আমতা করে বলেছে, কই—কিছু তো হয়নি।

মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠেছে রঞ্জনার।

মানুষটা গোপন কোরছে। কিছুটা আগে থেকে অদ্ভুত পরিবর্তন। ও যেন আর নিজের নয়। এক অদৃশ্য-অজ্ঞাত রশির বন্ধনে ও বাঁধা পড়ে চলেছে। হাসি-খুশি মানুষটা বুকভরা আনন্দ নিয়েই সারাক্ষণ মেতে থাকে নানা দেশের লোকদের নিয়ে। ও যেন ওদের কতো আপনার। কতো জানাশোনা। আজ সব অচেনা-অজানা! রঞ্জনাও বোবা হয়ে। শূন্যদৃষ্টি, উদাস চাউনি। পাশ দিয়ে লোক নেমে যাচ্ছে

কোনো খেয়াল নেই। 'মাতাজী জয়, মাতাজী জয়' ধ্বনি উঠছে চারদিক থেকে কোনো কান নেই।

কতো সুন্দর দৃশ্য !

কপালে সিঁদুরের টিপ, গলায় রঙিন সুতোর মালা। হাতে নানা রঙের নিশান। আনন্দে ভরপুর মানুষ খাড়াই পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে নামছে নিচে দলে দলে। কেউ নাচতে নাচতে। কেউ লাফাতে লাফাতে। কেউ হাততালি দিয়ে মায়ের নাম ভজন কোরতে কোরতে। নিভৃত-নিরালা হিমালয়ের কোলে ভরে উঠছে কতোশতো প্রাণের স্পন্দন, প্রাণের সাড়া ছড়িয়ে পড়ছে দিক থেকে দিকে। সকলে বুঝি এক পরিবারের। সকলে বুঝি সবার আত্মীয়—আত্মার আত্মীয়।

এ দৃশ্য-দর্শনের চোখ কোই এই মুহূর্তে শ্যামকিশোরের ! এ আনন্দ অনুভবের অনুভূতি কোই মনে ? এ যেন চোখ থাকতে চোখ নেই—সেই মানুষ। মন থাকতে মন নেই। রকমসকম দেখে-শুনে, ভেতরে ভেতরে কেমন হোয়ে উঠছে রঞ্জনা।

চড়াইয়ের সিঁড়ি ভাঙা শেষ ! একেবারে শেষ নয়। উপস্থিত কিছুক্ষণের জন্য।

একটা ময়দানে এসে হাজির হোয়েছে শ্যামকিশোর। সামনে ভগবতীর মন্দির। পরিষ্কার টলটলে জলের বাঁধানো কুণ্ড। ঘাটে বাঁধানো সিঁড়ি। মনোরম পরিবেশ। পাহাড়ের গায়ে একটা সরু সুড়ঙ্গ। ছোট্ট। বারোচোদ্দ হাতের মতো লম্বা। প্রবাদ, পাপীরা নাকি ওপারে পেরোতে পারে না। আটকে যায়। লোকচক্ষে কোন লোকই আর পাপী সাজতে চায় স্বেচ্ছায় ! তাই বড় একটা ওদিকে এগোতে চায় না কেউ। আর এ সময়ে তো যাবার কোন চিন্তাই আসে না কারো মাথায়। কেমন কোরে আসবে !

মন্দিরের সামনে মেয়েরা বোসে আছে গোল হোয়ে। মধ্যিখানে ফিনফিনে পাতলা ফিকে গেরুয়া রঙের কাপড় পরনে। দু'চোখ বুজে ভগবতী স্তোত্রগান গেয়ে যাচ্ছে একমনে, মেয়েদের কারো হাতে

খঞ্জনী কারো হাতে বেহালা আবার কারো কোলে ঢোল। সব বাজনাই বাজছে তালে লয়ে।

সুরেলা মধুরকণ্ঠ সন্ন্যাসিনীর।

হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধাভক্তি, জগতের সমস্ত মানুষের পবিত্র-শান্ত-সংযত ভাব যেন ওর মধ্যে দিয়ে উজাড় হোয়ে দেবীর চরণে সুরের অর্ঘ হোয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে। যতো বড়ই পাষণ্ড হোক না কেউ, এপরিবেশে এভাবের পরশে তার পাষাণ হৃদয় গলতে বাধ্য। বাধ্য বাধ্য বাধ্য। দেবতার উদ্দেশ্যে হোক না হোক, বিনা উদ্দেশ্যেই আপনা হতে মাথা নত হোয়ে আসবে।

বৈষ্ণোদেবীর দর্শনযাত্রীরা বোসে পড়েছে সবাই।

এ স্তোত্রগানের এমনই অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণ। চোখ বুজে মাথা দোলাচ্ছে অনেকে। রঞ্জনারও একই অবস্থা। কিন্তু—কিন্তু শ্যাম-কিশোর এদের সকলের স্বতন্ত্র! একদৃষ্টে তাকিয়ে সন্ন্যাসিনীর দিকে। সন্ন্যাসিনীর গানের সুরে-কথায় কি সত্যি সত্যি ওর মনপ্রাণ ডুবে যাচ্ছে?

না। ডুবছে না। তবে ভাসছে। ভেসে বেড়াচ্ছে বড্ড তাড়াতাড়ি। এতো তাড়াতাড়ি যে, ভাবাই যায় না! মর্মে মর্মে অনুভব কোরছে শ্যামকিশোর। মনের কারবারি নয় সে। কখনো নিজের মন কি অন্যের মন নিয়ে নাড়াচাড়া করেনি কখনো। করবার ইচ্ছেও জাগেনি ভেতরে। আজ এই মুহূর্তে এই আদকুমারীতে বোসে গান শুনতে শুনতে নিজের কাছে নিজেকে অদ্ভুত ঠেকছে। নিজের মনকে যেন দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট।

দুর্গাভক্ত সুনয়নী ছবির সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ধূপের আরতি কোরতে কোরতে এই স্ত্রোত্রগানই গাইতো রোজ। না, না। একটুও ভুল নয়, ভুল নয়। ঠিক শুনছে শ্যামকিশোর। সেই স্তোত্র! হুবহু একেবারে। আশ্চর্য! একটা শব্দেরও তফাৎ নয়।

"জগদ্ধাত্রী ত্বম,
রক্ষাকর্ত্রী ত্বম,
পরিত্রাত্রী ত্বম,

মুক্তিদাত্রী ত্বম,
ব্রহ্মা ব্রহ্মানী ত্বম,
শিব-শিবানী—
বিষ্ণু-বৈষ্ণবী ত্বম,
মম জননী …।”

প্রতিদিন ভোরে চান সেরে, লালপাড় গরদের শাড়ীতে সর্বাঙ্গ ঢেকে স্তোত্র-আরতি শুরু করতো সুনয়নী। দেয়ালে ঝোলানো দশভুজা-মহিষমর্দিনী ছবির সামনে।

কতো না বকাবকি কোরেছে সুনয়নীকে শ্যামকিশোর। ছবিতে ধূপের আরতির পর তাকে আরতি করার জন্য। —তুমি কি পাগল হলে নয়ন! আমি কি দেবতা?

ওগো! তুমি বোকো না। শরীর খারাপ হবে। এটুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না। আমার কাছে তুমিই কি কম! তুমিই যে আমার শ্রেষ্ঠ দেবতা। হাতের তেলোয় ধূপের ধোঁয়া মাখিয়ে শ্যামকিশোরের মাথায়-কপালে বুলিয়ে দিয়েছে সুনয়নী সযত্নে। —সুস্থ থাকো। দীর্ঘজীবী হও!

আহা-হা। দেবতা বানিয়ে আবার গুরুঠাকরুন হোয়ে বসলে যে! আশীর্বাদের ঘটা ছাখো একবার। তার চেয়ে বোসে বোসে মাথাটা একটু টিপে দাও দিকিনি। বড্ড ধরেছে।

মাথা টিপতে শুরু কোরেছে সবে। শ্যামকিশোরের মায়ের গলার আওয়াজে খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সুনয়নী।—বৌমা! খালি পেটে পুজো নিয়েই কি থাকবে খালি। পিত্তি পড়ে অসুখ কোরবে যে শেষে। কোন সাতসকালে চান করেছো বলো তো! নাও ধরো। এখুনি আমার সামনে খেয়ে নাও আগে। তবে আমি যাবো ঘর থেকে।

জলখাবারের থালাটা হাত থেকে নিয়ে টেবিলের ওপর রেখেছে সুনয়নী। জিভ কেটে বোলেছে, মা! আপনি নিয়ে এলেন!

শাড়ীর খুঁট গলায় জড়িয়ে প্রণাম কোরেছে সুনয়নী শাশুড়ীকে। হাত ধরে তুলে দাঁড় কোরিয়েছে সুনয়নীকে শাশুড়ী। চিবুকে হাত

দিয়ে নিজের ঠোঁটে ঠেকিয়ে বোলেছে, মা সুখী হও!

শ্যামকিশোরের দিকে তাকিয়ে বলেছে, তুই ড্যাব ড্যাব কোরে কি দেখছিস রে শ্যাম! উঠে পড়, উঠে পড়।

বড্ড মাথা ধরেছে মা ওর।

তুমিও যেমন হোয়েছো বৌমা। ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হয় মানুষ! সেবা করবার লোক পেয়েছে। দিনরাত মাথাই ধরছে। আমাদের তো আর মাথা নেই!

মুখ টিপে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে মা।

রোজ সকালে এই নাটক চলে এই ঘরে নিয়ম কোরে। একই দৃশ্য, একই বক্তব্য। আর মায়ের আনাগোনা। আর?

আর মায়ের প্রস্থানের পর, শ্যামকিশোরকে নিজের জলখাবারের ভাগ দেয়া সুনয়নীর। কাছে বোসে লুচির ফুলকিতে আলুভাজা দিয়ে টুকরো কোরে মুখে পুরে দিয়েছে সুনয়নী। চোখ বুজে খেতে খেতে এক একদিন রেকাবিতে কিছু আর থাকে নি সুনয়নীর।

চোখ খুলে বোলেছে শ্যামকিশোর, কি হবে!

কি আবার হবে! তোমায় চিন্তা কোরতে হবে না!

মানে? আমি মাকে গিয়ে বোলছি—খেয়ে ফেলেছি।

তড়াক করে লাফিয়ে পড়েছে খাট থেকে শ্যামকিশোর। একরকম দৌড়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

পেছন ফিরে তাকাতেই দেয়াল আলমারিতে নজর পড়েছে সুনয়নীর। কপালের লাল টকটকে বড় সিঁদুরের টিপটা আরো জ্বলজ্বলে আরো বড় দ্যাখাচ্ছে! ফর্সামুখ লজ্জারাঙা।

একটা জোরে নিশ্বাস পড়ার আওয়াজে চমকে উঠেছে রঞ্জনা। শ্যাম-কিশোরের গা টিপে ইশারায় জিজ্ঞেস কোরেছে, কি হোয়েছে?

মুখে কিছু বলেনি শ্যামকিশোর। খালি মাথা নেড়েছে। কিচ্ছু না।

স্তোত্রগান তুলে চলেছে এবার। দ্রুতলয়ে।

বাজনাবাদ্যিও ঝরণার জলের মতো তরতরিয়ে বোয়ে চলেছে বাতাসে নাচতে নাচতে। মানুষের মনও নেচে নেচে উঠছে। দেহতো নাচতে শুরু কোরে দিয়েছে। বসা মানুষরা উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাজিয়েরাও। সন্ন্যাসিনী তো আগেভাগে উঠেই 'জয় মা, জয় মা' গাইতে শুরু করে দিয়েছে। গানের তালে তালে হাততালি দিচ্ছে নিজে। কখনো ডানদিকে মাথা হেলছে, কখনো বাঁদিকে। পিঠভর্তি এলো রুখু চুল দুলছে। যেন চামর দুলছে চুলে। দেবী ভগবতীর আরতি হোচ্ছে বুঝি এখানে।

ছেলে-বুড়ো মেয়ে-ছেলে—সকলেই সন্ন্যাসিনীর গলায় গলা মিলিয়ে গাইছে। জয় মা, জয় মা, জয় মা জয়, ভগবতী জয়—।

রঞ্জনাও গাইছে। কিন্তু শ্যামকিশোর? না। একবর্ণও উচ্চারণ কোরছে না মুখ দিয়ে। নিস্তব্ধ নীরব।

সকলের সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় নি প্রথমে শ্যামকিশোর। স্থাণুর মতন বোসেই ছিলো চুপচাপ। জোর কোরে হাত ধরে টেনে তুলেছে রঞ্জনা। মানুষটার ভাবগতিক খুব ভালো ঠেকছে না। যেন কেমন-কেমন! এখানকার স্থানমাহাত্ম্য বর্ণনা কোরতে গিয়ে ভক্তিতে চোখে জল আসে। কণ্ঠ বাণী হারায়। কিন্তু সেই ভাব তো নয় শ্যামকিশোরের। মনে মনে বৈষ্ণোদেবীর কাছে প্রার্থনা কোরেছে রঞ্জনা। তোমার মাহাত্ম্যের বদনাম কোরো না মা নিজে। শ্যামকিশোরের মাথাটা ঠিক রেখো। দয়া কোরে বিগড়ে দিও না।

পাহাড়ের সুড়ঙ্গতে থেকেই নাকি ভৈঁরোর সৈন্যদের নিধন কোরেছেন দেবী। কামলালসায় পরিপূর্ণ দুর্দান্ত ভৈঁরোকে সংহার করেন কুমারী বৈষ্ণোদেবী এখান থেকেই। ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন কোরে ফেলেন তার সর্বত্রাস-জনত্রাস অসুরমুণ্ড। যেখানে মুণ্ড পড়েছে, সেই ভৈঁরোঘাঁটি পার হোয়ে যেতে হবে খানিক। তবে বৈষ্ণোদেবীর গুহামন্দিরে পৌঁছুনো যাবে।

এখুনিই যদি মনে-দেহে ক্লান্ত-অবসন্ন হোয়ে পড়ে এই মানুষ, তাহোলে প্রমাদ না গনে পারে না রঞ্জনা। রঞ্জনা কি কোরবে এই

বিদেশ বিভুঁয়ে। মনের জোরে শ্যামকিশোরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

যাক ! এবারে অচল হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নি আর শ্যামকিশোর। মা বোধহয় স্বকর্ণে শুনেছে তার প্রার্থনা।

চলছে শ্যামকিশোর।

সকলের পেছনে পেছনে। আস্তে আস্তে। সবার প্রথমে সন্ন্যাসিনী। পর পর সকলে অনুসরণ কোরছে। আবার চড়াই। আবার পাথুরে সিঁড়ি ভাঙাভাঙি। সন্ন্যাসিনীর মতন সবার মুখে 'জয় মা'। মুখ থেকে মুখে ঘুরছে-ফিরছে।

শ্যামকিশোরের পা চলছে বটে, কিন্তু মুখ বোলছে না এখনো।

আদকুমারীর অনেক ওপরে উঠে এসেছে সকলে।

পাহাড়ের মাথাটা প্রায় হাতীর মাথার মতন। তাই নাম হাতীমাথা। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চন্দ্রভাগানদী বয়ে যাচ্ছে দূরে—নিচে। মানুষজন ঘরবাড়িও স্পষ্ট ধরা পড়ছে চোখে।

শ্যামকিশোরের চোখেও কি ধরা পড়ছে ওসব ? না অন্য কিছু ! চাউনি দেখে মনে হয়, ওর দেহটা এখানে থাকলেও, মন বোধহয় ঘোরাফেরা কোরছে অন্য কোনোখানে। বড্ড আনমনা হোয়ে পড়ছে শ্যামকিশোর !
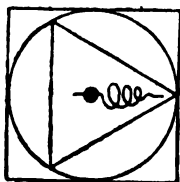
সুনয়নীকে নিয়ে যতো চিন্তাভাবনার বোঝা মাথায় চেপে বোসছে শ্যামকিশোরের।

না বোসে উপায় কি আর আছে।

হাসিহুল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে বেশ গল্পগুজবে আনন্দ উপভোগ কোরছে দু'জনে। শ্যামকিশোর আর সুনয়নী। গাড়িটা গ্রে-স্ট্রিট পেরিয়ে পুঁটেকালীর মন্দির ছাড়িয়ে শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুলের কাছে আসতেই

সুনয়নী কেমন অস্থির হোয়ে পড়লো।

প্রথমে শ্যামকিশোরকে বোলেছে, ছাখো! আমার বুকের ভেতর কিরকম কিরকম কোরছে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কি মনে হোচ্ছে যেন, তুমি অনেক দূরে। আর আমি? আমি আরো দূরে। তোমার কাছে আসতে চাইছি। পারছি না পারছি না!

শ্যামকিশোরের বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে।

পিঠে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বোলেছে শ্যামকিশোর, একি উদ্ভট ভাবনা তোমার নয়ন। আমি তো তোমার সঙ্গেই আছি। এতো ভয় কিসের?

—কি জানি কিসের ভয়! ভয় ভয় আসছে। ভেতরটা খালি হোয়ে যাচ্ছে যে আমার।

সুনয়নীর চোখের জলে শ্যামকিশোরের যে চোখে জল না এসেছে, তা নয়। আসছে, এসেছে। পকেট থেকে রুমাল বার কোরে মুখ মোছার ছলে চোখ মুছেছে। এর আগে কখনো এমন অকারণ ভেঙে পড়তে ছাখেনি শ্যামকিশোর। এমন অদ্ভুত কথা মুখ থেকে বেরোতে শোনে নি। শ্যামকিশোর আশ্চর্য হোয়ে যাচ্ছে খুব।

সুনয়নীর কান্না থেমেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। ছু'হাতে শ্যামকিশোরকে আঁকড়ে ধরলো আরো জোরে। মাথাটা শ্যামকিশোরের বুকে গোঁজা রোয়েছে। চোখ বোজা। কয়েক মুহূর্ত।

শ্যামকিশোর ভেবেছে ঘুমিয়ে পড়লো হয়তো। ঘুমের মতনই অবস্থা। একটা নির্দোষ শিশু কেঁদে কেঁদে যে ভাবে ঘুমিয়ে পড়ে, ঠিক সেই রকম।

হঠাৎ উৎকর্ণ হোয়ে উঠেছে শ্যামকিশোর। কি সব বোলছে সুনয়নী চোখ বুজে বুজে। খুব আস্তে আস্তে। ঠোঁট ছুটো নড়ছে। অনেক দূর থেকে ওর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে বুঝি।

—এ. ভি. স্কুলের দোতলায় একদিন ভিড়ে ভিড়।

তিলধারণের জায়গা নেই! ব্যাপার কি? ব্যাপার আবার কি! ছু'জন বিখ্যাত মানুষ উপস্থিত এখানে।

কারা কারা গো ?

নজরুল ইসলাম আর দিলীপ রায়।

দিলীপ রায়ের হারমোনিয়ামটি সুন্দর দেখতে। নিজের পছন্দসই তৈরী করানো। সোনা বাঁধানো রীড। নজরুলের কে এলে নূপুর পায়…' গানটি গাইলেন দিলীপ রায়। কি মধুর কণ্ঠ !

হাততালিতে গোটা হলটা ত্রুলে উঠল।

দিলীপ রায় জোড়হাতে নমস্কার জানালেন সবাইকে। দিলীপ রায় আর নজরুলের—তু'জনেরই পরনে গেরুয়া রঙের সিল্কের আলখাল্লা। তু'জনকেই মানিয়েছে ভালো। দেখে মনে হয়, গন্ধর্ব-লোকের গায়ক তু'জন মর্ত্যলোকের মানুষকে আনন্দ দেবার জন্যই সঙ্গীত পরিবেশন কোরছেন এখানে।

শোনা যায় রসরাজ অমৃতলাল বসু এই স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। তখব বড় রাস্তা বেরোয় নি। আগের বাড়িঘর ভাঙা যায় নি। খোয়া পেটা রাস্তা। গ্যাসের আলো। অমৃতলাল রোজ বিকেলে আসতেন স্কুলে। সিঁড়ির নিচে খোলা জায়গায় বোসে বোসে তামাক খেতেন। নল গড়গড়া কলকে সাজিয়ে দিতো দাশু দরোয়ান।

অমৃতলালের পরনে সাদা ধবধবে আদ্দির কোঁচা কোঁচানো থান ধুতি। সাদা শার্টে পাকানো আদ্দির উড়ুনি। পায়ে ব্রাউন নিউকাট জুতো। মোজা কিন্তু সাদা। এমন কি চোখের চশমার ফ্রেমও সোনার নয়, রূপোর। বেশবাসের সঙ্গে মিল রেখে। ফর্সা মানুষ। ঘাড় অবধি সাদা বাবরি চুল। সব মিলিয়ে অমন রসিক মানুষটির শ্বেতশুভ্র ব্যক্তিত্বই ফুটে উঠতো। বোসে বোসে কতো মেয়ে-পুরুষের সুখ দুঃখের কাহিনী না শুনছেন তিনি। সাধ্যমতো প্রতিকারের চেষ্টাও কোরেছেন।

ওই যে রাস্তার ওপরটায়। যেখানে পেট্রোল-পাম্প, ওখানে ক্ষেত্র-বাঁড়ুজ্যেদের ভাড়া বাড়ি ছিলো পাঁচ-ছখানা। রাস্তার ওপর যেটা, সেটার বেশ চওড়া রক। তিনতলা বাড়ি।

আচমকা সুনয়নীর বলা থেমে গেছে।

খুব ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। ভেতরে ভেতরে বোধহয় ওর বড্ড কষ্ট হোচ্ছে। ভয় পেয়ে গেছে শ্যামকিশোর। মাথাটা ধরে জোরে জোরে নেড়েছে।—নয়ন, নয়ন। অমন কোরছো কেন, অমন কোরছো কেন ? উঠে বোসো ! উঠে বোসো।

রাস্তার কল থেকে জল নিয়ে এসেছে ড্রাইভার।

সুনয়নীর চোখে-মুখে-মাথায় ছিটিয়ে দিয়েছে শ্যামকিশোর।

একটু স্বভাবিক হোয়ে উঠেছে সুনয়নী.

চোখ খুলেছে।

গাড়িটা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পেরিয়ে ধর্মতলার দিকে এগোচ্ছে।

শ্যামকিশোর এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়বে ভাবতেও পারে নি। কি বিভ্রাট, কি বিপদ ! এর পর সুনয়নীকে নিয়ে বেড়াতে বেরোনো সম্ভব হবে না তার। দেখছে সুনয়নীর দিকে চেয়ে চেয়ে। সেই হাসিমুখ। ভয়লেশের চিহ্নমাত্র নেই মুখে চোখে। এখন দেখে, কার সাধ্যি ধরে আগের ব্যাপারটা। একেবারে অন্য মানুষ।

জিজ্ঞেস কোরেছে শ্যামকিশোর, তুমি কি সব বোলছিলে, কি হোয়েছিলো বলতো।

আকাশ থেকে পড়েছে সুনয়নী।—কই, কি বোলেছি, কি কোরেছি !

দু'চোখে বিস্ময় শ্যামকিশোরের। মাথাটা কি বিগড়েছে। নাকি চাপা ছিলো, হঠাৎ চাড়া দিয়ে উঠেছে আবার।

বাড়িতে ফিরেও শ্যামকিশোরের খটকা যায় নি।

ভেতরে একটা অজানা অশান্তি রোয়েই গেছে। ঘটনাটা চেপে রেখেছিলো কদিন ভেতরে, কিন্তু তাতে অস্বস্তি বেড়েছে বৈ কমে নি। অগত্যা মাকে বোলতে বাধ্য হোয়েছে। শোনার পর মা গম্ভীর হোয়ে থেকেছে খানিক। তারপর জোরে একটা নিশ্বাস পড়েছে। পড়েছে যেন মায়ের বুক খালি কোরে দিয়ে। মা খুব চাপা গলায় থেমে থেমে বোলেছে, বৌমাকে একথা জানিও না আর দ্বিতীয়বার। খুঁচিয়ে ওকে মনে পড়িয়ে দিতে চেষ্টা কোরো না মোটে।

মা উঠে পড়ে, দরজায় খিল এঁটে দিয়ে এসে খাটে বোসেছে শ্যামকিশোরের পাশে। ফিসফিস কোরে বোলেছে, আমার যা মনে হোচ্ছে, হয়তো ও জাতিস্মর। পূর্বজন্মের কিছু ঘটনা মনে পড়ে গেছে পুরোনো জায়গায় গিয়ে। অমন অনেক শোনা গেছে। তবে এদের মনে যদি আগের ঘটনা বার বার আসে, তাহোলে কিন্তু বড় দুঃখের!

আকুল স্বরে প্রশ্ন কোরেছে শ্যামকিশোর, কিসের দুঃখ মা?

দুঃখ! দুঃখ—না পারে সে-জীবনে ফিরে যেতে, না পারে এ জীবনে নিজকে মানিয়ে নিতে। এর চেয়ে বড় দুঃখ কি আছে বাবা!

মা শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছতে-মুছতে ধরা গলায় বোলেছে, বৌমা আমার বড় গুণের। শুধু গুণের কেন—রূপেরও তো। বাঙালী মেয়ের মধ্যে ওরকম রূপ খুঁজে পাওয়া যায় কটার। আমি মেয়ের শোক ভুলেছি ওকে নিয়ে। কি নেটিপেটি।

কি যত্নই না করে আমায়। না খাইয়ে খায় না দুপুরে। আমাকে না ঘুম পাড়িয়ে ঘুমোতে যায় না। কতো বোলেছি, বৌমা যাও! যাও, আর দরকার নেই। সারা সকালটা খেটে খেটে সারা হোয়েছো, এবার একটু বিশ্রাম না-ও গে মা। শুধু কি আমার একার! কর্তা থেকে আরম্ভ কোরে কার বাকি রাখে ও। সকলের ওপর লক্ষ্য। কুকুর বেড়াল পাখীটা পর্যন্ত নজর এড়ায় না। কাকাতুয়া লালমোহন তো ও ছাড়া কারো খাবার ছোঁবে না! ঠোঁট ঠেকায় না পর্যন্ত। কাকাতুয়া তো চিৎকারে বাড়ি মাত কোরে দ্যায়।

এরপর মা ছেলের পিঠে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বোলেছে, শ্যাম! ভেবো না বাবা। জোড়হাতে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কোরেছে মা!—ঠাকুর! বৌমাকে আগের জন্মের কথা ভুলিয়ে দাও! আর যেন না মনে পড়ে ঠাকুর! আর যেন না।

সব সময় কি ঠাকুর কথা শোনে?

শোনা না শোনা তার মর্জির ওপরই নির্ভর করে।

এটা প্রমাণ হোয়ে গেছে খুব সুনয়নীর ক্ষেত্রে।

দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত পাড়ায় বাস কোরেও উত্তর কলকাতার

বনেদি পাড়ার আকর্ষণ টেনে নিয়ে যেতো ওদিকে শ্যামকিশোরকে। ওদিকেই মামার বাড়ি। ছোটবেলায় মানুষ হোয়েছে। বিকেলের দিকে বেড়াবার সময় চলে যায় মাঝে মধ্যে। শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের দিকে সুনয়নীকে নিয়ে যেতে মা বিশবার বারণ কোরে দিয়েছে। মাতৃআজ্ঞা বলবৎ রেখেছে শ্যামকিশোর। তাই ঘুরে যাচ্ছে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট দিয়ে স্টার থিয়েটারের কাছ ঘেঁষে।

সেদিনকার মতন আবার কেমন হোয়ে গেছে সুনয়নী। আগের দৃশ্যের নতুন কোরে আবির্ভাব আবার। শ্যামকিশোরের বুকে মাথা রেখে ঘুম ঘুম ভাব। আগের বক্তব্যের সঙ্গে এবারের কিন্তু মিল নেই। সুনয়নী বোলছে। কান পেতে শুনছে শ্যামকিশোর।

—কি সুন্দরই না অভিনয় করলো কৃষ্ণাভামিনী! ইরাণের রানী। অপরেশ মুখুজ্যের বই। অহীন্দ্র চৌধুরী দারা। রানী বাদশাহকে খুন কোরেছে বোলে ধরিয়ে দিয়েছে। মনে হোয়েছে কি নিষ্ঠুর হৃদয় রানীর। নিজে খুন কোরে পালাতে চেয়েছে নিশীথ রাতে দারাকে সঙ্গে নিয়ে। দারা রাজী না হওয়ায় বন্দী। বিনা অপরাধে। খুনী রানী নাকি দেখেছে বাদশাহকে খুন কোরে পালাতে। এর চেয়ে বড় সাক্ষী আর বড় প্রমাণ আর কি থাকতে পারে।

দরবারে বিচারের সময় দারা কিন্তু রানীর বিরুদ্ধে মুখ খোলেই নি একদম। কি সংযম! কিন্তু মৃত্যুপথের যাত্রীকে নিজের পাঞ্জা দিয়ে, ছদ্মবেশে বার কোরে দিয়ে মুক্তি দিয়েছে রানীই। দারার জন্য রাখা বিষ রানী নিজেই পান কোরে নিয়েছে আগে কয়েদখানায়। দারার ঘুম ভাঙার আগে।

রানীর ভালোবাসা অনুশোচনা বিষের জ্বালার দহন কি সুন্দর অভিনয়ের গুণে ফুটিয়ে তুলেছে কৃষ্ণভামিনী। দারার সততা সংযম অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ে জীবন্ত চরিত্র হয়ে ফুটে উঠেছে।

বাঁ দিকের গরুড় পাখীর পাশের দরজা দিয়ে নামছে মেয়েরা, কে কেমন অভিনয় করেছে আলোচনা করতে করতে। সিঁড়ির ধাপে ঝি দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, চোরবাগানের সেনেদের বাড়ির মেয়েরা নেমে

আসুন। নেমে আসুন। গাড়ি এসেছে, গাড়ি এসেছে। এবার চিৎকার করছে, রতনরানীর বাড়ির মেয়েরা···

নিশ্বাস নিতে কষ্ট শুরু হয়ে গেছে সুনয়নীর। মাথাটা এপাশ ওপাশ করছে অনবরত। চোখে-কপালে জল ছিটিয়েছে শ্যামকিশোর। শ্যামকিশোর মহা ফাঁপরে পড়ে গেছে সুনয়নীকে নিয়ে। ওদিকে বেড়ালে তো এমন হয় না। সুনয়নী সহজ-স্বাভাবিক। স্বচ্ছন্দ। এদিকে এলেই যতো বিপত্তি।

সুনয়নী জাতিস্মর হয়ে যায়।

পূর্বজন্মের দেখা-জানা স্মৃতি ভেসে ওঠে। ভর হওয়া মানুষের মতন বক্তা হয়ে ওঠে। শুরু হয়ে যায় কাহিনীর পর কাহিনী। শেষে দমবন্ধ যন্ত্রণা। বাপরে বাপ্। চোখে ছাখা যায় না। শ্যামকিশোরেরই কি কম কষ্ট নাকি। দেখেশুনে হাত-পা অবশ হয়ে আসে। বুকে হাতুড়ির ঘা পড়তে থাকে। সুনয়নীর আগে তারই না নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।

নাক কান মলে প্রতিজ্ঞা করছে শ্যামকিশোর, আর কোন্ বান্দা নিয়ে আসে এদিকে সুনয়নীকে। আর নয়। তু'বারে তুটো পর্ব। এলে. একলাই আসবে।

—তোমাকে কিছু বলার আছে আমার।

সুনয়নীর কণ্ঠস্বরে গজগজানি থেমে গেছে শ্যামকিশোরের। মুখ তুলে তাকিয়েছে।—বলো, কি বলবে!

বলতে গিয়ে বলতে পারে নি কোনো কথা সুনয়নী। কেবল এক-দৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছে। মাঝে মাঝে ঠোঁট তুটো কেঁপে কেঁপে উঠেছে।

অবাক হয়ে দেখেছে শ্যামকিশোর।

বলছে, কই! বলছো না তো কিছু। আবার কি হলো তোমার?

—না, না। কিছু না, কিছু না। গলা কেঁপে উঠেছে সুনয়নীর।

—তুমি বলো নি, কিছু কথা আছে?

থতমত খেয়ে বলেছে সুনয়নী, হ্যাঁ-হ্যাঁ বলেছিলুম। কিন্তু—সব যেন হারিয়ে গেল মাথা থেকে। গোলমাল হয়ে গেল সমস্ত। মনে আনতে চেষ্টা করেও, মনে করতে পারছি না একদম। একদম পারছি না।

এরপর থেকে আর উত্তরের রাস্তা মাড়ায় নি শ্যামকিশোর সুনয়নীকে নিয়ে। নিজের প্রতিজ্ঞা নিজে ভঙ্গ করে নি। যখন সুনয়নী সঙ্গে, তখন দক্ষিণে বেড়ানো। সুনয়নীর আনন্দ ছাখে কে। চোখে মুখে— সারা দেহে হাসির জোয়ার বয়ে যায় তিরতির করে। নানা গল্পে গানে আনন্দে সুনয়নী মাতোয়ারা করে রাখে শ্যামকিশোরকে।

শ্যামকিশোর তুলনা করে মনে মনে। বন্ধু-বান্ধদের মুখে যা শোনে তাদের বিয়ের জীবন, সে আর কহতব্য নয়। কি দুর্গতি এক একজনের। ওদের হতভাগা বললেই চলে। বৌ নিয়ে কারো কোনো সুখ-শান্তি নেই।

কেউ অফিসের ভাত পায় না। না খেয়েই উপোসী পেটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়। ফিরে এসেও যে খাবার ব্যবস্থা দেখবে— সে গুড়ে বালি। বৌ দশটায় রান্নাবান্না করে, খেয়েদেয়ে শয়নে পদ্মনাভে উঠবেন। ডাকবার উপায় নেই, বকাবকি করার উপায় নেই। ডাকাডাকি-বকাবকিতে নাকি মাথা ধরে ভয়ানক। এমন বমি শুরু হবে যে, ওয়াক-ওয়াকের ঠেলায় বন্ধুরও বমি এসে যায়। খাওয়ায় রুচি থাকে না।

যত্নআত্তি পাবে বলে গরীব ঘরের মেয়ে বিয়ে করে কেউ কি পস্তান না পস্তাচ্ছে। বৌয়ের তো ভুঁয়ে পা পড়ে না। কিছু করতে গেলে নাকি হাত-পা কেঁপে জিনিসপত্তর পড়ে ভেঙে খান খান। বৌয়ের নাকিসুরে কান্না! মা-বাবার কি আদরের মেয়ের আজ কি দুর্গতি। কখনো খাটতে ছায় নি। তাদের বুকে লাগতো। আপনার বলেই না। পরের ঘরে পরেরা কি বুঝবে।

ধনীর দুলালী নিয়ে এসেছে কেউ। সেখানেও হুজ্জোত। শিক্ষা-দীক্ষার গুণেও স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে কই! কথায়-কথায় বাড়ির সকলকেই অপমান। তার গ্রাহ্যের মধ্যে পড়ে না বাড়ির কেউ। স্বামীও না। সবাই নাকি করুণার ভিখারি। উনিশ-বিশ হলেই চেঁচামেচিতে রাস্তায় লোক জড়ো হয়ে যায়। চাকর-বাকরদের কাছে মনোমতো কিছু না পেলেই চড় উঁচিয়ে তেড়ে আসবে।—পায়ের জুতো মাথায়! যেমন

এ বাড়ির কর্তা-গিন্নীরা, তেমনি তো হবে লোকজন? ওদের সঙ্গে হ্যাঁ-হ্যাঁ-হি-হি করলে, মানবে কেন? রাখতে জানা চাই।

এ সবের কোনো বালাই-ই নেই শ্যামকিশোরের। মায়ের কথাই ঠিক। বহু জন্মের সুকৃতির ফলে সুনয়নীর মতন এমন শান্ত-লক্ষ্মীমন্ত বৌ ঘরে এসে ওঠে কারো। তাদের মধ্যে একজন শ্যামকিশোর নিশ্চয়ই।

পাহাড়ের উঁচুতে হাত মাথায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখেছে যাত্রীরা প্রকৃতির দৃশ্য। পীরপঞ্জালের চুড়ো যেন আকাশে হেলান দিয়ে দেখছে। শ্বেতশুভ্র রূপোলী চুড়ো ভারী মনোরম।

মুখ ফেরাতেই দেখলো রঞ্জনা শ্যামকিশোরের চোখ ওধারে নেই। রাগে গরগর করে উঠেছে, মরণ আর কি। মন তোমার কোথায় পড়ে আছে? আশ্চর্য মানুষ। এমন জানলে কে সঙ্গে নিয়ে আসতো। আপদকে সঙ্গে নিয়ে না এসে, একা এলেই ভালো ছিলো দেখছি। ওঁর কোনো দায়দায়িত্ব নেই, যত দায় আমার। দু'জনের একমন না হলে কি সংকল্পসিদ্ধি হয় কখনো! আমি যাচ্ছি উত্তরে, তো উনি পা বাড়াচ্ছেন দক্ষিণে।

শ্যামকিশোরের জামা ধরে টানতে চমকে উঠেছে।

রঞ্জনা তীক্ষ্ণস্বরে বলছে, ঠিক হয়ে একমন নিয়ে চলো। দোনামনা কর তো নেমে যেতে পার। স্বস্থানে প্রস্থান করতে পার। যখন এসে পড়েছি, তখন আমিই যাবো। বংশে বাতি দেবার লোকের প্রয়োজন শুধু আমারই একার, ওনার কিছু নয়। তাজ্জব ব্যাপার। আবার বেহায়া-নির্লজ্জের মতন বলে দিচ্ছি কিন্তু। এবারে আরো ওপরে ওঠার পালা। অন্যমনস্ক হলে চলবে না একদম।

ওপরে ওপরে, আরো ওপরে উঠছে সকলে।

'জয় মা,' নাম কীর্তনের ধুন ভেসে বেড়াচ্ছে পাহাড়ি বাতাসে।

সন্ন্যাসিনী সকলের আগে আগে চলেছে। পেছু পেছু অন্যেরা

মুখে নাম গান সন্ন্যাসিনীর। মিষ্টিগলা আরো মধুর হয়ে উঠেছে। দু'হাতে মীরাবাঈয়ের মতন করতালি বাজছে। ঝন ঝন, ঝুন ঝুন, ঝনাৎ ঝনাৎ।

এই গান এই বাজনা সারাটা পথের পরিশ্রম লাঘব করে দিচ্ছে সকলের। এনে দিচ্ছে ভেতরে এগোনোর প্রেরণা-উত্তেজনা। ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে অফুরন্ত আনন্দের স্রোতের মধ্যে দিয়ে।

সব চেয়ে উঁচু চড়াই সাঁজীছতে এসে পৌঁছেছে সবাই।

এবারে চলা শুরু পাহাড়ি সরু পথে।

রঞ্জনা দেখছে শ্যামকিশোরকে। চলল অনেকটা স্বাভাবিক। সকলের চলার গতির তালে পা মিলিয়ে চলেছে। এপাশে খাদ, ওপাশে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে হাত রেখে রেখেই যাচ্ছে।

এতোক্ষণের ঘামে ভেজা গরম শরীরে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে বেশ জঙ্গলের ভেতর।

একদৃষ্টে দেখছে সন্ন্যাসিনীকে শ্যামকিশোর।

দেখুক, তবু ওঁকে দেখলে অন্তত উদাস নির্বিকার ভাবটা তো কাটবে! স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে রঞ্জনা।

সন্ন্যাসিনীর ওপর দৃষ্টি আটকে রইলো না বেশীক্ষণ শ্যামকিশোরের। কেবল জঙ্গল আর গাছপালার দিকে দৃষ্টি। বুনো গাছের ওপরই চোখ ঘুরছে ফিরছে অনবরত।

শ্যামকিশোরের গালের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে। দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। চোখের কোণ লাল। পাগল-পাগল চাউনি। এ আবার অন্য মূর্তি। আচমকা পরিবর্তনে রঞ্জনা ভীত-সন্ত্রস্ত। গোমড়ামুখো মানুষটার কোনোদিন মনের খবর পায় নি। মন খুলে কোনো কিছুতে সায়ও ছায় নি। সদাই তিতিবিরক্ত-উগ্র। এ লোকের কাছে পাওনা শুধু অশান্তি। লোকটা বোধহয় শান্তি দিতে জানেনা, শান্তি পেতে চায় না। সবটাতে অসহ্য সবটাতে অশান্ত। অনেক সাধ্যি-সাধনা করে, তবে আনা হয়েছে। এসেছে। রঞ্জনা এখানে দু'একবার বকাবকিও করেছে। বেশী করলে, বিগড়োতে পারে। বিগড়োলে আর

রক্ষে নেই। অগত্যা চুপ করে থাকা ছাড়া অন্য কোনো গত্যন্তর নেই আর রঞ্জনার। রঞ্জনা মনে মনে দেবীর স্মরণ করেছে আর লক্ষ্য রেখে রেখে চলেছে শ্যামকিশোরের পাশে পাশে।

শ্যামকিশোরের ভেতরে ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

মুখেচোখে ফুটে উঠেছে দুরন্ত-দুর্দান্ত ঝড়ের তাণ্ডবলীলার ভয়াবহ ছবি।

উঃ, কি যন্ত্রণা সেদিন!

শোনার পর ছুটে এসেছে বাড়িতে। হন্যে হয়ে এঘরে-ওঘরে খুঁজেছে সুনয়নীকে শ্যামকিশোর।

সুনয়নী তখন ছাতে-ঠাকুরঘরে। সন্ধ্যা-আরতির পঞ্চপ্রদীপে ঘিয়ের সলতে বসাচ্ছে। পুরোহিতমশাই আসবার সময় হয়ে এসেছে। বংশের নারায়ণ শিলার নিত্য-সেবার ভার সুনয়নীর ওপর। শাশুড়ী বলে, বৌমা আমার খুব ভক্তিমতী। ঠাকুর সেবার উপযুক্ত মেয়ে বটে। ঠাকুর নিজের সেবা করাবার জন্য নিজেই যোগাড় করে এনেছেন বৌমাকে।

ঠাকুর ঘরের চৌকাঠের ওপারে কে যেন এসে দাঁড়ালো দুম করে পা ঠুকে।

চমকে ফিরে তাকাতেই সুনয়নীর চক্ষুস্থির।

একি চেহারা! উসকোখুসকো চুল। মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে শ্যামকিশোরের। রক্ত ঠিকরে বেরিয়ে আসে বুঝি! এ রূপের সঙ্গে পরিচয় নেই সুনয়নীর।

গলার স্বরে বাজ পড়ার আওয়াজ শুনলো সুনয়নী। বুকের ভেতর কেঁপে উঠেছে। শ্যামকিশোর সপ্তমে গলা চড়িয়ে চিৎকার করে উঠেছে।—এ বাড়িতে আর তোমার স্থান নেই। এখুনি বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও!

কিংকর্তব্যবিমূঢ় সুনয়নী কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়েছে।

চেঁচামেচিতে ছাতে উঠে এসেছে শাশুড়ী। ছেলেকে ঠাণ্ডা করতে গিয়ে হিতে বিপরীত। আরো উত্তেজনা বেড়ে উঠেছে শ্যামকিশোরের।

মাকে বলেছে, শয়তানী না গেলে, আমি খুন করে ফেলবো। পুরো পাপ ঢুকেছে সংসারে। সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। ছুঁলে পাপ, মুখ দেখলে পাপ।

আঃ। চুপ কর্ বলছি শ্যাম। না হলে আমি তোর পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো বোলছি। মুখে আটকাচ্ছে না যে কিছু। কাকে বলছিস কি তুই রে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। পাশের ছাতে লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে। চুপ কর, চুপ কর।

মায়ের ভৎর্সনায় ভয় পায় নি শ্যামকিশোর। কে শুনলো না শুনলো সে ধারে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। গলাও নামায় নি। বরং চড়িয়েই বলেছে, জিজ্ঞেস কর। জিজ্ঞেস কর তোমার দেবী তোমার লক্ষ্মী তোমার বিশ্বাসী আপনজনকে—রতনরানী তার কে? সমস্ত গোপন করে ঠকিয়েছে ওরা।

ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে সুনয়নী।

সারা শরীর কাঁপছে। পায়ের তলায় ভূমিকম্প হচ্ছে বুঝি। কোন-রকমে চোকাঠে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম সেরে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে সিঁড়ির দিকে। দু'চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে।

সুনয়নী অনেকবার বলতে চেয়েছে। শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের ব্যাপার যে তার মায়ের কাছ থেকে শোনা। ক্ষেত্র বাঁড়ুয্যের ভাড়া-বাড়িতে মায়েরা একদিন ছিলো। স্টার থিয়েটারের কথা মায়েরই গল্প করা। বলতে গিয়েও বলতে পারে নি। মায়ের নিষেধ বাধা দিয়েছে। মাঝখানে দোটানায় পড়ে অসুস্থ বোধ করেছে সুনয়নী। গোপন করাটাই ধরলো। হৃদয় বুঝলো না হৃদয়বানেরা।

বৌমা! দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে এসেছে শাশুড়ী।

থমকে দাঁড়িয়েছে সুনয়নী।

মায়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে শ্যামকিশোর।—না! কিছুতেই এবাড়িতে থাকা হবে না একদণ্ড ওর। ওরা চাউনি, ডাকিনী বিদ্যেয় মানুষকে বশ করে রাখে, ভেড়া বানিয়ে রাখে। মায়াবিনীর মায়ায় পড়লে চলবে না তোমার। সরে যাও সামনে থেকে। শীগগির সরে যাও।

কাঁদতে কাঁদতেই বালীগঞ্জের বাড়িতে ফিরেছে সুনয়নী।

শরৎশশী তখন খাটে শুয়ে রেকর্ডপ্লেয়ারে একটা পুরনো দিনের গান শুনছে। এ গানটা ওর খুব ভালো লাগে। বলে, এ গান তারই জীবনের ছবি। হিজমাস্টার ভয়েসের রেকর্ডে আশ্চর্যময়ীর গান।

ঘরে নীল আলো জ্বলছে।

সবুজ লেবেলের রেকর্ড ঘুরছে।

কি চাঁচাছোলা চড়া গলা আশ্চর্যময়ীর।

অনেক শুনেছে, তবুও গান হোতে শুরু হোলে এখ'না একমনে শোনে শরৎশশী। শরৎশশী শুনছে দু'চোখ বুজে।

'স্বপনে তারে দেখেছিনু
স্বপনে হোলো পরিচয়।
স্বপনে ভালোবেসেছিনু
দেখেছিনু প্রেমময়।
স্বপনে আমি নিঝুমরাতে
ধরাধরি করি হাতে,
বেরিয়েছিনু কতো রাতে—
জানি না সে কোন সময়।
স্বপনে যে গো হোয়েছিলো
হৃদয়েরই বিনিময়।

শরৎশশীর বুকের ওপর এসে আছড়ে পড়েছে সুনয়নী। চমকে উঠেছে শরৎশশী। মেয়ের চোখে কান্নার বন্যা দেখে অশুভ ইঙ্গিতই উঁকি মেরেছে মনে।

পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছে, কি হোয়েছে বলবি তো আগে! এতো কাঁদছিস কেন? শ্যামকিশোর কোথায় গেলো? ওর সঙ্গেই এসেছিস তো?

উঠে বসেছে সুনয়নী। কাঁদতে-কাঁদতেই বলেছে, ও আসবে কি! ও-ই তাড়িয়ে দিয়েছে।

তাড়িয়ে দিয়েছে! কিছু বোলেটোলে ফেলেছিস নাকি?

আমাকে বলতে হয় নি। রতনরানী কে হয়, কোত্থেকে শুনেছে ও, ও-ই জানে। সমস্ত জেনে ফেলেছে মা! সমস্ত—।

ধড়মড় করে উঠে বসেছে শরৎশশী। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছে, নাতনির ভালোটা মা বুঝলো না। বুঝতে চাইলো না। মা-ই এই সর্বনাশ করেছে। নিজের মতো সবাইকেই করতে চায়। শরৎশশীর জীবনটা তছনছ কোরে দিয়েও আশ মেটেনি।

ক'দিন আগে রামলালকে দিয়ে শরৎশশীকে ডেকে পাঠিয়েছে রতনরাণী বিডনস্ট্রিটের বাড়িতে।

গেছে শরৎশশী।

মায়ের সেই আগেকার কুপরামর্শ। শরৎশশীর এসব মোটে পছন্দ নয়। বিশেষ করে সুনয়নীকে নিয়ে এমন সব কথা ভালো লাগে না একদম।

রতনরানী ময়নাপাখীকে পড়ানোর মতন এক উদ্দেশ্যেই তুলে ধরেছে শরৎশশীর চোখের সামনে।

নয়নের জীবনটা ওভাবে নষ্ট করিস নি। এখনো সময় আছে। অমন গলা অমন রূপ। মেয়েটাকে বন্দীবাঁদী করলি একজনের ঘরের বৌ করে। ওদের ভালোবাসা। মুখে আগুন। নাড়ির খবর জেনে, কতো রাখতে পারে ভালোবাসা, দেখি একবার। ওদের সমস্ত মেকি, মেকি! একটু এধার ওধার হলে, দিল বিগড়োতে তর সয় না। নকল রঙ চোটে আসল বেরিয়ে পড়তে একটুও দেরী হয় না। এখনো নয়নের আশায় বোসে রাজাসাহেব সুমন সিং। ও তো ওর গানে পাগল। বাড়ি-গাড়ি হীরে-জহরত আর দাস-দাসীর কোনোদিন অভাব হবে না জীবনে নয়নের। নয়ন রানী হবে রে শরৎ, রানী হবে, ভুল করবি না। ভগবান সব সময় মুখ তুলে চায় না। সুযোগ ছাড়তে নেই কখনো। লক্ষ্মীকে অবহেলা করা হয় তাহলে।

রাজাসাহেব সুমন সিং।

রহিস আদমি। গানবাজনা অতি প্রিয়। মনরুবাই বৌবাজার থেকে বেড়াতে এসেছে রতনরানীর বাড়িতে। গানবাজনার আসর

বসবে সন্ধ্যেয়। মনরুও গাইবে, শরৎশশীও। বাজনাবাদ্যির তোড়জোড় চলছে। সারেঙ্গী তবলা হারমোনিয়ামের সুর 'সা'য়ের পরদায় সুর মেলানো হচ্ছে। পূরবী সুরের 'সা'-য়ে।

তিনতলার বারান্দায় বুক ঝুলিয়ে কান পেতে একমনে শুনছে সুনয়নী। হঠাৎ মনের মধ্যে তোলপাড় কোরে উঠলো সুরের ঝঙ্কার। ষোড়শী-সুন্দরী বাঁহাত বাঁকানে চেপে তরতর করে নামতে লাগলো সিঁড়ি বেয়ে। আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ·····। রেওয়াজ করা সাধা গলা। অপূর্বকণ্ঠ সুনয়নী একতলার উঠোনে এসে কপালে মুখে জল দিচ্ছে, আর সুর ভাঁজছে। মুখ ধুতে এসে মুখ ধোয়া ভুলে এই কাণ্ড!

সুমন সিং মনরুবাই রতনরাণী শরৎশশী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পড়েছে সবাই। 'ক্যা বাত্ ক্যা বাত্' রব উঠছে সারেঙ্গীজী তবলচিজীর মুখ থেকে। ওরা যে যার যন্ত্রপাতি বার করে, সুনয়নীর গলার সুরে বাজাতে শুরু করে দিয়েছে ঘাড় নেড়ে নেড়ে। সুনয়নীর কোনো খেয়ালই নেই। গেয়েই চলেছে।

সুনয়নীর গলা-গান শুনে সুমন সিং মুগ্ধ।

মনরুবাই দোতলা থেকে নেমে এসেছে একতলায়। রকে বোসে বোসে শুনছিলো। গান থামতেই, দৌড়ে এসে জাপটে ধরেছে সুনয়নীকে। ত্ব'গালে চুমু খেয়ে, চিবুক ধরে আদর করে বলেছে, জিতা রহো বেটি!

রতনরানীকে মনরুবাই বোলেছে, এ মেয়ে আখেরে নাম রাখবে তোমাদের। তোমার নাতনি হলে কি হবে—তোমাদের চেয়ে অনেক বড় হবে। হ্যাঁ, এর জিনিস আছে ভেতরে। দরদ আছে। দরদ না থাকলে দরদীগলা হয় না।

রতনরানী খুশি। একগাল হেসে বলে, তোমার মুখে ফুল-সক্কর পড়ুক ভাই। পড়ুক মিছরী মণ্ডা-মেঠাই। হো-হো করে হেসে ওঠে সকলে।

তখন থেকেই সুমন সিংয়ের নজর সুনয়নীর ওপর। নিজের জীবিকার মধ্যে মেয়েকে টেনে আনতে চায় নি শরৎশশী। একদিকে

গান-নাচে যশ-অর্থ-প্রতিষ্ঠা-সম্মান আছে বটে, তবুও কি পুরো মর্যাদা পায় তারা তাদের গুণমুগ্ধদের কাছ থেকে, সমঝদারদের কাছ থেকে ?

পায় না, পায় না, পায় না।

ওদের বাড়ির বৌয়ের সম্মান ? মোটেই না। তারা শুধু চোখের খোরাক মনের খোরাক কানের খোরাক। ব্যস্, ওই পর্যন্ত। স্বামী-স্ত্রীর মনে রাখারাখির মতন—বরাবরের জন্য কোথায়! দু'দিনের আসা-যাওয়া। তারপর নিজেকে নিয়ে নিজের থাকা। নিঃসঙ্গজীবন। শরৎশশী কতো বুঝিয়েছে মাকে। তার চেয়ে একজনের হাতে তুলে দিলে, তবু একটা হিল্লে হবে।

মাথা বাঁকিয়ে বলেছে রতনরানী মেয়েকে, কখ্খনো না, কখ্খনো না। বাজে চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দে দিকিনি। মতিচ্ছন্ন আর কাকে বলে, সুখে থাকতে ভূতে কিলনো।

নিজের জীবনকাহিনী শুনিয়েছে পাটিপেড়ে রতনরানী। রতনরানী সুখি হয় নি স্বামীর ঘরে। খাওয়া অবধি জুটতো না কোনো কোনো দিন। তার ওপর স্বামীর নির্দয় ব্যবহার। উপোসী পেটের মানুষের ওপর কি প্রহার! প্রতিবেশীদের কাছ থেকে টাকা ধারকর্জ কোরে এনে কেন দেয়া হয় নি তার হাতে। তার নেশা বন্ধ, তার জুয়াখেলা বন্ধ। এমন স্ত্রীকে মেরে-মেরে, মেরে ফেল্লেও রাগ যায় না।

প্রতিবেশী কর্তাবাবুর কাছে টাকা ধার করতে গিয়েই তার ছেলে কমলের সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে রতনরানীর। রতনরানীর দুঃখে কমল দুঃখী। যতোটা পারে মারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করে টাকা দিয়ে দিয়ে। এদিকে পতিগুরুর লোভ আকাশছোঁয়া হয়ে উঠলো। যখুনি যা চাইছে, তখুনি তা পাচ্ছে তো! একদিন ওর দাবির অঙ্ক থেকে কিছু টাকা সরিয়ে রেখেছে রতনরানী। মানুষটা তো হুতাশন! কানা-কড়িও রাখবে না ঘরে। শেষ করে ফেলবে সঙ্গে সঙ্গে। বাচ্চা মেয়েটার কান্না থামাতে তো হবে তাকেই। পাঁচে পড়েছে, বাড়বৃদ্ধি সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না খেতে পেয়ে পেয়ে।

পুরো টাকা গেল কোথায় ?

স্বামীর তর্জন-গর্জন হুমকি। তার ওপর আঘাত হানতে কসুর করে নি। লাথি-কিল-চড় একনাগাড়ে চলেছে। কড়া জান আর কইমাছের প্রাণ বলেই বুঝি মরে নি, অজ্ঞান হয়ে পড়ে নি। শেষে আরো বাকি ছিল। রাতদুপুরে মা-মেয়েকে গলা ধাক্কা দিতে দিতে বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে সদরে খিলতাড়া এঁটে দিয়েছে ভেতর থেকে।

মেয়ের হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হয়েছে কমলের কাছে। কোথাও নিয়ে রেখো এসো আমায়, আর পারছি না। চরম হয়ে গেছে আমার। যদি ব্যবস্থা না কর, মা-মেয়েকে পুকুরের জলে ভেসে উঠতে দেখবে। জ্যান্ত নয়, মড়া।

মৌরীগ্রাম থেকে কমলের সঙ্গে চলে এসেছে রতনরানী।

রতনরানীর কি খারাপটা হয়েছে। বাড়িঅলী মাণিকমালা গলা শুনে নিজের ওস্তাদজীর কাছে তালিম নেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তারপর থেকে রতনরানীর ভাগ্য ফিরতে শুরু করেছে। এদেশে-ওদেশে রাজামহারাজদের গান নাচের আসরে ঘন ঘন ডাক আসতে শুরু করছে। গান নাচের তারিফ মুখ থেকে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। গান-নাচ রতনরানীর লক্ষ্মী। কি না হয়েছে এর দৌলতে। দৌলতে দৌলত হয়েছে তো সত্যিসত্যি। যার পেটে অন্নজল পড়ে নি একদিন, সেই রতনরানী আজ দু'হাত তুলে অন্ন বিতরণ করতে পারছে তো অভাবী-জনের মধ্যে।

রতনরানীর কোনো অভাবই নেই। কলকাতায় তিন-চারখানা বাড়ি। ঠাকুরবাড়ি একটা। রাধাকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা করা। আস্তাবলে ঘোড়া, ফিটনগাড়ি।

শরৎশশীও আলাদা বাড়ি করেছে।

কিন্তু নিজের মেয়ে সুনয়নীকে মা-দিদিমার মতন আসরে দাঁড় করাতে চায় না। বাবাকে দেখেছে শরৎশশী। তখন আট-ন বছরের। বাবা খোঁজ করে করে ঠিক বার করেছে। মাকে কতো অনুনয়-বিনয়! শরৎ তার মেয়ে। ফিরিয়ে দিক। এখানে থাকলে ওর ভালো ঘরে বিয়ে হবে না। সমাজে স্থান পাবে না। বাবার দু'চোখ উপচে জল গড়িয়ে পড়েছে।

মুখের ওপর মা দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

সেদিনই রতনরানী অন্য বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এমন লুকিয়ে রেখেছে শরৎশশীকে, কখনো বাবার নজরে যেন না পড়ে।

বাবার দেখা জীবনে পায় আর নি শরৎশশী। শরৎশশী স্বামীর সংসার পায় নি বলে, বাবার ইচ্ছে পূরণ হয় নি তাকে নিয়ে, ভেতরে একটা ব্যথা খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধতো মাঝে মাঝে। বাবার জলভরা চোখ ভেসে উঠতো চোখে। মায়ের ওপর ভীষণ রাগ আসতো।

শরৎশশী চেয়েছে মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে নিজের মেয়েকে। সুনয়নীকে।

উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে।

সুনয়নীকে লেখাপড়া শিখিয়ে মনোমতো করে মানুষ করেছে। অতীতের কোনো চিহ্নই নিজের ঘরে রাখতে চায় নি আর। রাখে নিও। সম্পূর্ণ নতুন জীবন! নিজের আর সুনয়নীর। কলেজে পড়তে পড়তে শ্যামকিশোরের সঙ্গে সুনয়নীর প্রণয়।

বিয়ে দেবে কেমন করে শরৎশশী মেয়ের। কি পিতৃপরিচয়! কি বংশপরিচয়! বিপদভঞ্জনের ভূমিকা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সুখেন্দু। সঙ্গীত প্রেমিক সুখেন্দু শরৎশশীর গান-গলাকেই একান্ত মনে ভালবেসে এসেছে। দেহের ওপর নজর ছিল না তার কোনোদিন। সুখেন্দু খুব বিশ্বাসের পাত্র শরৎশশীর। ও যেন ওর একান্ত আপনজন।

স্কুল-কলেজে সুখেন্দুর পরিচয়েই সুনয়নীর পরিচয়। ধর্মবাবা তো নিজের বাবার চেয়ে বড়। সেই তো অভিভাবক—বাবা।

সুখেন্দু সুনয়নীর বিয়েতে দাঁড়িয়ে মনস্কামনা পূর্ণ করেছে শরৎশশীর।

অতি সন্তর্পণে, অতি গোপনে বিয়ে হয়ে গেছে সুনয়নীর। রতনরানী ঘুণাক্ষরে জানতে পারে নি।

যখন জানতে পেরেছে, তখন হায়, হায় করে মাথা চাপড়েছে। কি সর্বনাশ করে ফেললো সুনয়নীর সর্বনাশী পোড়ারমুখী ওই শরৎশশী। রতনরানী ছাড়বার পাত্রী নয়। তার ওপর টেক্কা দেয়া। তাকে অগ্রাহ্য করা। হাতে অস্ত্র আছে রতনরানীর। মোক্ষম অস্ত্র। রাজা-উজিরদের

মন জানতে আর বাকি নেই রতনরানীর। পান থেকে চুন খসলে, বিচ্ছেদ। ওদের মন কাঁচের বাসন। সহজে ভেঙে চুরমার।

শ্যামকিশোরের মন চুরমার করে দিতে হবে।

তার আগে শরৎশশীকে ডেকে হুঁশিয়ার কোরে দিয়েছে রতনরানী। —সুনয়নীর জীবন নষ্ট করার কোনো অধিকার নেই শরৎশশীর। রতন-রানী বেঁচে থাকতে অতিস্নেহের অতি আদরের নাতনির দুর্গতি-দুর্ভোগ চোখে দেখতে পারবে না। সুমন সিংকে এখনো আটকে-আটকে রেখেছে। কতো দিন একটা পুরুষমানুষকে এভাবে আগলে রাখবে আর। শরৎশশীর খেয়াল-খুশি মাফিক সুনয়নী ইহকাল-পরকাল খোয়াক—এটা সহ্য কোরবে না কোনোমতেই রতনরানী। শরৎশশী যদি এখনো তার কথা না শোনে, তাহলে যা ব্যবস্থা করার রতনরানী নিজেই কোরে ফেলবে, নিজেই কোরে ফেলবে।

শরৎশশী মাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, জীবনভোর সমস্ত কথাই শুনে আসছে, শুনে এসেছে। আর শুনতে পারবে না কিছুতেই। আর ওদের দু'জনের···শ্যামকিশোর আর সুনয়নীর প্রগাঢ় ভালোবাসা, স্বয়ং ভগবান এলেও বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না। ওদের মন ভাঙানো শিবেরও অসাধ্য।

রতনরানী কটমট কোরে তাকিয়েছে শরৎশশীর দিকে। তারপর বিদ্রূপের হাসি হেসেছে ঠোঁট বেঁকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে। পান চিবোনোর মতন বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বোলেছে, ও, তাই নাকি! তোর এতো দেমাক। দেখা যাক্। আমার পেটের মেয়ে হোয়ে পুরুষের ভালোবাসায় এতো বিশ্বাস। ভগবান-শিবের ক্ষমতার বাইরে! মরি মরি! বলিহারি যাই মা, বলিহারি যাই।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার মুখে রামলালের সঙ্গে শরৎশশীর দ্যাখা। হাতে কচুরি-সিঙারার ঠোঙা।—একি চলে যাচ্ছিস যে তুই! কতোদিন আসিস নি এ বাড়িতে। তাড়াতাড়ি নিয়ে এলুম তোর জন্য। আর তুই—। তোর ভগুয়ার দোকান থেকেরে! ছোটবেলায় কতো খেতে ভালোবাসতিস বলতো!

না, রামলালদা! মায়ের যা ব্যবহার। এবাড়িতে আর জলস্পর্শ কোরবো না!

এটা জানবি আমার কামানো পয়সায়। তোর মায়ের পয়সায় আনি নি।

রামলালের ঠোঙা থেকে একটা কচুরি তুলে মুখে দিতে দিতে বোলেছে, জোড় হাত কোরছি রামলালদা! আর নয়। এবার যেতে দাও। মাকে জানো তো, দেখে ফেললে তোমার আর খোয়ারের শেষ থাকবে না।

রামলাল রতনরানীর পুরনো চাকর। শরৎশশীকে মানুষ কোরেছে নিজে হাতে বোললে, ভুল বলা হবে না। রামলালের স্নেহ ভোলবার নয়।

নিয়ে যা! তোর মেয়ের জন্য নিয়ে যা! আমার নয়নের জন্য নিয়ে যা। রামলালের চোখে জল।

ঠোঙা হাতে কোরে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে, গাড়িতে উঠে বসেছে শরৎশশী।

রাস্তার বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখেছে মা। কি চিৎকার। গলার স্বরে রাজ্যের রাগ ফেটে পড়ছে।—রামলাল! ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন মরতে!

বুক কেঁপে উঠেছে শরৎশশীর।

মা কি সত্যি সত্যিই সুনয়নীর অনিষ্ট করে বোসবে নাকি! যে রকম মেজাজ দেখছে! হাজার হোক মা তো! তার মুখের দিকে কি চাইবে না? তা কখনো হয়! তাকে স্রেফ ভয় দেখাচ্ছে। শ্যাম-কিশোরের কানে নিশ্চয় কোনো কথা পৌঁছুবে না।

সমস্ত ধারণা মিথ্যে হোয়ে গেলো শরৎশশীর।

সুনয়নী এসে কেঁদে পড়তে।

মা মন ভাঙিয়েছে, ঘর ভাঙিয়েছে। শ্যামকিশোরের মাথা বিগড়ে দিয়েছে একেবারে। এখন কি কোরবে শরৎশশী! সুনয়নীর কি হবে! কি উপায়। জীবন থাকতে রতনরানীর হাতে সঁপে দিতে

পারবে না ওকে। কিছুতেই না। কিছুতেই না। ভিক্ষে কোরে খেতে হোলেও না। দেশান্তরী হোতে হোলেও, না। সুনয়নীকে নিয়ে যেখানে দুচক্ষু যায়, চলে যাবে। ওই মায়ের মুখ যেন আর দেখতে না হয় কখনো। মা-ও যেন তাদের মা-মেয়ের মুখ না দেখতে পায় কোনো সময় কোনোদিন।

অভয় দিয়েছে শরৎশশীকে সুখেন্দু।

এতো ভেঙে পড়ার কি আছে! এক দরজা বন্ধ হোয়ে গেলে, ঈশ্বর আর এক দরজা খুলে ছ্যান। এতো ভাবছো কেন? একটা না একটা ব্যবস্থা হোয়ে যাবেই নিশ্চয়!
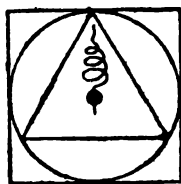
দেবদারু, পাইন-চীরের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছে এবার বৈষ্ণোদেবীর গুহামন্দিরের যাত্রীরা। শ্যামকিশোরের একই অবস্থা। হেরফের এতোটুকু নেই। অন্তত রঞ্জনার চোখে। রঞ্জনা মুখে কুলুপ এঁটেছে। বোলে যখন কোনো লাভ নেই, কোনো ফল হোলো না, তখন চুপচাপ থাকাই ভালো। মিথ্যে অশান্তি বাড়িয়ে আর কি হবে।

আচ্ছন্নের মতন চলছে শ্যামকিশোর।

ভৈরোঘাঁটির কাছে এসে পড়েছে সকলে।

সন্ন্যাসিনী নিজের ভাবেই বিভোর। এক মনে নামকীর্তন কোরতে কোরতে এগিয়ে চলেছে। পথের ক্লান্তির কোনো চিহ্নই ফুটে ওঠে নি গলার স্বরে। ঈশ্বরদত্ত গলা। ওর গলায় গলা মিলোচ্ছে ওর পাশের পেছনের অনেকেই। সন্ন্যাসিনীর স্বরের আকুতিতে হৃদয়ের ব্যাকুল প্রার্থনা বেরিয়ে এসেছে বাতাসে। পোঁছুচ্ছে কি বৈষ্ণোদেবীর কানে?

শোনা যায় বৈষ্ণোদেবী বাতাসে অদৃশ্য হোয়ে রোয়েছেন।

ভৈরবের মন্দিরে গেলো না কেউ। বৈষ্ণোদেবীর গুহাদর্শনের আগে ত্থাখা নিষেধ।

পাহাড়ের ওপারে এবার ঢালের পথে।

কেউ সিঁড়ি বেয়ে, কেউ ঘোড়ায় চেপে ওপাশের সড়ক দিয়ে নামছে ধীরে ধীরে। নামছে নামছে নামছে। নামছে সিঁড়ি বেয়ে সন্ন্যাসিনী। শ্যামকিশোর রঞ্জনা আর এদিকের মেয়ে-পুরুষরা।

এতো ক্ষণের হাঁটাহাঁটি পরিশ্রম সার্থক হোয়েছে এবার।

আনন্দে জয়ধ্বনি দিচ্ছে সকলে।—জয় মাতাজী, জয় মাতাজী।

গুহামন্দিরে প্রবেশের জন্য উদগ্রীব সকলে।

পাথুরে সিঁড়ির তিনটে ধাপ ভেঙে বেশ বড়সড় চত্বরে এসে হাজির পুণ্যার্থী দর্শনার্থীরা। চত্বর পেরিয়ে লোহার গেট। আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠে পাথরের বাঁধানো চত্বরে। আগে থেকে সার বেঁধে বোসে আছে অনেকে। পর পর প্রবেশের রীতি গুহামন্দিরে!

শ্বেতপাথরের তোরণের ডান পাশে পাথরের বাঘ। দেবীর বাহন। গুহার মুখে এসে দাঁড়াচ্ছে প্রত্যেকে। এক এক কোরে ভেতরে যাবার নিয়ম। আগে দাঁড় করিয়েছে শ্যামকিশোরকে রঞ্জনা। তার পেছনে নিজে। বারে বারে পেছন থেকে সামনে ঝুঁকে পড়ে, ঘাড়ের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে বলছে রঞ্জনা শ্যামকিশোরকে।—দেখো! যেন ভুল না হয়। যে জন্য আসা, মনে থাকে যেন। মানত করতে ভুলো না কিন্তু। ভুলো না।

কে বলছে কাকে? কি বলছে?

শ্যামকিশোরকে কি? দেখে তো মনে হয়, শ্যামকিশোরের কোনো কথাই কানে যাচ্ছে না। নিস্পৃহ-নির্বিকার। একটা কাঠের পুতুল যেন। ওকে ঠেলে ঠেলে রঞ্জনা নিয়ে এসেছে এত দূর, নিয়ে যাচ্ছে গুহার ভেতর, না ওর নিজেরই ভেতরের কোনো শক্তি, না কোনো অদৃশ্য শক্তি? দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই। তবে ঠিক সন্ন্যাসিনীর মতন না হলেও, অন্যদের চেয়ে ও যে একটু স্বতন্ত্র ধরনের হয়ে গেছে, হয়ে রয়েছে—এটা নজরে পড়ছে সকলের। মানুষ যেন কেমন কেমন।

সুনয়নীকে ছাড়বার পর থেকে এমন ?

তা হবে কেন ? ও তো বেশ বহাল তবিয়তে ছিল। ওর ধারণায়, যা করছে, ঠিকই করছে। তাড়িয়ে দিয়ে পাপ বিদেয় করছে। সত্য-ন্যায় পালন করছে। অনুতাপ-অনুশোচনা এলে কি ফিরিয়ে আনতে পারতো না ? নিশ্চয় পারতো। সে ধারে একদম যায় নি। সুনয়নী ম'লো, কি নিরুদ্দেশ হলো, কোনো খোঁজখবর রাখে নি। রাখবার প্রয়োজনও বোধ করে নি। বরং ভেবেছে, ওর পেটে তার বংশের ছেলে আসেনি এইটুকু রক্ষে। এলে, সে ছেলেরও শ্যামকিশোর মুখদর্শন করতো না। পরিচয় দিতে ঘেন্না। লেখা-পড়া জানা ভালো ছেলে শ্যামকিশোর। তবু রক্তমজ্জায় বংশমর্যাদার অহংকার। সেই সংস্কারেই গড়া মন। মনটা ওই গণ্ডী থেকে বেরিয়ে বাইরের মন ছাখে নি কখনো। এখানে চোখ থেকেও ও অন্ধ। মন থেকেও মন পাথর। সহানুভূতি-মমতার স্পর্শ পৌঁছয় না। অন্যের হৃদয়ের ব্যথা-বেদনার অনুভূতি থাকবে কেমন করে। ও কারো হৃদয় চেনে না। চিনতে চায় না। চেনে শুধু কুল-মান আর নিজের আত্মগরিমা।

কাটরায় বৈষ্ণোদেবী দর্শনে এসে সন্ন্যাসিনীর স্তোত্রগান শুনতে পেয়ে ও নিজেকে বারে বারে হারিয়ে ফেলেছে, ফেলেছে। সুনয়নীর মুখে এযে ওর নিত্য শোনা গান। ও নিজেও বুঝতে পারছে না, কেন এমন হচ্ছে ওর। কেন অস্থির-অস্থির করছে ভেতরটা। সুনয়নীকে সরাতে পারছে না মন থেকে। সরাতে চাইছে না ও। কতদিন আগের ব্যাপার। ডোবা স্মৃতি যে ভেসে উঠছে আবার। বড্ড বেশী জীবন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে যে।

সুনয়নীকে তাড়িয়ে দেবার পর শ্যামকিশোর আবার নতুন করে ঘর বেঁধেছে রঞ্জনাকে বিয়ে করে।

সুনয়নী কোন্ পথ ধরেছে ?

দিদিমা রতনরানীর কাছে কি আত্মসমর্পণ করেছে দিশেহারা-পথহারা নিরুপায় মানুষজনের মতন ?

না।

ধর্মবাবা সুখেন্দুই যোগাযোগ করে দিয়েছে 'আত্মগীতি সংঘ'-এর মহিলাদের সঙ্গে। এখানে সুকণ্ঠী সুনয়নীর স্থান পেতে কোন বেগ পেতে হয় নি। সম্ভ্রান্ত ঘরের কুলবধূদের সংঘ এটা। এদের মর্যাদা দারুণ। সমাজের উঁচুমহল থেকে এসেছে এরা। উঁচুমহলেই স্বামী-সংসার। আর উঁচুমহলেই এদের সঙ্গীত পরিবেশন।

বড় বড় ঘরে বড় অনুষ্ঠানে এদের আমন্ত্রণ। সম্মানের সঙ্গে নিয়ে যায় সভ্যভদ্র লোকেরা। আবার উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েই বাড়ি পৌঁছে দ্যায়।

শরৎশশী খুব খুশি।

সংঘ সুনয়নীকে মূল গায়েন করেছে। অন্যেরা দোহার দ্যায়। আজ কত বড় সম্মান সুনয়নীর। আনন্দে দুচোখের জল গড়িয়ে পড়েছে গাল বেয়ে। সুখেন্দুর দু'হাত ধরে বলেছে শরৎশশী।—তুমি যা করেছ আমাদের জন্য, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করতে চাই না, আজ আমার মরণেও শান্তি। প্রাণে বাঁচিয়েছ সুনয়নীকে। মেয়েটার মুখের দিকে চাইতে পারা যেত না। সর্বনেশে আঘাত পেয়েছে ও শ্যামকিশোরের কাছ থেকে। আমার খুব ভয় ধরেছিলো, যে রকম গুম হয়ে বোসে থাকতো, আত্মঘাতী না হয় শেষে। আজ ওর মুখে হাসি ফুটেছে। আগের নয়ন আমার ফিরে এসেছে আমার। ও সুখী আমি সুখি তুমি সুখি।

শরৎশশী সুখি সুখেন্দু সুখি। কিন্তু সুনয়নী কি সত্যিসত্যিই মনেপ্রাণে সুখি?

সম্পূর্ণ সুখি নয় অন্য কারণে।

গীতিসংঘের জগৎটা আজব দুনিয়া।

যারা চালায়, যারা প্রধান, তাদের ভেতরে যন্ত্রণার পাহাড়। ভেতরের ব্যথা অন্তত কিছুক্ষণের জন্য তো চাপা থাকবে। কিছুক্ষণের জন্য তো থাকবে। কিছুক্ষণের জন্য তো সমস্ত কিছু ভুলে থাকা যাবে। নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে, বাঁচার তাগিদে, সমব্যথার ব্যথীরা মিলে প্রতিষ্ঠা কোরেছে 'আত্মগীতি সংঘ'।

কান্না চেপে মুখে হাসি টেনে এনে ভজন শুরু করে এরা। তারপর গাইতে গাইতে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে নিজেকে ভুলে, সব ভুলে। এদের গলার সুরে কিন্তু সুনয়নী কান্নাই শোনে কেবল। ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। দুঃখকাতর সুনয়নী ভাবে বাড়ি ফিরে একা বোসে বোসে, মানুষ কি হৃদয় ভালোবাসা সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে দিয়েছে নির্দয় মনের কাছে? কেউ কি কাউকে বুঝবে, না বুঝতে চেষ্টা করবে না কখনো! আঘাত দেয়াটাই কি বড় কথা হয়ে দাঁড়ালো জগতে। প্রতিকার নেই কোন? প্রতিকারের উপায় বাতলে দেবার লোকই বা কোই! কোথায়!

বিন্নুমাসির কি অশান্তি!

সংসারে গরুর খাটুনি খেটেও নাম নেই। থাকুক না থাকুক, তাতে দুঃখ নেই। দুঃখ কেবল ছেলে-বৌ মোটে সহ্য করতে পারে না তাকে। ভালো কথা বোলতে গেলে বিপদ। কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে আসবে মাণিকজোড়ে একসঙ্গে। প্রতিবাদের জো নেই। করলেই, অমনি গায়ে হাত। চড়-থাপ্পড়, লজ্জার কথা! সকলের কাছে সব প্রকাশ করা যায় না। সম্ভ্রান্ত ঘরের একটা মান-সম্মান আছে তো।

মোহনকাকির এসমস্ত বালাই নেই। তবে নিঃসন্তান বলে বড্ড মনঃকষ্টে দিন কাটায়। পাথরের কেষ্টকে নিয়েই কাটায়। ছেলের আদরে সাজায় গোজায়। ক্ষীর-ননী ভোগ ছ্যায় আর বলে, তুমি কি সত্যিকারের ছেলে হোয়ে আসতে পারো না? পাথরের ঠাকুর বলে কি মনও পাথরের। ঠাকুরকে বুকে চেপে আদর করে লোকের কাছে বলে, কেষ্টর বুকের ধুকধুক আওয়াজ নাকি ওর বুকে বাজে। স্পষ্ট শুনতে পায় কাকি। অনেকে বলে, কাকির মাথাটা নাকি খারাপ হোয়ে গেছে ছেলে ছেলে করে।

নিরুদিদিমা কতো সুন্দর!

চেয়েছিলো তো স্বামীসোহাগিনী হতে, হল? হয় নি।

ধারেকাছে আসতে ছ্যায় না স্বামী। আজো না। স্বামীর মাকে

নাকি কোনদিন মুখ ফসকে বোলে ফেলে ছিল, যদি আমাকে ওঁর খাওয়া দাওয়ার সময় থাকতে না দেবেন, খেতে দিতে না দেবেন, তাহলে বিয়ে দিয়েছিলেন কেন? ছেলেকে আইবুড়ো করে রাখলে ভাল করতেন। কই! আমার মা তো বৌদিদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে না কোনোদিন। দেখে আসতে পারেন গিয়ে, যদি বিশ্বাস না হয়।

নিরুদিদিমার শাশুড়ি আর যায় কোথা!

ছেলের কাছে গিয়ে কেঁদে আছড়ে পড়ল। এ বাড়িতে আর থাকবে না। এখুনি চলে যাবে। যেখানে দুচোখ যায়। তার ছেলে তার নয়, বৌ থাকতে এ বাড়ির ত্রিসীমানায় আসছে না আর। আর নয়, আর নয়।

পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়েছে নিরুদিদিমা শ্বাশুড়ির। ক্ষমা চেয়েছে স্বামীর কাছে। ক্ষমা মেলেনি। স্বামী নিজে গাড়ি করে বাপের বাড়ি তুলে দিয়ে গেছে। তারপর আজ অবধি নিয়ে যাওয়া আর হল না তার। শাশুড়ি মারা যাবার পরও না। ওই বৌয়ের বাক্যবাণে আঘাত পেয়েই তো মা মারা গেল। ওর নাম গন্ধ আবার মুখে আনে কোন মানুষ?

বিচিত্র জগতে বিচিত্র মন মানুষের।

এখানে সম্ভ্রান্ত আর অসম্ভ্রান্ত – দাঁড়িপাল্লার নিক্তির ওজনে সমান সমান। তফাৎ কোনো পায় না খুঁজে সুনয়নী। এ আবহাওয়ায় হাঁফিয়ে ওঠে।

নিরুমাসির গুরুদেব যখন পাঞ্জাব থেকে আসেন, তখন সঙ্গীত সংঘে এসে রোজ সন্ধ্যেয় ভজন শোনেন। অভয়ানন্দ অভয় দ্যান সবাইকে। শান্তির বাণী শোনান। পুরাণ রামায়ণ মহাভারত আর উপনিষদ থেকে ছোটো গল্প বলে, কত উদাহরণ দিয়ে সান্ত্বনা পাবার পথ দেখিয়ে দ্যান।

অভয়ানন্দকে ভাল লাগে সুনয়নীর।

সুনয়নীর গান শুনতে খুব ভালবাসেন। সুনয়নীকেই বেশী করে

গাইতে বলেন। একটু ফাঁকা হোলেই জিজ্ঞেস করেন, বেটি! তুই বিমর্ষ বিমর্ষ কেন রে?

না গুরুদেব! ও এমনি।

একদিন অভয়ানন্দ জোর দিয়ে বলেছেন, আজ তোকে বলতেই হবে। তুই বড্ড অস্থির হয়ে পড়িস দেখি। মাঝে মাঝে আনমনা।

একটু চুপ কোরে থেকে, মাথা নিচু করে শান্তগলায় বোলেছে সুনয়নী, শান্তি পাচ্ছি না কারো কাছে, কোথাও! প্রকৃত শান্তি কি হারিয়ে গেছে? মুখ তুলে তাকিয়েছে সুনয়নী।

অভয়ানন্দ বড় বড় চোখ কোরে দেখলেন সুনয়নীকে। বললেন, শান্তি কোথাও—বাইরে নেই। আছে নিজের মনে। নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বললেন, বুঝলি? নিজেকে সংযত করতে হবে, শান্তি।

—কেমন করে, কি উপায়ে?

—উপায় তোর নিজের মধ্যেই আছে বেটি! তোর গলা তোর সুর।

আশ্চর্য হোয়ে জিজ্ঞেস করেছে সুনয়নী, গলা সুর তো অনেকেরই আছে। তবুও শান্তি কোথায়?

—কাজে লাগাতে হবে বেটি, কাজে লাগাতে হবে। মহাপুরুষের ভজনে মানুষ নিজেকে দেখতে পায়। চিনতে পারে নিজেকে। সংযত হবার উপায় খুঁজে পায়। শান্তি পাবার শান্তি দেবার পথ ছাখা যায় পরিষ্কার। ওঁদের গানের বাণী এক একটা মন্ত্র। মানুষের চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। জাগিয়ে রাখে। গানের মধ্যে দিয়েই তো নানক কবীর তুলসীদাস মীরা চৈতন্যদেব রামপ্রসাদ অনেকেই মানুষের মনে শান্তি দিয়ে গেলেন। এঁদের পর, তোর পথ।

অভয়ানন্দর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করে বলেছে সুনয়নী, আশীর্বাদ করুন!

গুহায় প্রবেশ করেছে শ্যামকিশোর

সামনেই উঁচুপাথর। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে উঠে ভেতরে গেছে। পেছনে রঞ্জনা। আবার পাথরের দেয়াল। ওপর দিকে একটা খোলা জানলার মত। তার মধ্যে দিয়েই ওপারে নামছে সবাই এক এক করে।

নামার পর জলে পা পড়েছে সবার। এঁকে বেঁকে গা বাঁচিয়ে কনকনে পাহাড়ের গায়ে হাতের ভর রেখে এগোচ্ছে ওরা। পায়ের তলা দিয়ে যাচ্ছে। পাথরের তিনটে ধাপ পেরিয়ে বৈষ্ণোদেবীর গর্ভগৃহ। প্রদীপ জ্বলছে। মূর্তি নেই; আছে শিলাখণ্ডে লাল কাপড় জড়ানো। ফুলে ফুলে ঢাকা। তিনটে শিলাখণ্ড। মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী। লয়, স্থিতি, সৃষ্টি। জগতের তিন অবস্থার শক্তি।

পূজারীরা পুজো করছে। দেবীমন্ত্র উচ্চারণে অর্ঘ দিচ্ছে।

শ্যামকিশোরের কানে কানে ফিস ফিস করে রঞ্জনা বলেছে, প্রার্থনা কর! প্রার্থনা কর! একটি সুপুত্র দাও মা। তোমায় ষোড়শোপচারে পুজো দোবো! বল, বল। এত কষ্ট করে আসা সার্থক হোক।

একি শুনছে রঞ্জনা।

নিজের কানেও বিশ্বাস হচ্ছে না যে!

একি শ্যামকিশোরের কণ্ঠস্বর, না অন্য কার?

শ্যামকিশোর সন্ন্যাসিনীর স্তোত্রগান করছে চোখবুজে, হাতজোড় করে।

জগদ্ধাত্রী ত্বম্ রক্ষাকর্ত্রী ত্বম্,
পরিত্রাত্রী ত্বম্ মুক্তিদাত্রী ত্বম্।
ব্রহ্মা ব্রহ্মাণী ত্বম্ শিব শিবানী,
বিষ্ণু বৈষ্ণব ত্বম্ মম জননী।
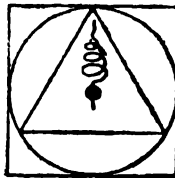
যেমনভাবে চড়াইয়ে উঠে উতরাইয়ে নেমে বৈষ্ণোদেবীর গুহামন্দিরে গেছে দর্শনার্থী তীর্থযাত্রীরা, ঠিক তেমনি সেই পথ দিয়েই ফিরছে সকলে।

যেটা ছিল উত্তরাই, সেটা এখন চড়াই। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঠছে কতক। কতক ওদিকের ওদিকের সড়ক ধরে ঘোড়ায় চেপে ঘুরে ঘুরে। চতুর্দিকে পাহাড়ের বুক থেকে 'জয় মাতাজি, জয় মাতাজি' ধ্বনি উঠছে। উঠছে প্রতিধ্বনি। প্রত্যেকের হাতে এক এক রঙের নিশান। লাল নীল সবুজ হলুদ···। গলায় পূজারীর পরানো দেবীর আশীর্বাদী লালসুতোর মালা। অনেকের হাতের মুঠোয় দেবীর প্রসাদ ফুল-মেওয়া। তার সঙ্গে খুচরো পয়সা দু'চারটে। দেবীর খাজনা। এখানকার নিয়মে দেবীকে দেয়া হোক না হোক, দেবী কিন্তু ছ্যান। ছ্যান প্রসাদের সঙ্গে পূজারীর মধ্যে দিয়ে।

পাথুরে পথ মাড়িয়ে মাড়িয়ে সকলে এসে পৌঁছুচ্ছে ভৈঁরো ঘাটিতে। ভৈরবের মন্দিরে। ভৈঁরোর ছিন্নমুণ্ড এখানে এসে পড়েছে। বধের পর। দেবীর ওপর আকৃষ্ট হয়ে ভৈঁরো দেবীকে অনুসরণ করেছে। যুদ্ধ করেছে। শেষে মৃত্যুর সময় নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। স্বীকার কোরেছে অপরাধ। ক্ষমা চেয়েছে।

করুণাময়ী করুণা করেছেন। বোলেছেন, এবার তুমি আর নরক-রাজ্যের মানুষ নও। তুমি দেবতা—ভৈরব। আমায় দর্শন করার পর তোমায় দর্শন করে গেলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে মানুষের!

ভৈরব দর্শনের পর সন্ন্যাসিনী আবার দেবীস্তোত্র শুরু করেছে। ওর সঙ্গীরাও গাইছে মৃদু গলায়। সকলকে প্রসাদ বিতরণ করেছে সন্ন্যাসিনী কাঁধে ঝোলানো ঝোলায় হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে। মুখে নাম, হাতে কাজ।

লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ছে সন্ন্যাসিনীর হাত থেকে প্রসাদ নেবার জন্য। সন্ন্যাসিনী নাকি এখানে মাঝে মাঝে আসে। দর্শন করে কোথায় চলে যায় কেউ জানে না আজ অবধি।

—কে এ সন্ন্যাসিনী?

একজন পুরোনো যাত্রীকে প্রশ্ন করেছে রঞ্জনা।

—জানি না কে। তবে শুনেছে, সন্ন্যাসিনী সুনয়নী বোলেই জানে ওঁকে অনেক।

সুনয়নী কথাটা কানে যেতেই শ্যামকিশোরের সারা শরীরে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বোয়ে গেছে। সেই সুনয়নী কি ? না, না। তার মনে হচ্ছে, এ সুনয়নী নয়। এ সাক্ষাৎ বৈষ্ণোদেবী।

সন্ন্যাসিনীর কাছে গিয়ে হাত পেতে প্রসাদ চেয়ে নিতে অনুরোধ করেছে রঞ্জনা। লোকে বলছে, মনস্কামনা পূর্ণ হয়। যাও, যাও না!

যেতে চেষ্টা কোরেও যেতে পারছে না শ্যামকিশোর। মনে মনে প্রার্থনা করেছে।—ভৈঁরোর মুক্তি হোলো। আমার কি মুক্তি নেই। আমার কি ক্ষমা নেই! মুক্তি দাও, ক্ষমা কর।

সন্ন্যাসিনী-সুনয়নী নিজেই এগিয়ে এসেছে শ্যামকিশোরের কাছে। হাসতে-হাসতে ঝোলা থেকে মেওয়া প্রসাদ বার করে, জোড়হাত ফাঁক করে গুঁজে দিয়েছে। মাথায় হাত রেখে বলেছে, শান্তি শান্তি শান্তি। সরে এসে, চলার পথ ধরেছে সন্ন্যাসিনী সুনয়নী। বাতাসে 'জয় মাতাজি' ধ্বনি উঠছে।

শ্যামকিশোর দেখছে একদৃষ্টে, চোখের জল উপচে পড়ছে।

স্বপ্নমায়ার বাঁয়ে মৈথিলী।

মাটির তলায় গুহাঘরে হিম হিম বাতাসে দুলে ওঠা মৃদু মোমের আলোয় সেদিন যে বিভীষিকা দেখেছিল মৈথিলী, তখন কি মন থেকে মুছে দিতে পেরেছিল?

সেদিন সে কোন্ ভয়ঙ্করের মুখোমুখি হয়েছিল? সেই মানুষকে এত ভীষণ মনে হয়েছে কেন?

হতভম্ব হতবাক নিস্তব্ধ পাথর মৈথিলী।

নিজের অস্তিত্বের অনুভূতিটা পর্যন্ত চলে যেতে বসেছে। কেবল যাচ্ছে না একটা জিনিস। বুকের গুরগুরুনি, আর কাঁপুনি। যা দেখছে আর যা শুনছে, তাতে যে কোন সুস্থ-সবল মনের মানুষেরই হবার কথা। যাদের দেখার দৃষ্টি নেই শোনার কান নেই বোঝার মন নেই, তারা স্বতন্ত্র। মৈথিলী কিন্তু স্বতন্ত্রদের দলে কোনোমতেই পড়ে না।

রক্ত মাংসে গড়া শরীরে এমন ভয়ঙ্কর রূপ দেখে নি কখনো। মোমের আলোয় যেটুকু যেটুকু নজরে পড়েছে, দেখছে কি, [illegible] দুচোখ বুজে ফেলেছে। নিজে ইচ্ছে করে নয়, চোখের পাতা অসম্ভব রকমের ভারী হয়ে উঠে আপনা হতেই নেমে পড়েছে। বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষটা মানুষ, না দানব—কে জানে। কি বীভৎস!

মাটির তলায় গুহাঘরে ঠাণ্ডা কনকনে মৃদুবাতাসে মোমের আলো অল্প-অল্প দুলছে। ভয়ঙ্করের সিঁদুর মাখা লালভুরু থেকে আগুনের শিখা যেন বেরিয়ে আসছে লকলক করে। চোখের ভয় ধরানো তারা দুটো অস্বাভাবিক ভাবে ঘুরে উঠছে থেকে থেকে। মুখের ডানপাশ লাল, বাঁপাশ সাদা। মধ্যিখানে কুচকুচে কালো। তিন রঙের মুখের মানুষটাকে শরীর থাকতেও অশরীরী করে তুলছে বুঝি।

মোমের আলোটুকু আছে বলে তাই রক্ষে। তা নাহলে সকলের

পরিণাম কি যে হত—এক বিধাতাই বলতে পারে। পাতালের প্রলয় অন্ধকার নেমে আসত পাতালপুরীতে। শরীরের অশরীরীর বীভৎস নাচে সকলের ভয়ের চোখে শত সহস্র অশরীরী প্রাণহরণ নৃত্যে মেতে উঠতো সামনে-পেছনে চতুর্দিকে। বুকের রক্ত হিম হয়ে আসতে আসতে জমাট বেঁধে যেত একসময়। ধুকপুকুনিটা থেমে যেত হঠাৎ সবার।

কঠোর নিষ্ঠুর ধাতুর গড়নে গড়া এই লোকের চেহারা। মনও। মনের মতো সাজগোজ তাই। কঙ্কালের মাথার মুকুট মাথায়। গলায় হাড়ের মালা আর সাপের মালা। জ্যান্ত সাপ। জিভ বার করছে মাঝে মাঝে। ঢোঁড়া না বিষে ভরা—ওই লোকই জানে। চক্রধর।

চক্রধরের দু'হাত লাল টকটকে। যেন তাজা রক্ত মেখেছে সবে। ডান হাতে একখানা বড় ছোরা। ছোরার বাঁট পেতলের। বাঁটের মাথায় তিন তিনটে মুখ। কি ভীষণ। ছোরার ফলা তিনকোণা। ছোরা হাতে নাচতে নাচতে প্রদক্ষিণ করছে চক্রধর একটি যুবককে। যুবকটি ওকে দেখে মূর্চ্ছা গেছে, না মৃত—কিস্সু বোঝা যাচ্ছে না।

একজন দশাসই লোক নাচের তালে তালে জয়ঢাকে বোল তুলছে সরু কাঠের মুগুরে। ওপাশে জ্বলন্ত কয়লা ছড়ানো গনগনে আগুন। আগুনের ওপর দিয়েও এক-একবার নেচে নেচে ঘুরপাক খেয়ে আসছে উন্মত্ত উল্লাসে। কখনও কখনও শোয়া যুবকের দেহে ছোরাটা বিঁধিয়ে দিচ্ছে। যুবকের কোন সাড় নেই। কিন্তু আশ্চর্য, তার শরীরের কোনো অঙ্গ থেকে এক বিন্দু রক্ত ঝরে পড়ছে না একবারও। থেকে থেকে চড়া খাদে এক অদ্ভুত সুরে মন্ত্র উচ্চারণ করছে চক্রধর। ওম্ লং বং রং, ওম্ যং হং ক্ষং···।

কাশ্মীরে বেড়াতে এসে, শ্রীনগরের এক বাসিন্দা শিরণ কাউলের মুখে চক্রধরের মহিমা কীর্তন শুনেছে মৈথিলীরা। অসাধ্য সব সাধন করে নাকি বৌদ্ধদের বজ্রযান সম্প্রদায়ের এই সজ্জন। এর ক্রিয়াকলাপ ডাকলে কথা কয়। কতলোকের কত উপকার হয়েছে। শিরণ কাউলের স্বচক্ষে দেখা। আর সেসব লোককে তো নিয়ে গেছল তক্ষশীলায় চক্রধরের কাছে শিরণ কাউল নিজেই।

মৈথিলীর শ্বশুর শাশুড়ির প্রবল ইচ্ছে চক্রধরের সঙ্গে দেখা করার। দেওর ঠিক রাজি না হলেও, নিমরাজি। আর স্বামী—নৃপশ্যাম? নৃপশ্যাম একেবারেই নারাজ যেতে। মিছিমিছি টাকার শ্রাদ্ধ কেবল।

চক্রধরকে না দেখুক, তক্ষশীলার জাদুঘর না দেখলে কিন্তু একটা ইতিহাস, বৌদ্ধযুগের অবিস্মরণীয় কীর্তিকলাপ দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে হবে, এটা নিশ্চিত। ওটা রাজা শালিবাহনেরও দেশ। শকাব্দ চালু করে শালিবাহনই। পাণিনি আর চাণক্যের জন্মভূমি। এখানেই ঋষি জ্ঞানী গুণীর বিদ্যাচর্চা আর গবেষণার পীঠস্থান ছিল এক সময়। বুদ্ধমন্দির মঠ আর স্তূপের ছড়াছড়ি চতুর্দিকে। ছ মাইল অবধি ছড়ানো। সোনা রুপো তামা লোহা পাথর মাটির কত না মূর্তি, কতরকমের জিনিসপত্তর। দেখলে অবাক হয়ে যেতে হবে—কি স্বর্ণ যুগই না ছিল সে যুগ। অতীতের সেই সব প্রমাণ সেই সব সাক্ষী এখনো বর্তমান।

চারশো খ্রীস্টাব্দে চীনের বৌদ্ধপরিব্রাজক ফা-হিয়ান এসে তক্ষশীলাকে পবিত্রনগরী বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। ছশো তিরিশ খ্রীস্টাব্দে হিউ-য়েন-সাঙও একই কথা বলেছে, একবার নয় বহুবার। ছশো তেতাল্লিশে এসেও এই নগরীর পঞ্চমুখে সুখ্যাতি করেছে। মারগলা পাহাড়ের ওপাশে এখনো দুর্গ আর বড় বড় প্রাসাদের ভাঙাচোরা কত কত না বড় ছোট ইঁট-পাথরের নমুনা চোখে পড়ে।

এসব শুনে কার না দেখতে ইচ্ছে করে। সব সময় সব জিনিস দেখা ভাগ্যে ঘটে না। শিরণ কাউলের মতো এমন সদাশয় সঙ্গী পাওয়া গেছে যখন, এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয় একদম। আহাম্মুকের মতো নৃপশ্যামকে ধরে করে পস্তেছে মৈথিলী। যেতেই হবে। অনুরোধে অভিমানের সুর। ছলছলে চোখে টলটলে জলের কণা।

পেছন ফিরে গোমড়া মুখে বসেছিল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছে নৃপশ্যাম। মাথা নেড়েছে। সম্মতি জানিয়েছে যাবে। একা নয়, সবাইকেই নিয়ে যাবে।

আনন্দে ডগমগ হয়ে মৈথিলী এক রকম ছুটেই বেরিয়ে গেছে ঘর

থেকে। শাশুড়িকে জানাতে হবে এখুনি এই আনন্দবার্তা। দরজা দরজা থেকে ডাইনে বাঁক নিতে গিয়েই ধাক্কা খেল একটা। শাশুড়ি দাঁড়িয়ে। শাশুড়ি একগাল হেসে হাত বুলিয়ে দিয়েছে মৈথিলীর বুকে। পাছে ছেলে শুনতে পায়, ফিসফিস করে বলেছে, লাগে নি তো বৌমা?

আপনার? মুখে হাত চাপা দিয়ে টেনে নেয়ে গেছে শাশুড়ি।

চুপি চুপি শুনতে এসেছে শাশুড়ি ছেলের রায়। বৌয়ের কৃতিত্ব আছে বটে। এক রোখার ধনুকভাঙা পণ ভেঙেছে। আনন্দে বৌকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়েছে। মেয়ের আশা পূর্ণ হয়েছে আমার তোমাকে ঘরে এনে। তুমি শুধু বৌ নও, একটা মেয়েও আমার।

তক্ষশীলায় এসে দেখার জিনিস সবই টাঙায় করে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে শিরণ কাউল। চীরটোপে পাহাড়ের ওপর স্তূপ। পর পর চারটি বুদ্ধমূর্তি। ছোট থেকে বড়, তার বড় তার বড়। চতুর্থটির শুধু দুটি পা। রাস্তায় দুধারে মন্দির মঠ মূর্তি। শিরকপে সিধে রাস্তা চলে গেছে কুণালস্তূপ পর্যন্ত। তোরণদ্বারের পুবদিক থেকে। রাজা অশোক নাকি এ স্তূপ করেছে ছেলে কুণালের স্মৃতির উদ্দেশে।

শুনেছে পুরাণ কাহিনী।

গন্ধর্বদের রাজ্য তক্ষশীলা জয় করে রামচন্দ্রের ভাই ভরতের আদেশে ভরতপুত্র তক্ষ। তক্ষের নামে তক্ষশীলা।

ইতিহাস বলেছে, তক্ষ তুরানী রাজা। এই বংশেরই শালিবাহন হয়তো। তুরানীদের রাজত্ব ছিল বলেই তক্ষশীলা নাম।

যেখান থেকেই নাম আসুক না কেন, তক্ষশীলা তক্ষশীলাই। এক সময়ের রাজধানী তক্ষশীলা। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশীলা। শতছিন্ন মৃত। তবুও কত প্রাণ কত সুন্দর দেহ, কত জীবন্ত। দেখতে দেখতে মনে হয় এক সময় স্বর্গ নেমে এসেছিল এই মাটির বুকে।

শ্বশুর-শাশুড়ি-দেওর খুশি। নৃপশ্যাম মহাখুশি।

কপালের মাঝে একটা ছোট্ট ভাসা ভাসা রেখায় বিরক্তির ভাঁজ ফুটে উঠেছে স্পষ্ট নৃপশ্যামের। কাশ্মীরের শেষ সীমানায়—কোহালায় আসার পর। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রবেশের আগের কর্ম-কাণ্ড। ওদিকের ব্রিটিশ সরকারের লোক, আর এদিকের কাশ্মীর সরকারের লোকেরা—দুপক্ষ মিলে তল্লাশি চলল কিছুক্ষণ। সেই সময়টা নৃপশ্যামের ভালো লাগে নি মোটে। সকলের ভয় ধরেছিল ফিরে যেতে না চায় শেষে। মৈথিলীরও মুখ শুকিয়ে গেছে। বুক ধড়াস-ধড়াস করেছে যতক্ষণ না ছাড়পত্র পেয়েছে ঝিলামনদীর পুলের ওপর দিয়ে বাস যাবার।

দেখেশুনে নৃপশ্যাম নিজেই বলেছে মৈথিলীকে, তুমি না জোর করলে কি জিনিস যে হারাতুম, সে আর বলার কথা নয়।

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে শুধু মৈথিলী। গলার স্বর বুজে এসেছে। কিছু বলতে পারে নি উত্তরে। পদ্মচোখের পাপড়িপাতা ভিজে উঠেছে আনন্দের ঝরনা ধারায়। চোখের ভাষা ঠিক বুঝতে পেরেছে কিনা নৃপশ্যাম, মৈথিলী বলতে পারবে না। তবে চোখ কি বলেছে, মৈথিলীর মন শুনেছে। বলেছে, তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ, তোমার তৃপ্তিতেই আমার তৃপ্তি। তোমার শান্তিতেই আমার শান্তি। আমি তোমারি, তুমি আমারি।

চেয়ে থাকতে থাকতে মৈথিলী আনমনা হয়ে পড়েছে। আনন্দের আকাশে বিষাদের মেঘ তেড়ে আসছে কেন? জোর করে দীর্ঘনিশ্বাস চাপতে গিয়ে বুকের বাঁদিকটা কনকন করে উঠেছে। মুখ নিচু করে তাড়াতাড়ি সরে গেছে নৃপশ্যামের কাছ থেকে—নৃপশ্যাম কিছু বুঝে ওঠার আগেই।

শাশুড়ির পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে মন ঘোরাবার জন্য। শিরণ কাউল নাছোড়বান্দা হয়ে উঠল চক্রধরের ডেরায়—পাতালগুহায় নিয়ে যেতে। ভয় ছিল নৃপশ্যামকে নিয়ে। ও

কিন্তু এক কথায় রাজী। না জানে ওখানে কি নতুনত্ব দেখবে আবার। এসেছেই যখন, যা দেখার সব দেখে যাওয়াই ভালো। কোনো কিছুর ছুট হওয়া উচিত নয়। পরে আবার আপসোস না হয়।

হ্যাঁ, চক্রধরের পাতালগুহা না দেখলে দেখার সূচি থেকে একটা অজানা দুনিয়ার একটা বিচিত্র ধরনের অজ্ঞাত বস্তুর গুপ্ত ক্রিয়াকলাপ দেখা যে বাদ পড়ে যেত—এটা ঠিক।

ঠিক হলেও, সুন্দর জিনিস দেখার পর অসুন্দর নিয়ে নাড়াচাড়া করতে কার আর মন চায়। মনের পরদায় ছবি এঁকে রাখা সাধনা যার। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছে নৃপশ্যাম। শাশুড়ি দেওর একদম চুপচাপ। একদৃষ্টে দেখছে সমস্ত। শিরণ কাউল খুব আস্তে আস্তে যাতে কানে না যায় কারো—শাশুড়ি দেওরকে ক্রিয়া-কলাপের অর্থ বোঝাচ্ছে।

এসব তিব্বতী লামার কাছ থেকে অনেক সাধ্যি-সাধনায় পাওয়া। বজ্রকীল সাধনা। বজ্রকীল যত অশুভ সমস্ত নষ্ট করে দেয় ছোরার ফলার পরশে। শোয়া লোকটা কিন্তু মরা নয় মোটে। অসুস্থ মনের বেহুঁশ মানুষ। চক্রধরই ওকে বেহুঁশ করে রেখেছে সুস্থ করবার জন্য। মন্ত্রপূত ছোরাটা, যেটা ওর গায়ে স্পর্শ করাচ্ছে, ওটা ধারালো নয়। খয়ের কাঠের তৈরি। বেদীতে যেটা রয়েছে, ওর লোহার ফলা। পুজো হয়। বজ্রকীল দেবতা।

কোনো অশুভশক্তি ভর করলে যদি অনিষ্টের পর অনিষ্ট হতে থাকে কারোর বা কোনো সংসারের, তাহলে চক্রধরের বজ্রকীল মোক্ষম অস্ত্র। ছোঁয়ালেই সব দোষ কেটে যাবে। অশুভশক্তি এক তিল দেরি না করে ছেড়ে পালাতে পথ খুঁজে পাবে না। সমস্ত শান্তি। আপদের শান্তি বিপদের শান্তি। পরম শান্তি। শাশুড়ির ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা। শিরণ কাউলের কানের কাছে মুখ এনে কি যেন বোলেছে। হেসেছে শিরণ কাউল মৈথিলীর দিকে তাকিয়ে। ভরসা দেয়ার হাসি। কি ব্যাপার ঘটবে, কি ঘটতে যাচ্ছে, আঁচ করতে অসুবিধে হয় নি মৈথিলীর। চক্রধরকে দিয়ে সংসারের আর বড়

বৌয়ের অমঙ্গল খণ্ডাতে চায়।

মৈথিলীর মন কিন্তু চাইছে না আর এখানে থাকতে। বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচে পাতালগুহা থেকে। বারে বারে তাকাচ্ছে নৃপশ্যামের দিকে। চোখ পড়লে উঠে পড়তে জানাবে ইশারায়।

চক্রধরের মুখ থেকে বিকৃতস্বরে একটা অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে আসতেই চমকে উঠেছে সকলে। দৃষ্টি আটকে পড়েছে শোয়া মানুষের ওপর। ঘৃতকুমারীর শাঁসের মতো কি একটা জিনিস ওর দুপায়ের তলায় ভালো করে মাখিয়ে দিচ্ছে চক্রধর। মানুষটা চোখ খুলল আস্তে আস্তে। চক্রধরের হাতের ইঙ্গিতে উঠে বসেছে। এবার দাঁড়াল। ওর ডানহাতে পাশে রাখা খয়ের কাঠের বড় ছোরা—বজ্রকীলের পুজো করা ফুল তুলে দিয়েছে চক্রধর। উঁচুস্বরে ধমকের সুরে ফুলটা মুঠোয় পুরে রাখতে বলেছে।

এধারের জ্বলন্ত কয়লার আগুনের ওপর পুরু করে ছাই ছড়িয়ে দিয়ে ওই মানুষকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হেঁটে চলে যেতে বলেছে ছাইয়ের ওপর দিয়ে—এদিক থেকে ওদিকে। ছাইচাপা আগুনের বাইরে।

নির্দ্বিধায় আদেশ পালন করেছে লোকটি।
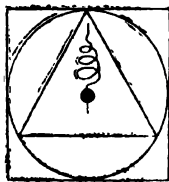
মাটির তলায় বিরাট গুহাঘরটা আশ্চর্যজগৎ হয়ে উঠেছে সকলের কাছে। আর সেই আশ্চর্য-জগতের আশ্চর্য মানুষ হয়ে উঠেছে উপস্থিত সবাই। বড় বড় চোখ করে অপলকে দেখছে ওরা। দেখার সাধ বুঝি মিটেও মিটতে চায় না কারো। দেখছে তো দেখছেই।

লোকটির পায়ের তলা দেখাচ্ছে চক্রধর। পরিষ্কার চামড়ার রঙে রঙ। এতটুকু পরিবর্তন হয় নি। তাপ লাগে নি, হয়ে ওঠে নি ফালচে। ফোস্কা পড়ার তো কথাই ওঠে না।

বিচ্ছিরি ধরনের যন্ত্রের মানুষের গলার আওয়াজে জোরে হেসে উঠেছে গুহাঘরের পাথরের দেয়ালে কাঁপন ধরিয়ে। বলেছে চক্রধর, এ সম্পূর্ণ স্বস্থ হয়ে গেছে বজ্রকীলের কৃপায়। অপদেবতা ভূতপ্রেত ডাইনির প্রভাব জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে মরে গেছে সব। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বজ্রকীলের মারণক্রিয়ায়।

দর্শকদের দিকে কটমট করে তাকাল একবার। পুজোর লোহার বজ্রকীলের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। বিড়বিড় করে কি সব না জানা ভাষায় কি সব উচ্চারণ করছে। কিছুক্ষণ। এবারে বেদীর দুধারের মোমের আলোয় চোখ ঘোরাফেরা করছে। বেশিক্ষণ নয়। আচমকা বাঘের হুঙ্কার দিয়ে একখানা চেলাকাঠ হাতে নিয়ে আগুনের ধারে এসে দাঁড়াল চক্রধর। আস্তে আস্তে সমস্ত ওপরের ছাই সরিয়ে দিয়েছে। তারপর কাঠটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে কোণে। ডানহাতে ত্রিশূল আর বাঁহাতে ঘণ্টা নিয়ে নাচতে নাচতে আগুনের ওপর দিয়ে ঘুরে এসেছে বার দুয়েক। নাচের তালে তালে বেজেছে জয়ঢাক। বেজেছে ঘণ্টা, ঘুরেছে ত্রিশূল।

শাশুড়ির দেওর নাকি নাচের মধ্যে দেখেছে শিবসুন্দরের নাচ। শিরণ কাউল যে দেখবে, এ আর এমন কি কথা। ও তো চক্রধরের মহাভক্ত নয় শুধু, একেবারে অন্ধভক্ত। ও বলে, ডাকিনী বিদ্যাবিশারদ চক্রধর স্বয়ং শিব-অংশ।

নৃপশ্যাম কি দেখেছে, সেই জানে। তবে বেশ বোঝা যাচ্ছে, ওর খুব বিশ্বাস এসে গেছে, আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপের অদ্ভুত গুণ স্বচক্ষে দেখে। আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে ফোস্কা না পড়া যা তা ব্যাপার নয়। নিশ্চয় মন্ত্রশক্তি। মায়ের কথায় সায় দিয়েছে ছেলে। মৈথিলীর ওপর অমঙ্গলের দৃষ্টি তাড়াতে হবে চক্রধরকে দিয়ে। মৈথিলীর সৌভাগ্য আসবে। তাই এই সুবর্ণসুযোগ। এ সুযোগ কি ইচ্ছে করে হারায় কোন পাগল।

হাতে হাতে ফল। বরাতে—অনেক জন্মের পুণ্যফলে এই সিদ্ধ-সাধককে পাওয়া যায়। লোকে পাবে কি করে? দূর বলে দূর—

অনেক দূরে। তার ওপর লোকচক্ষুর আড়ালে বসবাস। পাতাল-পুরীতে যাকে বলে। কটা লোকই বা জানে সন্ধান। শুভগ্রহের দৃষ্টিতে শিরণ কাউলকে পাওয়া গেছল তাই। সমস্তই যোগাযোগ।

শ্বশুর-শাশুড়ি দেওর-স্বামীর উপবোধ-অনুরোধ ঠেলতে পারে নি মৈথিলী। সকলেই শুভাকাঙ্ক্ষী। সকলেই আপনজন। কেউ পর নয়, কেউ শত্রু পক্ষের বা শত্রু নয়। এরা চায় তার ইষ্ট। অবিশ্বাসের দোলা দোলানো উচিত নয় তার। বাবা বলেছে, অমঙ্গল যেমন কোনো কিছু উপলক্ষ্য করে কখন অগোচরে এসে হাজির হয়, তেমনি মঙ্গলও ক র মধ্যে দিয়ে কিভাবে কখন উপস্থিত হয়, কেউ বলতে পারে না। যা করা হবে বিশ্বাসের ভিতে নিষ্ঠা নিয়ে করা কর্তব্য। আগে ভাগে '' ভেবে নেয়া মোটেই উচিত নয়।

আগের মানুষের মতোই ক্রিয়াকলাপ চলেছে মৈথিলীর বেলায়ও। সম্মোহনে অচৈতন্য করা। মন্ত্রপাঠ। মন্ত্রপূত ছোরা অর্থাৎ বজ্রকীলকে ' .হ ছোঁয়ানো। চৈতন্য আনানো। পায়ের তলায় ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা কিসব মাখানো। ছাইচাপা আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটানো। মুঠোয় বজ্রকীলের পুজোর ফুল গুঁজে দিয়ে। তফাৎ একটা বিষয়ে কেবল। এটা বাড়তি বলতে পারা যায়।

ওই মানুষের মাথার ওপর পুজোর বজ্রকীলকে বেদী থেকে তুলে এনে রেখে, পুজো করে নি চক্রধর। মৈথিলীর মাথায় রেখে করেছে কিন্তু। বলেছে, এর মনের জমি খুব উত্তম. তাই দেবতার প্রতিষ্ঠা করে দিলুম। কোনদিন কোনো অমঙ্গল তো হবেই না আর। তাছাড়া ডাইনি-ডাকিনীর নজর পড়ারও ভয় থাকবে না কখনো।

এই সময়টায়—শুধু এই সময়েই মৈথিলীর প্রকৃতির ধারা এক অন্যখাতে বইতে শুরু করেছিল। বাকি সময় অপছন্দই করে এসেছে চক্রধরকে। ওর কুশ্রী চেহারায় দেখেছে দানব। মানুষ-দেবতা তো দূরের কথা। ওর ক্রিয়াকলাপের গন্ধ পেয়েছেন ভানুমতির যাদুর। ইন্দ্রজাল মায়াজালের নিপুণ কারিকুরি। জাগা চোখে স্বপ্ন দেখানো সত্যি ভাবিয়েছে।

এতক্ষণের ভাবনাচিন্তা সমস্ত কিছু দূরে চলে গেছে চক্রধরের কথা কানে যেতে।...দেবতার প্রতিষ্ঠা করে দিলুম। ক্ষণেকের জন্য মনে হয়েছে মৈথিলীর, সত্যি সত্যিই তার দেহ দেবদেহ, তার মন দেবমন, তার প্রাণ দেবপ্রাণ।

মনে হয়েছে, এ যেন দৈববাণী শুনছে সে কোন ঋষিমুনি বা কোন দেবকণ্ঠের। অনেক দূর থেকে ভেসে ভেসে আসছে বুঝি। একটা অজ্ঞাত আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে ভেতরে। এ খেলা যেন বন্ধ না হয় কখনো। চলুক যুগযুগান্ত ধরে। আদি অন্তহীন। চলুক, চলুক।

স্থানকালপাত্র সব ভুলে গেছল মৈথিলী। রক্তমাংসের একটা মৈথিলী দুচোখ বুজে বসে আছে যে, চক্রধরের পাতালগুহার ভেতর, নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ পাথর মূর্তির মতো—এটাও। হারিয়ে ফেলেছে মৈথিলী মৈথিলীকে, মৈথিলী নিজেকে।

নৃপশ্যামের ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে।

শাশুড়ি? ভয়ধরা বুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ঘুরে বেড়িয়েছে।

গুহার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এসেছে সবাই এক এক করে। নৃপশ্যাম সঙ্গ ছাড়ে নি মৈথিলীর। ধরে আছে। ধাপে ধাপে পা ফেলাচ্ছে সন্তর্পণে। পাতালপুরীর আওতা থেকে ভেসে উঠেছে সকলে ওপরে। গুহার মুখ পাশে রেখে মর্ত্যের মাটিতে পা রেখেছে।

টাঙায় ওঠার সময় চক্রধর দাঁড়িয়েছিল বাইরে। বিকেলের পড়ন্ত রোদ মুখে-দেহে। ভেতরের মতো অত কুৎসিত অত ভয়ঙ্কর অত বীভৎস দেখাচ্ছে না। মুখে-হাতে রঙ মেখে নাকি দেবতার রঙে রাঙিয়ে নিয়েছে নিজেকে। দেবতা পুজোয় ধ্যানেমনে নিজে দেবতা হয়ে যেতে হয় প্রথমে। তাই এই ব্যবস্থা। দেবতা আর ও এক অভিন্ন। দেবতা না হলে, দেবশক্তি জেগে উঠবে কেমন করে! দেবশক্তি জাগলেই শুভশক্তি প্রভাব অপরের ওপর পড়বে।

বুঝিয়ে বলেছে শিরণ কাউল। লালরঙ সৃষ্টির। সকলের ভেতর সৃষ্টি হোক মঙ্গলের। কালো—মনের কালো মিশে যাক ওই কালোয়। হয়ে উঠুক শুভ্র-শ্বেত পবিত্র জ্যোতির্ময় হৃদয়। ভাঙা হিন্দী আর

ইংরিজী মিশিয়ে বলেছে শিরণ কাউল চক্রধরেরই মতো।

মৈথিলীর খারাপ লাগে নি শুনতে। কথার মধ্যে দর্শন আছে, আছে মনগড়ার জ্ঞান। আছে অশান্ত প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন।

চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মৈথিলীর।

কেবল দুচোখ বুজে কল্পনা করতে ইচ্ছে করছে চক্রধরের তাকে পুজো করার দৃশ্য। কল্পনায় যদি বাস্তবের জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে যায় মানুষ, হোক না সে কল্পনা হোক না অবাস্তব, বাস্তবের দাবদাহ, আগুনে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয় অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময়।

টাঙার ঘোড়া ছুটছে। সইস সপাং সপাং চাবুক মারছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পিঠে। বাতাসে খুরে খটখট চাবুকের সপাং সপাং মিলেমিশে মৈথিলীর কানে কানে কথা কয়ে চলেছে···দেবতার প্রতিষ্ঠা করলুম, দেবতার প্রতিষ্ঠা করলুম, দেবতার প্রতিষ্ঠা করলুম···।

কলকাতায় ফিরে এসেও এ রেশ কাটে নি মৈথিলীর। চক্রধরের ওখানকার দেখার আর শোনার। দুটোরই। মাঝে মাঝে কেমন হয়ে যায়। কোন কাজেই মন নেই। শুধু কাজের বেলায় কেন, সব ব্যাপারেই উদাসীন। নৃপশ্যামের জন্যে কত না বকুনি খেয়েছে বাড়ির গুরুজনদের কাছে। পুরুষমানুষ ঘরে বসে থাকা কি ভালো, ফিরতে একটু দেরী হলে অমনি অস্থির। ঘর-বার ছুটোছুটি। রাস্তাঘাটে কোন বিপদ হল না তো। বিপদ-বিপদ করে বিপদকে আদর আপ্যায়নে ঘরে ডেকে আনা। যত সব অলক্ষুণে চিন্তা। মৈথিলী, মৈথিলীর প্রকৃতি নিয়েই চলেছে। কর্ণগোচর হয় নি কারো কোন কথা।

সেই মৈথিলী সময়ে সময়ে নির্বিকার নির্লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে একেবারে। শাশুড়ির চোখে এটা খুব ভালো লক্ষণ নয়। স্বামীর মনে খটকা। হুট করে পরিবর্তন হওয়াটা সন্দেহের কারণ। মনের রোগ দাঁড়াল নাকি? এদের ভাবনাচিন্তার ধারা দেখে শ্বশুরের ভাবনা। ছটফট করলেও মানুষটার দোষ, আবার শান্তশিষ্ট থাকলেও দোষ—কোনদিকে যায় তাহলে বেচারা। এরাই ওর পেছনে লেগে লেগে পাগল করে তবে ছাড়বে দেখা যাচ্ছে।

শ্বশুরের মন্তব্যে বাকি সবাই চুপচাপ।

কিন্তু চুপ করে থাকা সম্ভব হল না ওদের বেশিদিন। সেটার একমাত্র কারণ মৈথিলীর বিচিত্র ধরনের আচার-আচরণ অদ্ভুত-অদ্ভুত কথাবার্তা। এসব দেখেশুনে কোন মানুষই মাথার ঠিক রাখতে পারে না। কাঁহাতক এড়িয়ে চলা যায়। একান্নবর্তী পরিবার। যা ব্যাপার-স্যাপার পরিবারের শক্তভিত নড়বড়ে হয়ে যেতে বেশি দেরী হবে না। মৈথিলীকে এখুনি সামাল দিতে না পারলে, পরিবারের অনেকেই ভিন্ন হতে বাধ্য হবে।

বাড়ির মনের পরিবেশ পাল্টে যাচ্ছে তড়িঘড়ি। এ বেলা একরকম ওবেলা একরকম। ভালোর দিকে তো নয়ই, বরং মন্দের দিকেই গড়িয়ে চলেছে। নৃপশ্যামের মনে সুখ-সোয়াস্তি নেই মোটে। কেবলি আশংকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার। হওয়ার আগেই হয়ে যাওয়ার বিচ্ছেদ বেদনা অনুভব করছে সদাসর্বদা।

তিন মহল তিনতলা বাড়িজুড়ে রমরমা অবস্থা ঠাকুরদাদের। বড়-ঠাকুরদা মেজঠাকুরদা আর ছোটঠাকুরদা। দীর্ঘজীবীর বংশ বলে তিনজনেই বহাল তবিয়তে আছে। তিনভায়ে খুব প্রীতির সম্পর্ক। চিড় খায়নি এখনো। ওপরের দেখেই তলার লোকেরা শেখে। বাবাদেরও ভায়ে ভায়ে মিল খুব। আবার নৃপশ্যামদেরও জাঠতুতো-খুড়তুতো ভায়ে স্নেহসেতুর বাঁধনে বাধা।

শুধু শহরের লোকের নয়, দেশঘরের লোকের মুখেও একই কথার প্রতিধ্বনি। এখনকার দিনে এমন একটি পরিবার খুঁজে পাওয়া খুব দুর্লভ। ত্রেতাযুগের রাম-লক্ষণেরাই বুঝি আবার এসে হাজির হয়েছে এই পরিবারে। কে বলে, সে-অযোধ্যা নেই, সে-রামও নেই আর। আছে আছে। এদের বাড়িটাই অযোধ্যা।

অযোধ্যা মহল টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবার। বাড়ির বাতাসে সেই গুঞ্জন। পর পর খাড়াই পাঁচিল উঠবে। এক হয়ে উঠবে বহু। এবাড়ি ওবাড়ি সেবাড়ি। একই বাড়ির লোকেরা হয়ে যাবে অন্যবাড়ির। বড় তরফ মেজতরফ ছোটতরফ। তরফের বাক্সে তালাবন্দী হয়ে পড়বে

আপনজনেরা। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে, জ্ঞাতিশত্রুর চেয়ে পরমশত্রু আর নেই পৃথিবীতে।

ভবিষ্যতের এই অনিবার্য বিপর্যয় রুখতে পারে একমাত্র মৈথিলী। কিন্তু মৈথিলী তার ধার কাছ দিয়েই যাচ্ছে না। ওর প্রকৃতিটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে উল্টো উজানে বয়ে চলার। ওকে নিয়ে যে তুষের আগুন জ্বলছে ধিক ধিক করে ঘরে ঘরে, সে ধারণাই নেই ওর মগজে। ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে যে, বাঁচে ঘরের লোক, সে লক্ষ্য কোথায়।

ওকে দেখলেই লোকে তিতিবিরক্ত। ওর জন্য সবাই তটস্থ আতংক-গ্রস্ত। দূর থেকে আসতে দেখলে, মেয়েরা দরজা জানলা বন্ধ করে দেয়। ভেতর থেকে খিলতাড়া এঁটে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকে, সেটা কে বোঝাবে মৈথিলীকে। মানবে না কারো কোন নিষেধ। শুনবে না কারো কোন কথা। নিজের গোঁয়েই চলবে।

বন্ধ দরজায় ধাক্কার পর ধাক্কা দেবে এক নাগাড়ে। দিনে হলে, পাগল বলে তবু বরদাস্ত করা যায়। রাতে গোটা বাড়ির ঘুম ভেঙে এক বিচ্ছিরি কাণ্ড। বড় ছোট সকলে মিলে একসঙ্গে নৃপশ্যামের কাছে এসে অভিযোগ-অনুযোগ-অনুরোধ করে বলে, বৌদিকে বৌমাকে নাত-বৌকে চিকিৎসা করাও, নয় বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও, মা বেঁচে আছে তো। মায়ের বাছাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হও।

কারো ওপর রাগ দুঃখ অভিমান ক্ষোভ—কিছু নেই নৃপশ্যামের। অন্যায় তো বলে নি কেউ। দিনের পর দিন অনেক সহ্য করে তবেই না এই পথ খুঁজে বার করেছে ওরা। উভয় পক্ষেরই শান্তিস্বস্তি এতে। এছাড়া অন্য রাস্তা আর কোথায়! সত্যি কথা বলতে কি মৈথিলীর অত্যাচার ভীষণ বেড়েছে। কে দরজা খুলল না খুলল, তাতে কিছু এসে যায় না ওর। ও সমানে বলে যাবে শীগগির ডাক্তার নিয়ে এসো, সোনামণি নীল হয়ে যাচ্ছে। বাঁচবে না আর। ওগো তোমরা জাগো। কালঘুম ঘুমিও না আর কেউ। আমাকে কাছে যেতে দাও। আমার মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি, কার কি হবে।

সর্বনেশে কাণ্ড! লোকের নয়নের মণি কোলের বাচ্চা সম্বন্ধে এসব

উক্তি কোন মা-বাবার কানে মধুর অমৃতবাণী শোনায় ? যদিও সত্যি হয়, তবুও না।

আশ্চর্য ! কোন মহলে কার বাচ্চা কেঁদে উঠছে কখন, মৈথিলী শুনতেও পায়। ছুটবে সেখানে। উপদেশ দেবে। মায়ের কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে আদর করতে করতে বলবে, বড় দিদি। কেমন কেমন ঠেকছে না বাবুরাজাকে। ফ্যাকাশে সাদা। চিকিৎসা কর এখুনি। এতো বাঁচার লক্ষণ নয় একেবারে। আমি না এলেই হয়েছিল আর কি ? কি করে চোখ কান বুজে বসে থাকো তোমরা চুপ করে, বুঝতে পারি না। আমার মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা।

নৃপশ্যামের মহাদুশ্চিন্তা। মাথা বিগড়েছে নিশ্চয়। কাল হয়েছে তক্ষশীলায় যাওয়া। তক্ষশীলায় গেছে গেছে, চক্রধরের ওখানে যাওয়াটাই খুব খারাপ হয়েছে। শিশুসরল মৈথিলীকে পুজো করা, তার মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা—এসব শুনে, ও নিজেকে সত্যিই ভেবে নিয়েছে মনে প্রাণে—সব জানতে পারে ও, সব বুঝতে পারে। এ ব্যামো সারাবে কে ওর ? এ যে ডাক্তারের অসাধ্য ব্যামো। ডাক্তারও বলছে তাই। একজন-দুজন নয়, একসঙ্গে সাত-আট জন পরামর্শ করেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, কোন বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ও যদি বেশি দিন আদরযত্ন করে, ভীষণ ভাবে সে বাচ্চা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। আর অসুস্থ হয়ে পড়লেই মৈথিলী বলছে, আমি তো বলেছিলুম, এ চলে যাবেই। কেঁদে সারা হয়েছে মরাকান্না। জলজ্যান্ত বাচ্চাটা যেন সত্যি সত্যিই মারা গেছে ওর কোলে।

বাচ্চার মা দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে বারান্দায়। ওর কোল থেকে জোর করে টেনে তুলে নিতে চেষ্টা করেছে। মৈথিলীও জোর করে আঁকড়ে ধরেছে। ছাড়বে না কিছুতেই। বলেছে, একে শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে আমাকে মেরে ফেল, তারপর নিয়ে যা।

বাচ্চার মা রেগে আগুন। এসব শুনলে মরা মাও বেঁচে ক্ষেপে উঠবে। বাচ্চার মা বলেছে, ডাইনি-রাক্ষুসী কোথাকার ! তোকে

আগুনে পুড়িয়ে মারা উচিত।

কি কেলেঙ্কারি ব্যাপার। চেঁচামেচিতে বৌ ঝি মেয়ে মা—সকলে এসে জড়ো হয়েছে। সবাই মিলে অনেক হুজ্জত করে বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিয়ে মায়ের কোলে তুলে দিয়েছে। টানাটানিতে যা ধকল গেল বাচ্চার, তার ওপর ককিয়ে কাঁদার জন্য সারা শরীর লাল হয়ে উঠেছে।

এরপর বাড়ির আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে গেল। যাদের ছেলে বা মেয়ে রয়েছে, বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে শুরু করে দিয়েছে। হোক শ্বশুর ভিটে হোক পিতৃভিটে—এর ত্রিসীমানায় আর আসছে না ওরা। ডাইনি মরলে বা বিদেয় হলে তবেই এমুখো হবে আবার। তার আগে নয়। বাড়িতে আদর দিয়ে ডাইনি পুষে রাখবে। আর প্রত্যেক মায়ের ডাইনির অমঙ্গলে দৃষ্টিতে নিশ্বাসে নিজেদের চোখের সামনে সন্তানের অমঙ্গল দেখতে হবে বসে বসে, কোন মা চায়। রাক্ষুসীর রূপে নৃপশ্যাম অন্ধ। এটা যে ওদের মায়ার রূপ, সে বুদ্ধিটারও উদয় হল না এত দেখেশুনে।

খুব আঘাত পেয়েছে নৃপশ্যাম। সে আদর দিয়ে ডাইনি পুষে রেখেছে বাড়ির ছেলেদের অমঙ্গলের জন্য! রাক্ষুসীর মায়ার রূপে মুগ্ধ সে। অন্ধ সে। এর হেস্তনেস্ত একটা করতেই হবে। এখুনি।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে নৃপশ্যাম। ঘরে একা। গালে হাত দিয়ে ভাবছে। মৈথিলীর বিয়ের কনে সাজের ছবিটার দিকে দৃষ্টি। সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো দেয়ালে আটকানো। জড়োয়া গয়নার সঙ্গে ফুলের সাজ। হাতে গলায় পায়ে মাথায়। বৌয়ের রূপ-গুণের প্রশংসা বেড়েই চলেছে, যতো পুরনো হতে শুরু করেছে।

জ্ঞাতি গুষ্টির মধ্যে ধন্যি ধন্যি। কি সুলক্ষণা লক্ষ্মী বৌ। কি সুকণ্ঠ। গানে—বাণী সরস্বতী সাক্ষাৎ। ঠাকুরদা আর ঠাকুরমারা মৈথিলীর গানে ভাবে বিভোর। এ মেয়ে নিশ্চয় শাপভ্রষ্টা। ক্ষণজন্মা। তা নাহলে এই সব গান এত সুন্দর করে গায়। গাইতে পারে। হ্যাঁ, মৈথিলী দুচোখ বুজে লালন ফকিরের গান যখন গেয়েছে, বাড়ির সব বয়সীরাই এসে উপস্থিত হয়েছে ওর গানের আসরে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো

চুপচাপ বসে বসে শুনেছে ওরা। গানের শেষেও কিছুক্ষণ বসে থেকেছে। অন্য গানের আশা নেই দেখে এই গানটাই আর একবারটি গাইতে অনুরোধ করেছে। মৈথিলী আরম্ভ করেছে আবার। অর্গ্যানের কালো-সাদা লম্বা রীডে আঙুল খেলা করে বেড়িয়েছে। গেয়েছে মৈথিলী।

যার মনের মানুষ আপন মনে
সে কি আর জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।

বাবা যত্ন করে মৈথিলীকে শিখেয়েছে। মৈথিলীও মনপ্রাণ দিয়ে শিখেছে। গাইতে গাইতে গানের কথার অর্থের সঙ্গে মর্মদেশে চলে যেত। যখন সে গান গেয়েছে, এত মগ্ন হয়ে গেয়েছে যে, নিজেই হয়ে উঠেছে গান, হয়ে উঠেছে গানের কথা, হয়ে উঠেছে গানের চরিত্র।

এই মৈথিলী আজ ডাইনি-রাক্ষুসী ?

এসব রূঢ়ভাষা শোনার আগে মৈথিলী ম'ল না কেন ? বছর দুয়েক আগেও তো ওকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি হয়েছে। তখন চলে গেলে এবাড়ি থেকে বিশেষ মর্যাদা নিয়েই যেতে পারত। সবার মনে স্মৃতি হয়ে বেঁচে থাকত। সুখ স্মৃতি। আর আজ ? আজ ও সকলের দুঃস্বপ্ন, সকলের ত্রাস, সকলের অমঙ্গল।

নৃপশ্যাম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। চোখের কিনারায় জল টলমল করছে।

মৈথিলী ঘরে প্রবেশ করল।

ওর দু চোখ উপচে জল গড়াচ্ছে। গাল বেয়ে, গলা বেয়ে। মৈথিলী যে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে, সে খেয়াল নেই নৃপশ্যামের। ওর ছবির দিকেই লক্ষ্য।

মৈথিলীর কণ্ঠস্বরে চমক ভেঙেছে। একটু কষ্ট করে মায়ের কাছে দিয়ে এসো। আর রেখো না এখানে। কেউ বুঝছে না, কেউ বুঝবে না আমায়। ওরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে কেন আমার জন্য ? আমারই যাওয়া উচিত। আমিই তো সবার অশান্তির কারণ। আমিই তো। আমিই তো।

—এত যদি বোঝো, নিজেকে শুধরে নিলেই তো হয়। খুব মৃদুস্বরে বলল নৃপশ্যাম।

কান্না জড়ানো গলায় বলেছে মৈথিলী, পারছি কই? চেষ্টার আমার অন্ত নেই। সরে থাকলে যদি কিছু হয়—দেখা যাক না। সব কথা তুমি আমার রেখেছ। একথাটা রাখো এবার। আর কখনো কোন ব্যাপারে অনুরোধ করবো না আমি। আরো কিছু হয়তো বলতে যাচ্ছিল মৈথিলী, পারে নি। শুধু ঠোঁট কেঁপে উঠেছে বার দুয়েক। সারা শরীর কাঁপছে, চোখের জল ঝরছে ঝরঝর করে।

বসে থাকতে পারে নি চেয়ারে নৃপশ্যাম। কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কথা কইতে গলা ধরে আসছে নৃপশ্যামের। থেমে থেমে বলেছে নৃপ-শ্যাম, যে যা বলে, বলুক। আমি তোমাকে অবিশ্বাস করি না জানবে।

অস্ফুটে বলেছে মৈথিলী, আমি জানি। এটাই আমার মস্ত ভরসা।

মায়ের কাছে এসে মৈথিলী আগেকার মৈথিলীতে ফিরে গেছল আবার। কিন্তু বেশিদিন সে অবস্থায় থাকতে পারে নি। দাদা-বৌদি ফিরে আসতেই সেই পুরনো ব্যামো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ওদের একমাত্র পুত্রসন্তান শিল্পেশকে ঘিরে যতো কাণ্ডকারখানা। কতই বা বয়স শিল্পেশের? বছর চারেক। দৌড়ে দৌড়ে আসে পিসির কাছে ফুটফুটে সুন্দর শিল্পেশ! পিসির তো আদরযত্নের তুলনা নেই। শিল্পেশ কদিনের মধ্যে ওর প্রাণমন-আত্মা সর্বস্ব হয়ে উঠেছে।

শিল্পেশকে নিয়েই সারাদিন কাটছে ওর। গান শেখাচ্ছে নিজে গেয়ে, নাচ দেখাচ্ছে নিজে নেচে। মা-বৌদি-দাদা—সকলে খুশি। দেখে শুনে গালভরা হাসি সবার মুখে। শিল্পেশ মৈথিলীর কাছে সাত রাজার ধন এক মানিক। মৈথিলীর নয়নের মণি। নিজের কাছ ছাড়া করে না একদম। শিল্পেশও যেতে চায় না পিসি ছাড়া অন্য কারো কাছে। পিসির সঙ্গে খাবে শোবে ঘুমোবে। পিসি তার খেলারও বড় সঙ্গী।

বৌদি ভেবেছে, বাঁচা গেছে ঠাকুরঝি এসে। যা দামাল ছেলে, নাইতে খেতে বসতে দিত না। কি জ্বালান না জ্বালাত দিনেরাতে। দাদারও শান্তি। অফিস থেকে বাড়ি ঢুকলেই তো নিত্য বৌয়ের মুখ ঝামটা সইতে হত।—নিজে তো আরামে অফিস করে ফিরলেন সায়েব। এদিকে দাসী বাঁদীর যে প্রাণ যায় বাবুর আদুরে ছেলের উৎপাতে আর বায়নার দাপটে। থাকুক না বাপ-ঠাকুরমা ছেলে নিয়ে। ধকলটা দেখুক একবার। কালই বাবার কাছে চলে যাব। এখনো বেঁচে আছে। গাছকে ফলের ভার লাগে না। দুমুঠো অন্ন জুটবে 'খন।

বৌদি তখন বাবার কাছে যেতে চেয়েছে ছেলে সামলাতে পারত না বলে। এখন চাইছে ছেলেকে নিয়ে চলে যেতে। ঠাকুরঝির নিশ্বাসে শিল্লেশ দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। সবটাতে ঠাকুরঝির আঁতকে ওঠা। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শিল্লেশ কথা বলছে, ঠাকুরঝির চেঁচামেচি কান্নাকাটি। —বৌদি শীগগির ডাক্তার আনাও দাদাকে বলে। ভুল বকছে শিল্লেশ। ভালো লক্ষণ নয়। মৃত্যুর আগে এমন সব হয়।

কি অমঙ্গুলে কথা। ওর নজর ভালো নয়, ওর মন ভালো নয়। ওর কাছে ছেলে রাখা মানা, শেষ করে ফেলা। বৌদি প্রতিজ্ঞা করেছে, কিছুতেই আর জলগ্রহণ করবে না এবাড়িতে। দুজনের একজনকে যেতেই হবে। নয় মৈথিলীকে, নয় বৌদিকে। ছেলের মর্ম তো বোঝে নি কখনো, অভিশপ্ত জীবন। অপরের ছেলের মৃত্যু কামনা করছে দিনরাত্তির।

মৈথিলীর মা দৌড়ে এসে জোড়হাত করে বলেছে, বৌমা? চুপ কর একটু, মৈথিলী শুনতে পাবে। বড় কষ্ট পাবে মা।

—থামুন। ঝাঁপিয়ে উঠেছে বৌদি। পাক কষ্ট। নিজের মেয়ের কষ্ট প্রাণে লাগছে। বৌ যে পরের মেয়ে। তার ছেলে মরুক-বাঁচুক—তাতে কি এসে যায়?

মা শাড়ির আঁচল গলায় জড়িয়ে বলেছে, দোহাই মা। আর বোলো না। মেয়েকে নিয়ে চলে যাচ্ছি মা। কালই চলে যাচ্ছি কাশীর বাড়িতে। তুমি তোমার শিল্লেশকে নিয়ে স্বামীকে নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকো। আনন্দে থাকো সুখে থাকো শান্তিতে থাকো। আজকের

দিনটা থাকতে দাও মা। স্রেফ আজকের দিনটা।

আবার স্থানান্তর মৈথিলীর।

এবার জ্ঞানের ক্ষেত্র মুক্তির মহাতীর্থ বিশ্বনাথের কাশীধাম।

যে বাড়িতে এসেছে মা আর মেয়ে, মৈথিলীর বাবার দাঁড়িয়ে থেকে মনোমতো করে তৈরী করা। লাল ঘষা ইঁটের দোতলা। জমি থেকে আধতলা উঁচু সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে একতলায় পৌঁছতে হবে। মাটিরতলায় আর একতলা আছে বলে এই ব্যবস্থা। মাটির তলায় তয়খানায় গরমের দিনে থাকার জন্য। যখন আকাশে বাতাসে মাটিতে আগুন ছুটোছুটি করে বেড়ায়। ঘরদোর ভেতর বার সব তেতে ওঠে। অসহ্য তাপ। সেই সময় অন্ধকার তয়খানা ঠাণ্ডা দেয় মানুষকে। ধড়ে একটু প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনে তবু।

মা জানে সমস্ত। আগে বাসও করে গেছে এসময় এখানে। না টিঁকতে পেরে প্রাণ বাঁচাতে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে কলকাতায়। সময়ের ফের এমন, পালানোর সময়েই ফিরে আসতে হয়েছে এখানে। বাড়ির, গরমের তুলনায় এখানকার গরম কিছু নয়। অবিশ্যি এবারে বেশি করে অনুভব করছে মা।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, আর ফিরবে না। এখানেই মৃত্যু অবধি থেকে যাবে। কর্তারও তো সেই নির্দেশই ছিল। বয়স হলে মানে না কেউ। ভুল বোঝাবুঝির পালা তখন বেশি। প্রতি পদে মর্যাদা হানি। তার চেয়ে মানসম্ভ্রম বজায় রেখে, দূরে সরে থাকাই ভালো, বুদ্ধির কাজ। মিথ্যে অশান্তি থেকে বাঁচবার উপায়। বিষ্ণুর মা! এটা মনে রেখো। তোমার জন্যই কাশীর বাড়ি—'বিষ্ণুরমা ভবন'।

ধাপে ধাপে ঘষা ইঁটের সুন্দর বাঁধুনি। শেষ ধাপের দুধারে রেলিংয়ে ঘেরা বারান্দা। ছাইরঙের। মেঝেয় মুখ দেখা যায় লাল পালিশের সিমেন্টে। ওখানেই মা-মেয়ে সন্ধ্যে-সকালে দুদিকে দুটি চেয়ার পেতে বসে দুজনে। বারান্দার সিঁড়ি থেকে সিধে গেট। দশাশ্বমেধ রাস্তার ফুটপাথে এসে শেষ। বসে বসে দেখে মা-মেয়ে রাস্তায় হরেকরকমের লোকের চলাচলি। টাঙায়-সাইকেল রিক্সায় কেউ কেউ হৈ-হুল্লোড়ে

মেতে উঠেছে আনন্দে। পরিষ্কার আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। মৈথিলী মাকে বলে, এ চাঁদেও আগুন ঝরে মা সূর্যের মতো। ভালো করে দেখো। এখানকার চাঁদে শান্তস্নিগ্ধ মধুর জোছনা কোথায়। নেই, নেই। এককণাও নেই।
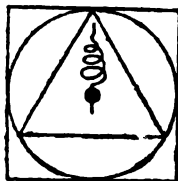
কাঠের হাতলে ঘুঙুর করতালি লাগিয়ে আওয়াজ তুলে তুলে যাচ্ছে দঙ্গলের পর দঙ্গল। হাতে বাজনা পায়ে তাল মুখে নাম।—রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাওন সীতারাম।

জটাজুটধারীরা কপিন পরে, ত্রিশূল হাতে নিয়ে এগোচ্ছে বীরদর্পে। শিবের দেশে শিবের সন্তানের মতো। ব্যোম ব্যোম হরহর মহাদেও। জয় উমাপতি বিশ্বপতি বিশ্বনাথ হর।

সকাল-সন্ধ্যের আবহাওয়াটায় মন্দির হয়ে ওঠে রাস্তাঘাট। আর মানুষজন হয়ে ওঠে ভক্ত সাধক জ্ঞানী মহাত্মা।

বেশ খানিক সময় অন্তরাজ্যে চলে যায় মানুষ অতীত বর্তমান ভুলে। এখানে এসে মেয়ের মুখের জেল্লা বেড়েছে। পাকা সোনার রঙটা আরো খুলেছে। বসে বসে নাম গান শুনে মৈথিলীর কানে মনে বেজে চলেছে অহর্নিশি। নিজেও গায় কখনো গুন গুন করে কখনো গলা ছেড়ে।

বেশির ভাগ সকাল বেলার দিকে আসে শালিবাহনবাবা। কালো কোলো বেঁটেখাটো মানুষ। হাসি হাসি মুখ। মাথায় একরাশ কাঁচা-পাকা চুল। রুখু। দাঁড়িগোঁফে মুখগালের একটু একটু বেরিয়ে আছে। ষাট-পঁয়ষট্টি চলছে। চললেও মানুষটা বেশ শক্তসমর্থ। নিজে সাইকেল-ভ্যান চালিয়ে আসে। পরনে নীলরঙের সাততালির হাফপ্যান্ট। ওর জুরি শার্ট। পায়ে চপ্পল। আসে ভিখিরী আর রুগীদের কাপড়জামা আর খাবার চাইতে। দিলেও হাসিমুখ, না দিলেও হাসিমুখ। যাদের

কেউ দেখে না, ঘেন্না করে, তাদের ও দেখে, ও আদর করে। রাস্তা থেকে তুলে নেয় মুমূর্ষু রুগীকে ভ্যানে। মারোয়াড়ী হাসপাতালে দিয়ে আসে।

না নিতে চাইলে কি ঝগড়া। কেন নেয়া হবে না? গরীব বলে। নিতে হবেই। একটু বড়, আরও বড়, তাবড়র কাছে যেতেও ও পেছপা হয় না। হাসপাতাল তটস্থ শালিবাহন গেলে।

এ মানুষকে ভালো লাগে মৈথিলীর। বেশি ভালো লাগে ওর কাজকর্ম। মাঝে মাঝে তামাশা করে বলে, শালিবাহনজী আপনি তো রাজা শালিবাহন। কত বড় আদমি। শকাব্দ চালু করেছেন। বছর গোনা হচ্ছে তাই নিয়ে। শোনা যায় বিক্রমাদিত্যকেও তো হারিয়েছেন নাকি যুদ্ধে।

হেসে, কপালে হাত ঠেকিয়ে, জোড়হাত করে বলেছে শালিবাহন। কোনটা হিন্দীতে কোনটা ইংরিজিতে।—বহিনজী, একি কথা বলছেন। কিসে আর কিসে। সে শালিবাহন আর এ শালিবাহন। আসমান আউর জমিন ফরাক।

এই শালিবাহনই একদিন জিজ্ঞেস করেছে মৈথিলীকে। এত উদাস দেখায় কেন বহিনজী? কেন?

মা আড়ালে ডেকে নিয়ে গেছে ঘরে। তারপর সবিস্তারে বলেছে মেয়ের সমস্ত জীবন বিপর্যয়ের কাহিনী। কেঁদে বলেছে, কোনরকমে মৈথিলীকে কি ফেরানো যায় না আর? এর কি কোন প্রতিকার নেই কোথাও? গালে হাত দিয়ে বসে থেকেছে খানিক শালিবাহন। কপালে এক দুই তিন—তিন-তিনটে রেখা ফুটে উঠেছে চিন্তায়। একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলেছে, মাইজী! চিন্তা করবেন না, দেখা যাক না রামজী কোথায় নিয়ে যেয়ে কি করায় কার দ্বারা।

বারান্দা থেকে ভেসে আসছে গান। গাইছে মৈথিলী। এ গান শালিবাহনের শোনা। অনেক বার শুনেছে। শুনেছে বাবার মুখে, মায়ের মুখে। আর নিজের গলায়। এখনো তো গায় নিজে। এখানেও গাইতে গাইতে এসেছে অনেক সময়। গাইতে গাইতে গেছেও।

বাবার এই গান শালিবাহনের জীবনের মূলমন্ত্র। তার সেবাব্রতের প্রেরণা তার কর্মশক্তি। সব মানুষ তার আপনার সব দেশ তার নিজের। এই শিক্ষা দিয়েছে। রসনা সংযত করতে আর মিষ্টি কথায় মিষ্টি ব্যবহার করতেও শিখিয়েছে।

মৈথিলী একবার প্রশ্ন করেছিল শালিবাহনকে।—আপনার এই সেবার মনোভাব এলো কোথা থেকে? কে গুরু?

উত্তরে বলেছে শালিবাহন, বাবা। বাবার কাছ থেকেই পাওয়া। গরীব বাবার সম্পত্তি ছিল না। ছিল সুকণ্ঠ। আর ছিল অমূল্য রত্ন-রাজির সংগ্রহ। মণিমুক্তো নয়, তার চেয়েও দামী। সাধুসন্তদের অভিজ্ঞতার দোঁহাগান। মানুষের হিতের জন্য—জগতের হিতের জন্য সে সবের সৃষ্টি। বাবা বলেছে, ছেলের জন্য কিছু রেখে যেতে পারে নি। এই গানটি ছাড়া। এ গানের মর্ম বুঝে যেন চলে শালিবাহন। প্রকৃত শান্তি পাবে, প্রকৃত আনন্দ পাবে।

গানটি গাইতে অনুরোধ করে খুব মৈথিলী। গেয়েছে শালিবাহন। তন্ময় হয়ে শুনেছে মৈথিলী। বলেছে, এখানে যখন আসবেন, গাইতে গাইতে আসবেন। আমার শুনতে খুব ভালো লাগে। ভেতরটা ভরে ওঠে। কি রকমের যে আনন্দ হয় বলে বোঝানো যাবে না। সেই গান আজ গাইছে নিজেই মৈথিলী। অনেক ভালো করে গাইছে শালিবাহনের চেয়ে। শালিবাহন ঘর থেকে বেরিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। শুনছে একমনে—

রসনা বশ করো ধরো গরীবি বেশ,
মিঠি বুলি লেকর চলো, সব হি তুঁহারা দেশ।

গান শেষে, সামনে এসে তারিফ করেছে শালিবাহন। মৈথিলী হেসে ফেলেছে লজ্জায়। যাবার সময় বলে গেছে শালিবাহন, মাইজী নমস্তে। বহিনজী নমস্তে! বহুত-বহুত নমস্তে।

পরের দিন এসেছে শালিবাহন। বিকেলে। তখনো রোদ্দুরের তেজ কি। বোশেখের শেষেও ফোঁস কমে নি। চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে নিয়ে যেতে এসেছে। যোগী মৌনীবাবার কাছে। উনি ওখানকার

পাথুরে গলির পাথরের বাড়ির তয়খানায় থাকেন। অনেক বছর মৌনী থেকেছেন। শ্লেটে লিখে-লিখে উত্তর দিতেন। বছর খানেক আগে ব্রত সাঙ্গ হয়ে গেছে বলে কথা কইতে শুরু করেছেন। কথা কইলেও মৌনী আখ্যা যায় নি। কত বয়স কেউ বলতে পারে না সঠিক। আশি বছরের লোক বলেছে, তিরিশ বছর বয়েস থেকে এই পঞ্চাশ বছর ধরে ওঁকে একই চেহারায় দেখছে। কোন তারতম্য নেই। মাঝে মাঝে সবার অজান্তে কোথাও উধাও হয়ে যান। আবার হুট করে এসে হাজির।

গরম থেকে আত্মরক্ষার জন্য চাদরে মাথা থেকে পা অবধি ঢেকে গেছে দুজনে। যোগী মৌনীবাবার কাছে। মায়েতে মেয়েতে।

স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘর।

একটা টিমটিমে প্রদীপ জ্বলছে। আর জ্বলছে দুটো চোখ। মৌনী-বাবার চোখ। জ্বলার মধ্যে জ্বালা নেই। আছে ঠাণ্ডা শান্তস্নিগ্ধ আলো।

ঘরের তিনকোণে তিনটে কঙ্কাল বসে আছে পেছন ফিরে।

মৌনীবাবা হেসে বললেন, ভয় নেই। ও তিনটে আসল নয়। মাটির। লোককে শেখানোর জন্য করা হয়েছে। প্রথমটার ভুরু দুটোর মধ্যিখানের প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে বলেছেন, এটা আজ্ঞাচক্র। এখানের আলো সোজাসুজি পৌঁছেছে মাথার পেছনে। ওখানে মনশ্চক্র। মনকে অর্থাৎ চিন্তা-ধ্যানকে একবার আজ্ঞাচক্রে প্রদীপের শিখায় আবার একবার মনশ্চক্রের আলোয় নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ধরে রাখতে হবে। একবার এখানে একবার ওখানে। সকালে পাঁচ থেকে সাত, রাতে পাঁচ থেকে সাতবার করে অভ্যেস করলে মন স্থির হয়। একে অরণিসাধনা বলে।

দ্বিতীয়টি মেরুদণ্ডের শেষ সীমায় প্রদীপ জ্বলছে, যেখানে মূলাধার চক্র। মানুষসৃষ্টির বিকাশের শক্তির জায়গা ওটা। ওখানকার ধ্যানে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি। মনের অন্ধকার প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে।

তৃতীয়টির ওই একই জায়গায় প্রদীপের আলোয় তিনটি মূর্তি দেখা যাচ্ছে। এখানে মূর্তি প্রতীক। স্বয়ম্ভু শিব বা ব্রহ্মা ইন্দ্র সাবিত্রী। আসলে সূর্যেরই তিনটি রঙের চিন্তা। এছাড়া মহাশূন্যের প্রতীক আরো একটির। প্রথম উদয় লাল তারপর সোনালী। তারপর রূপোলী। তারপর নীল। প্রত্যেক রঙের আলো বিশ্বের প্রাণ, জীবাণুনাশের শক্তি, পুষ্টি আর মৃতসঞ্জীবনী। চিন্তায় এই সব আলো মেরুদণ্ড বেয়ে পর পর ওপরে উঠে গিয়ে আজ্ঞাচক্রে স্থির হবে। আজ্ঞাচক্র থেকে মনশ্চক্রে। আবার মনশ্চক্র থেকে আজ্ঞাচক্রে। চোখের আলোয় চারটি আলোই নেমে আসবে আস্তে আস্তে। অসুস্থ মানুষের দিকে চেয়ে মনে প্রাণে ভাবতে হবে সুস্থ হয়ে উঠছে। কিছুক্ষণ। এটা তিব্বতী মতে ডাকিনী সাধনা। মূলাধারে ডাকিনীশক্তি। ডাকিনী-শক্তি মঙ্গলময়ী। অমঙ্গল নয়—ডাইনি নয়।

মৈথিলীর দিকে তাকিয়ে স্নেহঝরা স্বরে বলেছেন মৌনীবাবা, তোমার কোন দোষ নেই মা। তোমার কষ্ট শুনেছি সব শালিবাহনের মুখে। তুমি মা। মেয়েদের মধ্যে তুমি জননী জাতির মেয়ে। ছেলেদের বিপদের আশঙ্কায় তুমি উতলা হবেই। তবে তোমাকে সংযত হতে হবে। উতলা হয়ে বিপদ ডেকে না এনে, ডাকিনীসাধনার ধ্যানে মঙ্গল চিন্তায় সকলের মঙ্গল হয়ে উঠবে তুমি মা।

তোমার ভয়টা এসেছে দু দুটো বাচ্চাকে হারিয়ে। পেটে ধরে কোলে এনেও বুকের সুধা ঢেলে দিয়েও ধরে রাখতে পার নি বলে সদাই ত্রাস। ত্রাস এত দুর্বল করে দিয়েছে তোমায় যে, যে কোন ছেলেমেয়েকে দেখলেই মনে হয়, এই বুঝি বিপদ ঘটল, এই বুঝি চলে যাবে। যাবে যাবে আগের দুটোর মতো। যা হয়ে গেছে, জানবে শিক্ষার জন্য অভিজ্ঞতার জন্য। ভালোর জন্য। এখন সময় এসেছে এগিয়ে চলার।

মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন মৌনীবাবা। তোমার ভেতরের কল্যাণেশ্বরী ডাকিনী জেগে উঠুক। শত শত মায়ের অসুস্থ সন্তানকে তোমার কল্যাণ দৃষ্টিতে সুস্থ করে তুলবে। মায়ের বাচ্চাকে মায়ের কোল জোড়া হয়ে থাকার সাধনা করে যাও মা।

চোখভরা জল মৈথিলীর। পারবো তো ?

পারবে। নিশ্চয় পারবে। এক এক ধাতুতে এক এক প্রকৃতি নিয়ে জন্মায় মানুষ। যে কাজের জন্য আসা, সে কাজ তাকে করে যেতেই হবে। এক কাজের জন্য তো সবার আসা নয়।

সাধনার নিয়ম-নির্দেশ নিয়ে ফিরেছে মৈথিলী। নবজন্মের নতুন স্বাদের সাধনার সাধ নিয়ে ফিরেছে। এতদিনের ঘাটতি পূরণ হয়ে গেছে মুহূর্তে। পরিপূর্ণ অতিপূর্ণ অতিপুণ্য আজ মৈথিলী। অনেক সুস্থ সবল সতেজ সন্তানের জননী আজ মৈথিলী। মৈথিলী উন্মাদ নয়। অসুস্থ মনের রুগী নয়। হিংসুকে ডাইনি নয়।

মৌনীবাবার মতো মৈথিলীও থাকে থাকে অদৃশ্য হয়ে যায় কোথায় কে জানে। হঠাৎ করে এসেও পড়ে যে কোন সময়।

দীর্ঘ আট-নশ বছর কেটেছে।

তেমন অথর্ব না হয়ে পড়লেও, বয়সের ঢল নামতে শুরু করেছে শালিবাহনের দেহে। তবুও মৈথিলী এসেছে শুনে, সাইকেল-ভ্যান চালিয়ে এসেছে সাত সকালে। ভ্যানে মুমূর্ষু শিশু একটি।

মৈথিলী দোতলার বারান্দা থেকে দেখে, নেমে এসেছে নিচে। নিচের তলার সিঁড়ি বেয়ে ছুটে গেছে ভ্যানের কাছে। দেখেছে একদৃষ্টে শিশুটিকে খানিক। আস্তে আস্তে মাথায় বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

শিশুটি তাকাচ্ছে পিটপিট করে। হাসছে শালিবাহন। হাসছে মৈথিলী। মৈথিলী বলছে, শালিবাহন বাবাজী কি জয়। শালিবাহন বলছে, মৈথিলী মাইকি জয়।

মৈথিলীর পাশেই হিয়ারাণী।

অনেক সময় বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ মনের দরজায় প্রবলভাবে বেজে ওঠে। বুঝি ভুল হয়ে যায়। সত্যি কি বাইরে, না মনে হচ্ছে এমনি এমনি! এটা অবিশ্যি কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকার ফল হবে বা। ঝড়-বৃষ্টির রাতে এমনই অবস্থায় পড়েছে একদিন হিয়ারানী। কি দুর্যোগ।

বার বার জোরে জোরে কড়ানাড়ার শব্দ।

প্রবল বেগে কাঁপছে ঘরটা।

কাঁপছে কি দুলছে, ঠিক ঠিক বুঝতে পারছে না হিয়ারানী। এ যেন প্রলয় নেমেছে মাটির বুকে। ঝড়ের তাণ্ডব বেড়েই চলেছে ক্রমে ক্রমে। ঘরখানা পাকা তাই, নইলে মাটির হলে কখন ভেঙে গুঁড়িয়ে হাওয়ায় মিশে গিয়ে শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যেত।

ঝড় ওঠবার আগে কেবলই হিয়ারানী শুনেছে পায়ের শব্দ। ভেতরে, না বাইরে ঠিক বলতে পারবে না। তবে খুব যে কাছাকাছি, তা সুনিশ্চিত। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে, বুঝি বা তাকে ঘিরেই চলছে ফিরছে কেউ। কখনো একজন, কখনো অনেক।

শুনেছে স্পষ্ট দরজা ঠেলার আওয়াজ। খট খট খট। মণিময়ের দেয়ালে ঝোলানো ছবিটার দিকে চেয়ে বসে থাকতে পারেনি আর। ধড়মড় করে উঠে পড়েছে। জানলা খুলে উঁকি মেরে দেখছে, কেউ কোথাও নেই। বাতাসের তামাশা ছাড়া বিশেষ কিছু নয়। বাতাসে বড্ড দুলছে পুকুরপাড়ের নারকেল গাছটা। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে উঠে পড়ছে। কত তড়িঘড়ি ওঠা নামা চলছে ঘন ঘন।

আকাশের কড় কড় কড়াৎ শব্দ আছড়ে পড়ছে চতুর্দিকে। আর সেই সঙ্গে চোখ ধাঁধানো বিদ্যুতের ভয় ধরানো চমক। নীল বিদ্যুৎ আশমান জমিন এক করে গোল হয়ে ঘুরছে। চোখে খুব লাগছে

হিয়ারানীর। জানলা বন্ধ করে ফিরে এসে বসেছে নিজের জায়গায়। মাটিতে বিছানো লাল কম্বলের আসনে।

দুর্দান্ত বাতাসের দাপটের সঙ্গে তাল রেখে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে।

যে রকমভাবে শুরু হল যে রকমভাবে চলছে, গ্রামগঞ্জ না ভাসিয়ে থামবে না হয়তো। ভরা বোশেখের দিনদুপুরের দাবদাহের পর নিশুতি রাতে শীতের আমেজ নেমে এসেছে। ঘরের ভেতর বড্ড ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা।

মেঝের আসন ছেড়ে, চৌকির বিছানায় উঠে বসেছে হিয়ারানী। শাড়ির আঁচলটা টেনে নিয়ে মাথায় গলায় জড়িয়ে নিয়েছে ভালো করে। বড্ড বেশী মনে পড়ছে মণিময়ের কথা। আসছে বুঝি, এলো বুঝি। ডাকছে না! দরজা ঠেলছে না।

স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেনি।

চৌকি থেকে নেমে দরজা খুলেছে।

বৃষ্টির ঝাপটায় মুখ-কাপড় ভিজে গেছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দরজায় খিল এঁটে দিয়েছে হিয়ারানী। না, সমস্ত মনের ভ্রম। মণিময় আসবে না আর। আর কখনো নয়। বাইরের জলের ধারা হিয়ারানীর দু'চোখ বেয়ে নামছে দরদর ধারে।

দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিক।

আবার এসে বসেছে চৌকিতে।

বিচিত্র স্বভাবের মণিময়। জলঝরা রাতে, দুর্যোগের রাতে অদ্ভুত ভাবে আসতো। মণিময়ের ভেতরের একটা নরম জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতো একটা নতুন স্বাদের সুর, নতুন স্বাদের ভাবের কথা। দুটো মিলেমিশে কত না মধুর হয়ে উঠেছে। শুনেছে হিয়ারানী কোন অজানা দেশের অজানা পুরুষ-কণ্ঠের গান।

গানের মাঝে কখনো সচেতন করে দেয়নি হিয়ারানী। পাছে এভাবটা ভেস্তে যায়। মণিময় নিজেকে শোনাবার নিজেই গেয়ে যেত বোধহয়। সেই অবসরে ঘরের কোণে—দূরে বসে বসে একমনে

শুনেছে সে গান হিয়ারানী।—'সুখে দুঃখে আমার বুকে, শুনি কাহার চরণধ্বনি/কেবল মোরে আকুল করে, সে আমায় দিন রজনী।'

সত্যি কি মণিময় কারো পদধ্বনি শুনতে পেত?

কার—মণিময়ই জানে। লোকচক্ষে আসুরিক ক্ষমতার পাথুরে মনের মানুষ মণিময়। এমনি পাথর নয়। এমন কঠিন যে কোন কিছুর আঘাতেই ভাঙা যায় না নাকি। দুঃখ হয় হিয়ারানীর মানুষ কেন বুঝতে চায় না। কঠিনেও কোমল থাকে, আবার কোমলেও কঠিন থাকতে পারে। ওপর দেখে কাউকে বিচারের আদালতের রায় দিয়ে ফেলা ঠিক নয়। ঠিক নয়। অনেক ভুলভ্রান্তি হয়ে যায়। ন্যায় ভেবে অন্যায়কেই সত্যি ভেবে নেয় মানুষ। মানুষের ধর্ম বুঝিবা তাই।

মণিময়ের গাওয়া গান গুনগুন করে গাইছে হিয়ারানী।

গান থেমে গেল আচমকা। সামনে এসে কে যেন দাঁড়িয়েছে তার। বারে বারে কেন এমন হচ্ছে আজ হিয়ারানীর! বারে বারে ঠকাচ্ছে নিজের মন, নিজেকে। নিজের চোখ, নিজেকে! নিজের কান, নিজেকে!

প্রচণ্ড জোরে দরজায় ধাক্কা দেয়ার আওয়াজ হচ্ছে। কারা যেন জোরে লাথি মারছে। লাঠি দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে। দরজার পাল্লা দুটো কাঁপছে ঠক ঠক করে। কান পেতে শুনছে হিয়ারানী। সত্যি, না শোনার ভুল, না দেখার ভুল।

হিয়ারানী ধীরস্থির হয়ে বসে। চেয়ে আছে দরজার দিকে এক দৃষ্টি। সে জেগে, না স্বপ্নের ঘোরে রয়েছে। এও কি সম্ভব তার দরজায় এমনভাবে গভীর রাতে—দুর্যোগে এসে আঘাত করতে পারে কেউ! পারে না পারে না পারে না।

তবে?

ভুল। বাড়ি চিনতে ভুল নিশ্চয়।

নেমেছে চৌকি থেকে। ভুল শুধরে দিতে হবে ওদের।

সামনে এসে কারো দাঁড়ানোর অস্তিত্ব অনুভব করছে আবার হিয়ারানী। হিয়ারানী যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে স্থানকালপাত্র ভুলে

যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে।

দরজায় শাবলের ঘা পড়ছে। পড়ছে কুড়ুলের ঘা। হিয়ারানীর কানে প্রবেশ করছে না বোধ হয় এসব শব্দ। হিয়ারানী একখানা নিথর পাথর মূর্তি হয়ে গেছে। বাইরের ওরা দরজা ভেঙে ফেলেছে সে খেয়াল যেই। সাহায্যের জন্য যে চিৎকার করে কাউকে ডাকবে, গলার সে স্বরও বুঝি হারিয়ে গেছে। আসলে ভেতরের মন অনুভূতিটা বেঁচে আছে কিনা আদৌ—সে বিষয়েও সন্দেহ!

যারা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকলো, তারা হিয়ারানীকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু থমকে গেছে প্রথমে। যেন অচেনা-অজানা কারো সামনে এসে পড়েছে ওরা। যে হিয়ারানীর জন্য আসা, এ সে নয়। কয়েক মুহূর্তের এই অবস্থাটা কেটে যেতেই ওরা হিংস্র পশুর মতো শিকার ধরার ভঙ্গিতে পা বাড়িয়েছে। মাটি ফুঁড়ে বেরোনোর মতো ওদের আগে আড়ল করে সামনা-সামনি এসে দাঁড়িয়েছে সূর্যদীপ ঠাকুর। সূর্যদীপের দুদিকের দুহাতের বেড়ায় বাধা পেয়ে ওরা আরো ভীষণ হয়ে উঠেছে।

বৃষ্টি থামেনি একটুও। বিদ্যুতের চমকানিও না। প্রখর আলো ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঘরের ভেতর অবধি থেকে থেকে।

হিয়ারানী কি মেঝেয় গাঁথা নাকি। দেহের কোন অঙ্গই তো এতটুকু চঞ্চল নয়। এতটুকু ভীতসন্ত্রস্ত নয়। বিস্ময়! মহাবিস্ময়! হিয়ারানীর আপাদমস্তক দেখছে দাঁড়িয়ে সূর্যদীপ। দেখতে পারলো না বেশীক্ষণ পেছনের লোকের তাগাদায়। ওরা দলে ভারী। জনা আষ্টেক। সূর্যদীপ একা। একা। একা হলেও ওই ওদের প্রধান। ওর ওপরই, ওর রায়ের ওপরই নির্ভর করছে সমস্ত কিছু। হিয়ারানীর জীবন, হিরারানীর মরণ।

আজকের অলক্ষুণে এই রাতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা একমাত্র সূর্যদীপের চোখের ইশারায় আঙুলের ইঙ্গিতে পলকে ঘটতে পারে ভয়ানক

ব্যাপার। মর্মান্তিক রক্ত হিম করা। বাগদি জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে সূর্যদীপ। ওদের হাতে তেল মাখানো চকচকে যে মোটা-শক্ত লাঠি শুধু আছে, তা কিন্তু নয়। কারো কারো হাতে বেশ বড়সড় ছোরাও। এক সূর্যদীপ ছাড়া প্রত্যেকের গা বেয়ে তেল গড়াচ্ছে ঝাঁকড়া চুলে বীভৎস মুখ। আরও আশ্চর্যের বিষয়, সাজগোজের সঙ্গে আকৃতি-প্রকৃতি বেমানান। মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরা। গেরুয়া রঙের। গলায় উত্তরীয়। কারো ঘিয়ে লাল সুতোর, কারো হলুদ। একেবারে গাজনের সান্ন্যাসীর বেশবাস।

সূর্যদীপের ?

গেরুয়া আলখাল্লা। সারা শরীর—পা অবধি ঢাকা। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। ওদের মধ্যে অমাবস্যায় যেন চাঁদের উদয়। কিন্তু চাঁদের মুখেচোখে স্নেহ-স্নিগ্ধের লেশমাত্র নেই কোনখানে। কঠিন, কঠিন। যতটা হওয়া সম্ভব, তার চেয়েও চারগুণ বেশী বই কম নয়। চোখের তারা দুটো দিয়ে তীব্র আগুন ছিটকে বেরিয়ে আসছে। লম্বা মানুষটা গেরুয়ার খোলসে সাক্ষাৎ দৈত্য হয়ে উঠেছে। কি ভয়ঙ্কর কি ভয়াবহ !

পেছনে দলের মধ্যে থেকে আগের মতো কে একজন বলে উঠেছে, ঠাকুর মহারাজ। আর মোটে দেয়ী নয়। দেরী হলে কাজ নাশ হোতি পারে।

এবারে কটমট করে তাকালো পেছনে একবার সূর্যদীপ। ভাবখানা—স্পর্দ্ধা-দুঃসাহসেরও একটা সীমা থাকে উচিত। তাকে আদেশ-উপদেশ করার মতো কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে !

পেছনের ওরা সূর্যদীপের ওই চাউনির সামনে নিজেদের দৃষ্টি আটকে রাখতে পারেনি। চোখ নামিয়েছে। মাথা নুইয়েছে। ছোরা-লাঠি ধরা হাতের মুঠো বুকে রেখে।

আকাশের বাজ বুঝি ঘরে এসে ছিটকে পড়লো। বুক কাঁপানো গম্ভীর আওয়াজ। সূর্যদীপ বলছে, কেউ না বুঝুক, কেউ না জানুক—আমি তোমায় ভালোরকম বুঝি, ভালোরকম জানি। এমন ভান করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। চলবে না বলে দিচ্ছি। দাঁত কড়মড়

করে ভীষণ চিৎকার করে উঠেছে সূর্যদীপ।

থরথর করে কেঁপে উঠছে হিয়ারানীর পাথরমূর্তি দেহখানি। প্রাণের সঞ্চার হল বুঝি প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। আগের মনে আগের দেহে ফিরে এলো হিয়ারানী আবার সূর্যদীপের হুমকির দাপটে।

—ডাইনিকে পিছমোড়া করে বাঁধো তোমরা।

সূর্যদীপের আদেশ-ইঙ্গিতে, অনুচরেরা ঘিরে ধরেছে গোল হয়ে হিয়ারানীকে।

অপলকে চেয়ে আছে হিয়ারানী সূর্যদীপের মুখের দিকে। সন্ন্যাসীর সাজ। মানুষের হৃদয় জানার ক্ষমতা কই। মানুষের আশ্রয় যারা, নিরাপদ নির্ভয় আশ্রয়—তারা মৃত্যুদূতের ভূমিকায়। অবাক কাণ্ড। আরো অবাক হয়েছে হিয়ারানী সূর্যদীপের মুখে তাকে উদ্দেশ করে 'ডাইনি' উচ্চারণে। হিয়ারানী আজ ডাইনি এদের চোখে এদের মনে। ভাগ্যের কি নির্দয় পরিহাস।

সূর্যদীপ হিয়ারানীকে ডাইনি ভাবে। ওর দলবলেরও তাই মনোভাব। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু সুমন্তর? সুমন্তও কি তাই ভাবে তাকে?

না না। ভাবতে পারে না। সুমন্তর কথা চিন্তা করতেও বড্ড কষ্ট হচ্ছে ভেতরে। আপন ভোলা শিশুমনের মানুষ। হিয়ারানীদের সুখ সুবিধে আর মানসম্মান বাড়ানোর কত না চেষ্টা। নির্ভেজাল অকৃত্রিম। ওর সামনে গেলে, ও সামনে এলে কৃতজ্ঞতায় মাথা মত হয়ে আসে। আপনা থেকেই।

এই লোকের অভিভাবক গুরুদেব সূর্যদীপ। কেমন করে হতে পারে। শোনা যায়, সুমন্তর মুখেই অনেক শুনেছে অন্যের মুখের চেয়ে। সূর্যদীপের মতো অপরের হৃদয়ের ভেতরের খবরাখবর জানার দ্বিতীয় জুড়ি নাকি নেই আজ ত্রিভুবনে। ওর মতো জীবনের পাঠ সঠিক বলতে পারে না নাকি কেউ কোথাও। কি দয়ামায়ার শরীর, তুলনাহীন।

হ্যাঁ, তুলনাহীনই বটে।

হিয়ারানীর হাত মোটা কাছি দিয়ে বেঁধে ঘর থেকে বার করে নিয়ে

যেতে আদেশ করছে যে মানুষ, হিয়ারানীর কাছে সে মানুষ দেবতার আসনে বসার অনুপযুক্ত।

কিছুদিন আগে বারুইপুর শহর-গ্রামে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠেছিল, সে গুঞ্জনে কানে এসে পৌঁছেছিল হিয়ারানীরও। হিয়ারানী ডাইনি। অমন সোনার চাঁদ ছেলে সুমন্ত। কেমন মাথায় হাত বুলিয়ে পাকা ঘরটা বানিয়ে নিয়েছে। ছেলে তো হিয়ারানী বলতে অজ্ঞান। বিধবা মাকে কি ভক্তিশ্রদ্ধাই না করতো। এখন চোখাচোখি হলেই দপ করে জ্বলে ওঠে। হিয়ারানীর মন্ত্রতন্ত্র গুণে একেবারে ভুচক্ষের বিষ করে দিয়েছে। বাপ থাকলে হিয়ারানীকে দেশছাড়া করে ছাড়তো কবে। দেখা যাক মামা এসেছে। কদ্দুরের জল কদ্দুরে গড়ায়। বাপের মতো হুবহু না হলেও, কিছুটা কাছাকাছি যায়। ঢুঁদে বলে নাম ডাক আছে খুব। হয়কে নয়, নয়কে হয় করতে অদ্বিতীয়। এমন সব কাণ্ড করতে পারে, ধরে মাছ না ছোঁয় পানি। গোপনে-গোপনে কাজ সারা। কাকে-বকে টের পাবে না। কখনো কেউ।

নিয়ে যাও শ্মশানতলায়।

শ্মশানতলা! হিয়ারানীর কানে কিরকম খটকা লাগল। কথাটার সঙ্গে যেন আর একটা জায়গার কথার সঙ্গে খানিকটা মিল খুঁজে পাচ্ছে।

মহিষাদল। মেদিনীপুরের মহিষাদলে।

ভবানীতলা মে লে জাও। ভবানীতলায় নিয়ে যাও। এ আদেশ নাকি অপরাধীদের ওপর। যাদের মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, তাদের জন্য। ভবানীতলায় দেবীর সামনে তাদের জীবন উৎসর্গ করা হবে অপরাধী জীবন থেকে উদ্ধার পাবার জন্য। মুক্তি পাবার জন্য। অর্থাৎ বলি দেয়া হোত দোষীকে।

কতযুগ কেটে গেছে। এ নিয়মকানুন মুছে গেছে সেখান থেকে।

সে শাসকও নেই, সে রাজারাজড়ারাও নেই, রক্ষে করার কেউ নেই। রাতদুপুরে যথেচ্ছাচার।

হিয়ারানীর মনে হচ্ছে, মৃত্যু শিয়রে এসে উপস্থিত হয়েছে নিশ্চয়।

—ডাইনির চোখের দিকে কেউ তাকাবে না তোমরা। খুব হুঁশিয়ার, খুব হুঁশিয়ার। বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে সূর্যদীপ।

পেছু পেছু চলেছে অনুচরেরা।

মধ্যিখানে হাত-বাঁধা হিয়ারানী।

বৃষ্টি থামবার নাম নেই কোন। ওদের চলার তালে তালে বৃষ্টিও ঝরছে ঝরঝর করে। গোটা পথ অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোয় রাস্তা নজরে পড়ছে। একটু-আধটু নজরে পড়লেও পরে আরো জমাট অন্ধকার নামছে জায়গা জুড়ে। অন্ধকারে একটু সময় যাচ্ছে চোখ সইয়ে নিতে।

শ্মশানের পথে চলেছে ওরা।

দু'সারি বাগান জঙ্গল ঝোপঝাড়।

লোকবসতি চোখে পড়ছে না। আম গোলাপজাম লকেট ফল সফেদা কাঁঠালের গাছ ছড়াছড়ি বাগানে-বাগানে, গাছেরাই সাক্ষী। রাতের অন্ধকারে ঝড়বাদলের কবলে পড়ে, দুর্জনদের হিংস্র দাবানলে, কোথায় হারিয়ে যাবে হিয়ারানী কেউ জানবে না। কেউ খুঁজবে না, খুঁজে পাবেনাও কোথাও কখনো। কাঁদবার কেউ নেই। চোখের জল ফেলবে কে আর!

হিয়ারানী নির্বাক পুতুলের মতো চলেছে।

চলেছে বুদ্ধিহীন সহায়সম্বলহীন অসহায়ের মতো।

হিয়ারানীর চলার পথেও ঘরের অনুভূতি পাশে পাশে চলেছে। গায়ে গায়ে বললেই চলে। কে যেন চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। চোখে দেখা না গেলেও, মন বলছে, আছে আছে আছে। তোমার সঙ্গে আছে একজন।

মানুষ নিজেকে বড় বেশী ভালোবাসে, তাই মরণকালেও ভাবে, সে

বুঝি অমর। এও সেই ধরনের ধারণা থেকে হয়তো জন্ম দিচ্ছে অনুভূতির রাজ্যে কারো অস্তিত্ব। ধারণা শুধুই ধারণা। যথার্থ হয়ে ওঠে কটা লোকের বাস্তব জীবন!

যারা হিয়ারানীকে বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তারা কজনই চেনা মুখের। এর মধ্যে একজনও অচেনা নয়। শিবমন্দিরের ধারে বসে বসে দেখেছে রোজ এদের লাঠিখেলা। এরা শিবের চৈতসন্ন্যাসী। গাজন অবধি এ খেলা দেখাবে রোজ। শিবকে। মানত আছে বলে।

দেখে দেখে কত কথাই না উঁকি মেরেছে হিয়ারানী মনের কোণে।

জায়গা জমির সীমানা নিয়ে কি গণ্ডগোল কি মারাদাঙ্গা দু'পক্ষের মধ্যে। এখানকার রায়চৌধুরীর আর বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের মধ্যে। কেউ কারো চেয়ে কম যায় না। এ বলে আমায় ছাখ, ও বলে আমায় ছাখ। এ বলে আমি কমতি কিসে! ও বলে আমি যাস্তি তোর চেয়ে।

দু'পক্ষের লেঠেলে-লেঠেলে শক্তির পরীক্ষা চললো।

জয় পরাজয়ের সুতো ধরে টানছে দু'দলের ভাগ্য দেবতা। মৃত্যু-মাতনে মেতে উঠেছে ওরা। কারো রণভঙ্গের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। এ দৃশ্যে আশপাশের লোক হাঁপিয়ে উঠছে। মরণ না ঝাঁপিয়ে পড়ে শেষে তাদের ঘরে এসে। অন্তিম উপস্থিত ভেবে ঠাকুর দেবতার নাম স্মরণ করতে জপ করতে শুরু করে দিয়েছে সবাই। কি হয় কি হয়, কার দল জেতে কার দল জেতে—উৎকণ্ঠা-উত্তেজনা দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে আকাশে বাতাসে মাটিতে।

এত উৎকণ্ঠা এত উত্তেজনা, আকাশ ছোঁয়া মৃত্যুত্রাস এক নিমেষে যাদুর খেলার মতো শূন্যে মিলিয়ে গেল। পৈতের গোছা গলায় দুলছে যুবকের। হাতের খাঁড়া ঘোরাতে ঘোরাতে যুবক সকলের চোখে ধুলো দিয়ে যেন লাফিয়ে পড়েছে সাবর্ণ চৌধুরীদের দুর্দ্ধর্ষ লেঠেলদের মধ্যে। লেঠেলদের সর্দার বিজয় গৌরবের কিংবদন্তীর মানুষ ভৃগুরামের মাথা ছিন্ন করে ফেলেছে ধড় থেকে এক কোপে।

সে কি বীভৎস তাণ্ডবনৃত্য যুবকের কাটামুণ্ডের চুলের মুঠি ধরে। কি আকাশ ফাটানো অট্টহাসি। ভয়ে যে যেখানে পেরেছে ছুটে পালিয়ে বেঁচেছে সাবর্ণ চৌধুরীদের লেঠেলরা। ঢাকের বাজনা বেজে উঠেছে উন্মত্ত উল্লাসে। বারুইপুরের চৌধুরীরা বিজয়ী। বিজয়ী সর্বমঙ্গলা মায়ের আশীর্বাদে।

ভৃগুরামের মাথার চুল নাকি আজো সযত্নে রাখা আছে। সেই চুল এলে, তবে গাজন উৎসব শুরু।

একাহিনী শুনেছে হিয়ারানীরা সুমন্তর মুখে।

সুমন্তই হাত-পা নেড়ে চোখ বড় বড় করে এমন সুন্দরভাবে বলেছে ঘটনা। এমন মনোরম বর্ণনা যে, হিয়ারানী আর মণিময় স্তব্ধ পাথর হয়ে শুনেছে বসে বসে। যেন জায়গায় গিয়ে ঘটনা ঘটতে দেখছে ওরা নিজেদের চোখে।

সুমন্ত ওদের দেশে যাবার নেমন্তন্নও করেছে গাজন উৎসব দেখতে। আর তাছাড়া হিয়ারানীদের নররাক্ষসের খেলাও জমবে ভালো।

ঘোষপাড়ায় সতীমার থানে রাসের মেলায় খেলা দেখার সূত্র ধরে প্রথম পরিচয় হিয়ারানীদের সঙ্গে সুমন্তর। মণিময়ের নররাক্ষস অদ্ভুত। ভাবা যায় না। অমন সুপুরুষ মানুষটা মুহূর্তে দানব-শরীর পায় কি করে! কোন মঞ্চের আড়ালে সাজগোজের কোন কারিকুরি নেই। রাতের অন্ধকারেও নয়। একেবারে খোলামেলা জায়গায়। মাঠ-ময়দানে। বহুলোকের সামনে।

নকল নররাক্ষসরা হম্বিতম্বি লাফালাফি করে এমনি-এমনি। নিজেদের লোকেরাই বাঁধা দড়ি আলগা করে দেয়। আলো-আঁধারিতে মুরগীর রক্ত ছিটোয় গায়ে চতুর্দিকে। কাঁচা মাংস খায় না। এদের ধোঁকায় পড়ে যদি নির্বিচারে লোকটা দু'পয়সা খরচ করতে পারে, তাহলে সত্যি ব্যাপারে অনেক আসবে। এখনো সত্যি জিনিসে পয়সা খরচ করতে তারিফ করতে পেছপাও নয়—এমন বহু, বহুলোক আছে।

আছে সুমন্তদের দেশে। ওদের দেশে ঘরের মানুষের মন চরিত্র সুমন্তর নখদর্পণে। তাই সুমন্তর সনির্বন্ধ অনুরোধ দেশে হিয়ারানীদের

নররাক্ষসের খেলা দেখানোর।

খেলা দেখানো যতটা না বড়, তার চেয়ে ভৃগুরামের চুল আনার পর গাজন উৎসব—কেমনতর, দেখার সাধটাই বড় হয়ে উঠেছে হিয়ারানীর কাছে।

হিয়ারানীরা সম্মতি জানিয়েছে সুমন্তকে। সুমন্তর মান রাখবে তারা ভালো খেলা দেখিয়েই।

সুমন্ত সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চেয়েছে। নাছোড়বান্দা। আগে থাকতে গেলেও পসার কম হবে না। সে দায়িত্ব সুমন্তর একার। পয়সাকড়ির অভাব-অনটন না হলেই তো হল।

যেচে লক্ষ্মী ঘরে আসতে চাইছে যখন, ফেরত দেয়া বোকামি ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। কথায় বলে যাচা অন্ন ছাড়া উচিত নয়।

খেলা দেখে দেখে এমন নেশা হয়ে উঠেছে যে, সঙ্গ ছাড়ার নাম নেই। পাছে অমূল্যরত্ন হাতছাড়া হয়ে যায়। পাছে হিয়ারানীরা না বায়নাপত্তর করে ফেলে অন্য জায়গায় অন্য কারো সঙ্গে।

কি বিপদই না হয়েছে হিয়ারানীদের।

হিমসাগরে গেছে কঠিন রোগের রুগীদের রোগমুক্তির ক্রিয়াকলাপ দেখতে, সেখানেও সুমন্ত আগে থেকে গিয়ে পাড়ের ওপর বসে আছে।

মণিময় বলেছে, সুমন্ত মানুষটা সত্যিই খুব ভালো মনের। ভেতর-বার একরকমের। ছলকপট নেই কোন। ভালোমানুষ বলে ভীতু-ভীরু নয়। স্পষ্ট বলবার সাহস আছে যথেষ্ট। সেদিন তো মেলাতে এক খেলোয়াড়কে বলেই বসলো মুখের ওপর।—তোমার খেলা তো ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু নয়। সব ফাঁকা সব ফাঁকি। দর্শকের সামনে। খেলোয়াড়ের মুখ চুন। সে বেচারাও নররাক্ষসের খেলা দেখাচ্ছিল।

সুমন্ত মণিময়কে দেখিয়ে বলেছে, এর মতো পারবে? ট্যাঁক থেকে এক গোছা নোট বার করে বলেছে, সুমন্ত দিয়ে দেবো।

লোকটার কাঁদো কাঁদো মুখ দেখে হিয়ারানীর কষ্ট হয়েছে। বলেছে, পেটের দায়ে—

বাকি কথা বাকিই থেকে গেছে হিয়ারানীর জিভের আগায়।

বলেছে সুমন্ত, বেশ তো—সেটা সাফ-সাফ বললেই ঝামেলা চুকে যায়। লোকটার হাতে গোটাদশেক টাকা গুঁজে দিয়েছে। বলেছে, কিছু মনে করো না ভাই।

যেটুকু বিরক্ত হয়েছিল সুমন্তর ব্যবহারে হিয়ারানী, সেটুকু ওর পরের ব্যবহারেই মন থেকে মুছে গেছে। দুর্ব্যবহারের বিরক্তির চিহ্ন। সুমন্তর সৎবুদ্ধি আছে। বোঝালে নরম মনে লোকের ব্যথাবেদনা যে বেজে না ওঠে তা নয়। বেজে ওঠে। আর ওকে অস্থিরও করে তোলে অনাথকে সাহায্য করার জন্য।

যা মুখফোঁড় সুমন্ত, পাড়ে বসে বসে দেখছে সব একমনে, মুখখানা গম্ভীর-গম্ভীর—এখানে না আবার একটা কাণ্ড করে. বসে। সেই ভয় হিয়ারানীর।

কর্তাভজনার শিষ্যভক্তরা রুগীর চুলের মুঠি ধরে টানছে। রেগে চড়চাপড় কষাতেও কসুর করছে না। রুগীর এক পা হিমসাগরের সিঁড়িতে, অন্য পা জলে। কর্তাভজনার লোকেরা জীবনের পাপ-গোপন কাজ-কর্ম স্বীকার করতে বলছে। রুগী ইতস্তত করলেই প্রহার। ওদের ধারণা—স্বীকার করলে, তাও যদি অকপটে হয়, রোগমুক্ত হবে রুগী। তাই শাসন পীড়ন।

পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে হিয়ারানী আর মণিময়। উঠে এসে সুমন্ত বলেছে, একি কাণ্ড! চোখে দেখা যায় না। লোকটাও তো বোকা, মারধোর খাচ্ছে অম্লানবদনে। এসব দেখেও তো কত লোক আসছে। আশ্চর্য!

মণিময় মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছে, এ আর কি এমন আশ্চর্য! সব চেয়ে মানুষের জীবনটাই কি বেশী আশ্চর্যের নয়?

চুপ করে থেকেছে সুমন্ত।

নিজেদের মধ্যের বাতাসটা যাতে ভারী হয়ে না ওঠে, সেইজন্যে হিয়ারানী একটু হালকা আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছে। সাপ না মরে লাঠি না ভাঙে। হাসতে হাসতেই বলেছে, জীবনে অনেক ব্যাপারে কাজকর্মে ঘটনায় অনেক কিছু জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে থাকে

ভেতরে। বড় কষ্টকর হয়ে ওঠে। সে সব কথা বহু সময় বলতে পারা যায় না কারো কাছে। বলতে পারলে, কষ্টের খানিকটা লাঘব হয় অন্তত। হিমসাগরের রুগীদের সে চক্ষেও দেখা যেতে পারে।

এরপর মণিময় আর সুমন্তর মধ্যে হিমসাগর নিয়ে আর কোন বাদ-প্রতিবাদ হয়নি।

মেলা শেষে যে যার ঘরে ফেরার পালা। মণিময় সুমন্তকে বিনয়ের সুরে বলেছে, কিছু মনে করবেন না এত আগে থেকে না গিয়ে গাজনের সময় ঠিক যাবো। ততদিনে কলকাতা, অন্য দুচার জায়গা ঘুরে আসি। কথা দিয়ে ফেলেছি আগে থেকে।

এর ওপর কথা চলে না আর। কথায় বিশ্বাসী সুমন্ত আর কোন কথা তোলেনি। মেনে নিয়েছে হাসিমুখে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে মণিময়। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে হিয়ারানী।

মুখে না হাসলেও, ভেতরে হেসেছে খুব হিয়ারানী।

হিয়ারানী জানে মণিময়ের কলকাতার মোহ কাটেনি একটুও। কাটবে নাও বোধ হয় কখনো। মর্মান্তিক টান। প্রচুর আঘাত পেয়েছে যেখানে, সেখানে সম্মানও পেয়েছে আশার অতিরিক্ত। এই সম্মানের আশায়ই কি কলকাতা কলকাতা করে অত ?

তা কেন হবে। মনের অনির্বাণ জ্বালা মেটাবার জন্য। ওর বিদ্রোহীমন নিজের জ্বালার আগুনে জ্বালিয়ে দিতে চায়, জ্বালিয়ে রাখতে চায় তাদের ভেতর অহর্নিশি। যারা সমাজে স্থান দিতে চায়নি মণিময়কে চায়নি ঘরে ঠাঁই দিতে এতটুকু। ওকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

ঘৃণায়, না অবহেলায়, না ভয়ে ?

তিনটেতেই।

শ্মশানে-মশানে ঘোরে বলে দারুণ ঘৃণা। বংশের ছেলে বলে পরিচয় দিতে লজ্জা। নিজেদের কব্জায় ওকে আনতে পারলো না বলে সীমাপরিসীমাহীন তুচ্ছতাচ্ছিল্য। আর ভয়, ভয়—যদি তাদের অনিষ্ট হয় ওর সংস্পর্শে। যদি কেউ মারা যায়, অসুস্থ হয়ে পড়ে, সেটাও নাকি ওর নজর দোষে। ওর দৃষ্টি সাংঘাতিক। রাক্ষুসে। ও একটা নররাক্ষস।

'নররাক্ষস' বলে বলে বাড়ির লোকেরাই মণিময়কে নররাক্ষস হতে বাধ্য করেছে। বাড়ির লোকেরাই এর মূল কারণ। নররাক্ষস হিসেবে মণিময় দেশে দেশে অনেক সম্মান পেলেও, দেবতার মর্যাদা পেল কই। সেটা মস্ত বড় ব্যথা মণিময়ের।

অথচ ওর কি না ছিল।

জ্যাঠতুতো ভাইয়েদের তুলনায় কোন অংশে কম। বরং বেশী। লক্ষ্যে পড়ার মতো বেশী। রূপে শক্তিতে বিদ্যাবুদ্ধিতে উদার মনের পরিচয়েতে কেউ সমকক্ষ নয়। কাল হল ওর এত গুণে গুণী হয়ে। ঈশ্বরের আশীর্বাদে নেমে এলো সৃষ্টিছাড়া অভিশাপ। বড় থেকে ছোট অবধি, সকলের মুখে একই কথার প্রতিধ্বনি ঘুরে ফিরে বেড়িয়েছে বাড়িময়। একতলা দোতলা তিনতলা। কাজের লোকেদেরও ওকে দেখে ভয়। মহাভয়। বিশ হাত তফাতে সরে যায়। বামুন খাবারের থালা ধরে দিয়ে ত্রিসীমানা থেকে উধাও।

কেন? কি অপরাধে মণিময় অপয়া অলক্ষ্মী সর্বনেশে রাক্ষস।

অপরাধ—জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মৃত্যু। তার একমাসের মধ্যে বাপের। কোথাও কিচ্ছু নেই, হঠাৎ। এ অলক্ষুণে ছেলে সাক্ষাৎ রাক্ষস না হলে এইভাবে খেয়ে ফেলে মা-বাপকে। ঠাকুরমার আশ্রয়ে মানুষ। মণিময়ের জন্য ঠাকুরমাকে কম হেনস্থা হতে হয়নি। কম কটু কথা শুনতে হয়নি।

ঠাকুরমা যতদিন ছিল, ততদিন উঠিপড়ি লাগেনি কেউ মণিময়ের সঙ্গে। ঠাকুরমার মৃত্যু কামনা চলতো অনবরত। অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে এসেছে। যাবে কি সহজে। হাড় কালি মাস কালি করে না যায় শেষে। সংসারটাকে ছারেখারে দেবার জন্য একটা রাক্ষস মানুষ করে চলেছে।

ঠাকুরমা চলে যাবার পর যত অনাসৃষ্টি শুরু হতে লাগলো।

বড়দের চোখরাঙানি শাসানি। কোন ছেলে অন্যায় করে কাকে দুটো চড় মেরেছে, মণিময়ের মোড়লী করার কি দরকার। উনি কি বিধাতাপুরুষ এসেছেন নাকি! দোষী-নির্দোষ ঠিক করেছে। নিজের

বুদ্ধিতে দোষী ভেবে নিয়ে অন্যের গায়ে হাত তোলার অধিকার কে ওকে দিয়েছে?

নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে শাসনে আর বা' বদনামে অতিষ্ঠ বেপরোয়া মণিময়। বেশ জোরগলায় বলেছে, কে আবার দেবে? আমার মতে আমি করেছি। আমি করে যাবো। শুনবো না কোন কথা, কারো কথা।

যত বড় মুখ নয়, তত ব: কথা। জ্যাঠা-কাকা মারতে মারতে গেটের ধার অবধি নিয়ে গেছে। নির্বিবাদে সহ্য করেছে মণিময়। জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভায়েরা তেড়ে আসতে, ও রুখে দাঁড়িয়েছে। কার ঘাড়ে কটা মাথা দেখি একবার। সব কটাকে শেষ করে বেরোবো এ বাড়ি থেকে।

আঠারো বছরের মণিময়ের দেহটা ফুলে চতুর্গুণ হয়ে উঠেছে আঠাশ বছরের মতো। মুখচোখের চেহারা পাল্টে গেছে। কি ভয়ঙ্কর। বাঁচাও! বাঁচাও! রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচাও! ঘরে ঢুকে খিল তাড়া বন্ধ করে দিয়েছে সবাই।

দরোয়ানও সামনে যেতে ভয় পেয়েছে।

সামনের বাড়ি হিয়ারানীদের। এদের বাড়ির সঙ্গে যাতায়াত খুব। হিয়ারানী প্রায়ই এসেছে। বাড়ির নানান অশান্তির ব্যাপারে মণিময়ের ওপর সহানুভূতি খুব। হিয়ারানী অনেক ক্ষেত্রে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করেছে। ঠাকুরমার কথা শুনতো মণিময়, আর হিয়ারানীর কথা শোনে। হিয়ারানী ওর মন বুঝেই বোঝায়।

এ বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য অন্য কোন পথ অন্য কোন লোক না পেয়ে হিয়ারানীকেই ডেকে এনেছে দরোয়ান। তার চাকরি যাবে মণিময়বাবু শান্ত না হলে। তার ওপর বাড়ি থেকে বার করে দেবার হুকুম। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছে বুড়ো অযোধ্যাপ্রসাদ। জান-মান বাঁচাইয়ে দিদিমণিজী।

মণিময়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে হিয়ারানী।

বলেছে, শেষ যদি করতে হয়, আমাকে আগে কর।

দাঁতে দাঁত চেপে, দুহাত বাড়িয়ে গলা টিপতে এগিয়ে গেছে মণিময় হিয়ারানীর।

গলায় হাত ঠেকাতে গিয়েই থমকে গেছে।

কেঁদে ফেলেছে মণিময়। কাঁদতে কাঁদতেই বলেছে, কেউ বুঝলো না আমাকে, কেউ বুঝলো না। আর থাকবো না। আর আসবো না এ বাড়িতে। আসবো না কখনো।

ছুটে বেরিয়ে গেছে মণিময় গেট দিয়ে।

কান্না চাপতে পারে নি হিয়ারানী। সে নিরুপায়। ওকে আটকাতে পারে নি।

বাড়ি ফিরে এসেও হিয়ারানী কেঁদেছে।

প্রতিদিনই চোখের জলে মণিময়কে ডেকেছে মনে মনে। আমি তো কোন অপরাধ-অন্যায় করিনি। তুমি দেখা করো একবার। অন্তত শুনে যাও আমার মুখ থেকে, আমি তোমায় ভুল বুঝিনি। কখনো বুঝবোও না। তুমি বিশ্বাস কর। এরকম দুর্মতি যেন আমার কোনদিন না হয়। এ মতিভ্রম যেন আমার কোনদিন না হয়। তার আগে যেন মৃত্যু হয় আমার। শুধু মৃত্যু চাই। আর কিছু নয়। মৃত্যু মৃত্যু।

প্রায় বছর দুয়েক কেটে গেছে, কোন খোঁজখবর মেলেনি মণিময়ের। হিয়ারানীর বাড়ির সবাই—মা-বাবা থেকে শুরু করে ছোট ভাইবোনেরা পর্যন্ত মণিময়কে ভালোবাসতো, মণিময়কে পছন্দ করতো। ওরাও মণিময়ের খবরের জন্য ব্যাকুল।

অনেকেই ধরে নিয়েছে, ছেলেটা বোধহয় আর নেই। থাকলে একদিন না একদিন এসে পড়তোই। যা একরোখা আর আত্মাভিমানী ছেলে, এত অপমানের পর নিশ্চয় নিজের জীবনের ওপরই ধিক্কার এসে গেছে ওর।

অনেকের এই ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করে দিয়ে পাড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছে এক সন্ধ্যেয়। ভীতুরা ওকে দেখে ভয়ে আঁতকে উঠেছে। ওর মধ্যে মণিময়ের ভূত দেখেছে। নিজেদের বাড়িতে

প্রবেশ করেনি। বাড়ির দিকে—জন্ম ভিটের দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকায়নি মোটে।

প্রবেশ করেছে নির্দ্বিধায় হিয়ারানীদের বাড়িতে। বাড়ির সকলে দীর্ঘদিন পর মণিময়কে দেখে আনন্দে আত্মহারা। আলুথালু বেশে ঘরের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে হিয়ারানী। সামনে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। একদৃষ্টে দেখছে। চোখ ফেরানো যায় না। ফেরাতেও ইচ্ছে করছে না। এত রূপের পসরা নিয়ে এলো কোত্থেকে মণিময়। রূপ ফেটে পড়ছে। আগের চেয়ে আরো হৃষ্টপুষ্ট। যাকে বলে দশাসই জওয়ান পুরুষ।

হেসে বলেছে মণিময়, কি এত দেখছো?

হিয়ারানী শুনতে পেল কি না পেল, বোঝা গেল না। ওর তরফ থেকে কোন জবাবই এসে পৌঁছুলো না মণিময়ের কাছে। স্রেফ ঠোঁটের কোণে খুশির রেখা ফুটে উঠেছে।

নিজেকে একটু তৈরি করে নিতে আর একটু সময় লাগবে। ভালো করে তৈরি হয়ে আসবো আবার। আবার দেখা হবে। মনটা বড্ড টানছিল তাই থাকতে না পেরে মাঝখানেই চলে এসেছি। এখুনি চলে যেতে হবে।

হিয়ারানীর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠেই থেমে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে ধরেছে। ছলছলে চোখে হাসির বিদ্যুৎ দুলে উঠলো।

মণিময় দাঁড়ায়নি আর।

তখন হিয়ারানী বোঝেনি, কি তৈরী। আর একটু সময় লাগবে মানে আরো দু বছর।

ঠিক দু বছরের মাথায় আবার এসে হাজির মণিময়।

এই পাড়ায়ই বন্দোবস্ত করে ফেলেছে নররাক্ষসের খেলা দেখানোর। দেখা যাক, নররাক্ষসের খেলাটা কেমন!

বিকেলে ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে ধন্না দিয়ে বসে আছে সবাই। 'নররাক্ষস দেখবে, নররাক্ষস দেখবে' দারুণ উত্তেজনা চলছে ভেতরে।

বোধ হয় মণিময়রা কোন বনমানুষ-টনমানুষ ধরে এনেছে, তাকে দিয়েই খেলা দেখাবে। বনমানুষ দেখা হবে। বনমানুষের খেলা সেই সঙ্গে। একযাত্রায় তুটো ফল। মন্দ কি!

প্রথমে একজন গেরুয়া আলখাল্লা পরনে সাদাচুল সাদা গোঁফদাড়ির সন্ন্যাসী এলো। সন্ন্যাসী বেশ জোরে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললো, এই মানুষই নররাক্ষস হয়ে উঠবে মুহূর্তে। সকলের দেখে অবাক লাগবে। এমন শক্তি তার মধ্যে আসবে এখানে যত লোক প্রত্যেককেই একা কাবু করে দিতে পারবে। এটাশুধু খেলা নয়, সাধনায় মানুষ কি না হয়ে উঠতে পারে, কি না করতে পারে—সেটাই খেলার ছলে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে মানুষকে। এর মধ্যে কোন ফাঁক নেই কোন ফাঁকি নেই। প্রকৃতই সাধনা সিদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রমাণ একটা।

সন্ন্যাসী শক্তিধর এসব বলার পর হাজির করেছে মণিময়কে। মণিময় জোড়হাত করে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ খানিক। তারপর তু'হাত তু'দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। শক্তিধর দর্শকদের ডেকে ডেকে মণিময়ের হাত-পা-কোমর শেকল আর মোটা কাছি দিয়ে বাঁধিয়ে জোরে ধরে থাকতে বলেছে। বলেছে, খুব হুঁশিয়ার।

মণিময়ের বন্ধন দশা দেখতে ভালো লাগছে না হিয়ারানীর। এমন জানলে কে আসতো!

হিয়ারানী কি দেখছে! সত্যি কি? মানুষটা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। সন্ন্যাসীর ঘটে মন্ত্রপূত জল মাথায়-গায়ে ছিটকোনোর সঙ্গে সঙ্গে। এ যেন আগের মণিময়ই নয়। একেবারে দৈত্য একটা। অদ্ভুত চাউনি চোখের। অদ্ভুত মুখভঙ্গি।

শেকল দড়িতে এমন টান দিয়েছে, হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে তু'পাশের লোক। দড়ি শেকল ছিঁড়ে ফেলছে কটকট পটপট শব্দে। চক্ষের নিমেষে। ডানা-পালক সুদ্ধু জলজ্যান্ত মুরগীটাকে ধরে মুখে পুরে দিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে মুরগীটার কোন অস্তিত্ব থাকেনি আর মুখের ভেতর।

দেখে অনেকের বুক ধড়পড়ানি বেড়েছে। কেউ সম্পূর্ণ বেহুঁশ,

কেউ আধা। কারো মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। দু'চোখে সর্ষেফুল দেখছে। অন্ধকার।

আর দেখতে চায় না কেউ রাক্ষস সাধনার সিদ্ধির ফল। এ সিদ্ধির ফল দেখানো বন্ধ হোক। বন্ধ হোক এখুনি। বাচ্চারা কেঁদে ককিয়ে উঠছে।

শক্তিধর সন্ন্যাসী অন্য আর একটা ঘটের মন্ত্রপূত জল পা থেকে মাথা অবধি—নররাক্ষসের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে।

শান্ত সৌম্য সুন্দর হয়ে উঠেছে নররাক্ষস। হয়ে উঠেছে আবার হিয়ারানীর অতি প্রিয় অতি আদরের ধন মনের মানুষ আগেকার সেই মণিময়।

রাত্তিরে মণিময় এসেছে হিয়ারানীদের বাড়ি।

বাড়ির সকলের মুখ থমথমে। হাসি নেই কারো মুখে। নেই কোন কথাবার্তা। মণিময় যেন এবাড়ির সকলের অচেনা অজানা। এদের আচমকা মনোপরিবর্তন কেমন কেমন ঠেকছে।

সে যাবে না ওপরে উঠে হিয়ারানীর কাছে একবার শেষ দেখা করবে। শুধু সাধনার তার শক্তিসঞ্চয়ের মূল্য দেবে এরা—বিশেষ করে এবাড়ির সকলে, এটাই খুব আশা করে ছিল মণিময়। সে আশা তার শূন্যে প্রাসাদ বাঁধার মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এদের সবার প্রত্যাখ্যান আঘাত মুখ বুজে সহ্য করতে পারবে মণিময়, কিন্তু হিয়ারানীর পক্ষ থেকে যদি আসে—

সদর দরজার দিকে মুখ ফিরিয়েছে মণিময়। ডান পাটাও বাড়িয়েছে। পেছন থেকে এসে ডেকেছে হিয়ারানী।

দাঁড়িয়ে পড়েছে মণিময়। দেখছে চেয়ে চেয়ে হিয়ারানীর মুখ নিখুঁতভাবে। কোনখানে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এতটুকুও চিহ্ন ফুটে উঠেছে কিনা, উঠছে কিনা।

এত কি দেখছো? আমার এখানে থাকা আর একদণ্ড চলবে না। আমি এখুনি চলে যেতে চাই। নিয়ে যেতে পারবে? পারবে না কি? তুমি না পারলেও, আমি নিজেই চলে যাবো—যেখানে দু'চোখ যায়।

এবাড়ির লোকেরা কেউ আর চায় না তোমায়। তুমি সাক্ষাৎ রাক্ষস। রাক্ষসের হাতে তুলে দেবে কোন বাপ-মা নিজের মেয়েকে।

আজকের দিনটা একটু চিন্তা করতে সময় দাও।

একদম সময় নয়। যা কিছু, এখুনি করতে হবে। এই মুহূর্তে। অনেক সময় নেয়ানিয়ি হয়ে গেছে। আজ যদি নাও ফের—আমার শেষ কথা বলে দিচ্ছি—এ দুনিয়ায় আর খুঁজে পাবে না কোনদিন আমায়।

সিঁড়ির ধাপে পা রেখেছে হিয়ারানী। ওপরে উঠবে। খপ করে বাঁহাতখানা চেপে ধরেছে মণিময়। হিয়ারানীর দু'চোখ উপচে জল পড়েছে টসটস করে।

মণিময়কে নিজে থেকে বিয়ে করার জন্য বাপের বাড়ির সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেছে। হোক, ক্ষতি নেই কোন। হিয়ারানী মণিময়কে নিয়ে সুখি। মণিময়ও খুব খুশি। একজনও তার জন্য ভাববার আছে পৃথিবীতে। তাকে চায়। তার দুঃখে দুঃখি, সুখে সুখি। নিজের প্রাণের চেয়ে তাকে ভালোবাসে বেশী। এই হচ্ছে মণিময়ের হিয়ার প্রিয়া—হিয়ারানী।

হিয়ারানীর সমস্ত কথাই শোনে মণিময়। কেবল ব্যতিক্রম একটা জায়গায়। মাত্র একটা জায়গায়। গোটা কাঁচা মুরগী খাওয়ার ক্ষেত্রে। হিয়ারানীর বক্তব্য—সাধনায় শক্তি সঞ্চয় মানি। তবে হজমশক্তির যন্ত্রটা তো মানুষের মতো গড়া। জন্তু জানোয়ারের মতো নয়, এরকম হতে থাকলে বিকল হয়ে মহাবিপদে পড়তে হবে তখন।

হেসে উড়িয়ে দিয়েছে মণিময়। বলেছে, ওইটাই তো লোকে চায় দেখতে। কিছু হবে না কিছু হবে না।

নররাক্ষস সাধনার ক্রিয়াকলাপ সমস্ত দেখিয়ে দিয়েছে মণিময় হিয়ারানীকে। সাধনসঙ্গিনীও করে নিয়েছে। শুনিয়েছে এপথে আসার কথা।

জীবন ত্যাগের ইচ্ছে যখন প্রবল, মাঝরাতে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে

বেয়ে শেষ সিঁড়িতে এসে পৌঁছেছে, তখন কে যেন পেছনের জামাটা ধরে সজোরে টেনেছে। আচমকা টানে চিৎ হয়ে পড়ে গেছে সিঁড়ির ওপর। চুলের মুঠি ধরে, জোরে দু'গালে দুই থাপ্পড় মেরে ওপরে নিয়ে গেছে শক্তিধর সন্ন্যাসী।

লোকের কথায় জীবন—ছেলেখেলা নাকি। এতই সহজ নয়? কেন এটা মাথায় এলো না। হ্যাঁ সত্যিই রাক্ষস কাকে বলে দেখিয়ে দেবো ওদের বুকের রক্ত হিম করে দিয়ে!

সিলেটের শ্মশানেই এসে ক্রিয়াকলাপ দেখিয়ে দিয়েছে। হাতে ধরে শিখিয়েছে। বছর চারেক ধরে খাওয়া-পরা, সমস্ত কিছু যুগিয়েছে। সন্তানের স্নেহে আগলে আগলে রেখেছে।

বলেছে, তন্ত্রের অঘমর্ষণ ক্রিয়ার একটু হেরফের রাক্ষসসাধনা। ডান নাক দিয়ে জল টেনে বাঁ নাক দিয়ে না ফেলে, বাঁ নাক দিয়ে জল টেনে ডান নাক দিয়ে ফেলে মনেপ্রাণে চিন্তা করতে হবে, ভেতরের পাপপুরুষ বেরিয়ে এসেছে বাইরে। পাপপুরুষ দৈত্যের রূপে রাক্ষসের রূপে বিরাট হয়ে উঠছে। তার প্রতিটি অঙ্গ নিজের অঙ্গে অঙ্গে মিলে যাচ্ছে।··· রাং ছোং রাক্ষসসদৃশং···মহাবলং···কুরু কুরু স্বাহা। মন্ত্রজপ একদিকে আর একদিকে চিন্তা নিজে রাক্ষস হয়ে উঠছি, উঠেছি।

সহযোগীও সামনে ঘটপূর্ণ জলে হাত রেখে ওই মন্ত্র জপতে থাকবে। তার ভেতরের পাপপুরুষ দৈত্যশক্তি নিশ্বাসে বেরিয়ে ঘটের জলে অবস্থান করছে। এই জলে এই প্রবল শক্তি মিলমিশে এক হয়ে যাবে সামনের মানুষের দেহে মনে।

তন্ত্রের অঘমর্ষণে পাপপুরুষ বেরিয়ে যায়, দেবী বধ করে মানুষ হয়ে ওঠে দেবতা। এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষ হয়ে উঠবে দৈত্য-দানব।

সহযোগীই আলাদা পূর্ণ ঘটের জলে হাত রেখে দানবকে শান্ত করে আনবে। ফিরিয়ে আনতে জপ করবে এক মনে।······শান্তে প্রশান্তে উপশম স্বাহা।

যেখানেই যখন যে দেশে গেছে মণিময় নররাক্ষসের বায়না নিক্ষে

সঙ্গে গেছে হিয়ারানী। হিয়ারানীই সহযোগীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে নিষ্ঠা নিয়ে একাগ্রমনে।

সমস্ত জায়গায় সুনাম-প্রণাম নিয়ে নিয়ে ফিরেছে মণিময়। সব জায়গায় তার মুখে এক কথা—হিয়ারানীর জন্যই ঠিক ঠিক দেখেছে সবাই। ও না হলে সব পণ্ড। সব পণ্ড!

সুমন্ত সমস্তই জানে হিয়ারানীর জীবন আর মণিময়ের জীবন। শোনার পর ওর দু'চোখ ভরে উঠেছে জলে। বলেছে, এত কষ্টের ফল মিলবে, মিলবে না? সততার কি কোন মূল্য নেই?

সুমন্তদের দেশে এসে, খাতির কিছু কম পায়নি হিয়ারানীরা। উপার্জনের ভাঁড়ারও বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। টাকা যোগাড় করে পাকা ঘর বানিয়ে দিয়েছে সুমন্ত। এই দেশই ওদের নিজের দেশ হোক। এই বাড়িই ওদের নিজের বাড়ি হোক নিজের ঘর হোক। যারা ঘর ছাড়িয়েছে, দেশ ছাড়িয়েছে, ছন্নছাড়া করে নিজেরা আনন্দে ভাসছে, তারা দেখুক—দোষী হয়ে নির্দোষকে সাজা দিলে, সে সাজা মজার ব্যাপারই হয়ে ওঠে শেষ পর্যন্ত। ধোপে টেকে না। কলকাতা থেকে বারুইপুর আর কত দূর। জানতেও পাবে দেখতেও পাবে শুনতে পাবে।

যাদের যাযাবরের জীবন, তাদের বসিয়ে দিলে এক জায়গায় সইবে কেমন করে। স্থিতি সইল না হিয়ারানীদের। সুখের আকাশে না চাইতেই দুঃখের ঝঞ্ঝা নেমে এলো। নেমে এলো শতসহস্র বাহু বিস্তার করে।

কোন রেহাই পেল না হিয়ারানীরা।

ডাক্তার-বদ্যি-সাধুসন্ত আনিয়েও কোন প্রতিকার করা গেল না মণিময়ের ব্যাধির। অরুচি। রুচি আর ফিরে এলো না কোনদিন। না খেয়ে খেয়ে অমন পাহাড় গড়ন মানুষটার কি হালই না হয়ে গেল। শুকনো কাঠ একটা। গোলাপ-ফর্সা রঙে কালির পোঁচ বুলিয়ে দিয়েছে কে যেন রীতিমতো পুরু করে।

ধীরে ধীরে একদিন কালের কোলে ঢলে পড়েছে মণিময়।

সেদিনও বর্ষা। শ্রাবণের ধারা ঝরেছে সারাদিন সারারাত। কিন্তু হিয়ারানীর চোখে নামেনি বর্ষা।

মণিময় চলে যাবার পরও সুমন্ত আসা যাওয়া করছে। আগের চেয়ে আরো বেশী করে আসে। বেশী করে দেখাশোনা করে। সুমন্তর মহাভাবনা হিয়ারানীর জন্য। মুখে হাসি নেই, কোন কথাবার্তা নেই। একটা অন্য মানুষ হয়ে গেছে। হাসতে কথা কওয়াতে কত না প্রাণপণ চেষ্টা।

দিনরাতের চারভাগের তিনভাগ হিয়ারানীর ওখানেই কাটায়। দেখবার কেউ নেই। সে ছাড়া দেখবে কে! খাওয়াবে কে! সে না থাকলে এ মানুষ বাঁচতে পারে না।

সবার কি মন সুমন্তর মন, সবার কি চোখ সুমন্তর চোখ, তা কখনো হয় নাকি। এত ভালো মনের সকলে হলেই তো শান্তি আর অশান্তি ব'লে থাকবে না কিছু। ঘরে বাইরে শান্তি আর শান্তি শুধু। তা বুঝি ঈশ্বরের রাজ্যে হবার নয়।

হয়নি, হবে না।

এক্ষেত্রেও হল না।

হিয়ারানীর ব্যাপার নিয়ে অশান্তির আগুন জ্বললো সুমন্তদের বাড়ির অন্দরমহল অবধি। চতুর্দিকে গেল-গেল রব। কে গেল? কে আবার! সুমন্ত গো, সুমন্ত। যা ডাইনির পাল্লায় পড়েছে, প্রাণে বাঁচলে হয়।

মণিময়টাকে ওই ডাইনি ভেড়া বানিয়ে রেখেছিলো। পেটে পুরেও খিদে মেটেনি এখনো। মা গো মা। ছেলেটাকে বাড়ি যেতে দেয়া তো দূরের কথা, ছাড়তে চায় না একদম। বাড়িতে মণিময়ের মা কেঁদে সারা, বৌ কেঁদে সারা সে ধারে নজর নেই গা ছেলেটার। বোঝো এবার! কি বশই না করে রেখেছে গুণতুক ক'রে। ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে হয় দেশ থেকে।

অমন রাজপুত্তুর ছেলে সুমন্ত, কি দশাই না হয়েছে। মুখের

গোড়ায় ভাতের ডেলা নিয়ে 'খাও খাও'! আর হিয়ারানী? উনি তো এতদিন মণিময়ের হিয়ার রানী হয়েছিলেন, এবারে সুমন্তরও হিয়ারানী হতে চাইছেন। আদুরে সুরে কি সোহাগের কথা, তুমি আগে খাও।

মরি মরি। স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও এমন হয় না। ছ্যাঃ ছ্যাঃ। রকমসকম দেখে দেখে লোকের চোখ পচে যাচ্ছে। ঝ্যাঁটা মার, ঝ্যাঁটা মার! দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে হয়। বেহায়া নচ্ছার মেয়েছেলে কোথাকার। মরেও না তো গা। এদের আবার মরণ আছে নাকি। এখন কত লোককে খায় ছ্যাখো রাক্ষুসী। রাক্ষুসীই তো কি সব মন্তর-তন্তরে অমন ছেলেটাকে রাক্ষস বানিয়ে দিতো! আবার মানুষও করতো। এসমস্ত তো স্বচক্ষে ছ্যাখা। ও সাক্ষাৎ রাক্ষসী। রাক্ষুসী না হলে রাক্ষস তৈরী করে কি করে! দেখবে সবাই, তড়িঘড়ি একটা বিহিত না করলে মণিময়ের মতো সুমন্তটাকেও করে ফেলবে। ধড়িবাজ একখানি। কতরকমই ছলাকলা। শোকে নাকি পাথর হয়ে গেছেন উনি। এটা সত্যি ভেবে ছোঁড়াটা ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে পাগল হ'তে বসেছে!

ছ্যাখা যাক, তুঁদে মামার হিম্মত! সুমন্তর মা-ই আনিয়েছে ভাইকে।

হিয়ারানীকেও লোকে এসে শোনাতে কসুর করেনি। একবারের জন্যও হিয়ারানী মুখ খোলেনি কারো কাছে কখনো! কেবল সুমন্ত এলে বলেছে, আমার আর এখানে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না আমার যাই হোক, তোমার বদনাম শুনতে পারছি না আমি আর। আমি চাই না আমায় নিয়ে তোমার বাড়ির, দেশের সকলের অশান্তি হোক।

সুমন্তর মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে গেছে। ছলছল করে উঠেছে চোখ। বলেছে, কত অবুঝ এরা! একটা অসহায় মেয়েছেলেকে নিয়ে—এরা কি মানুষ! এদের মন বলে কিছু নেই। দায়সারা বলেও নেই কিছু। বেশ! দেখি, আমাকে কে আটকায়! তোমাকে সঙ্গে করে নিয়েই আমি অন্য জায়গায় চলে যাবো! দেখি এরা কি করে! কি করে

আটকায় এই সুমন্তকে। ঠোঁট কেঁপে উঠেছে হিয়ারানীর। মুখে কিছু বলতে পারেনি। শুধু ঘাড় নেড়ে জানিয়েছে, না না না। তা হয় না।

উঠে চলে গেছে সুমন্ত।

বিকেলে এসে জানিয়েছে, বাড়ির সকলকে বলে দিয়েছি আমার মতামত। হিয়ারানীও থাকছে না, আর আমিও থাকছি না।

যে মানুষ হিয়ারানীর জন্য এত যুদ্ধ করেছে সকলের সঙ্গে—পাড়া ঘর আত্মীয় স্বজন—সকলের সামনা সামনি দাঁড়িয়েছে, দাঁড়াতে একটুও ভয় করেনি, সেই মানুষ আজ কোথায়।

চলতে চলতে চনমন করে চাইছে চতুর্দিকে।

কিছু দেখতে পাচ্ছে না হিয়ারানী। কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। বৃষ্টি থামবে না হয়তো। এরাতে। হিয়ারানী কিন্তু একভাবে অনুভব করে যাচ্ছে কার অস্তিত্ব। কে যেন তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

সুমন্ত নিশ্চয় বন্দী বাড়িতে। বা ঘুমে অচেতন। তার এখানে না আসাটাই চাইছে হিয়ারানী। এলে একটা কাণ্ড বাধবে। হিয়ারানীর মৃত্যুভয় নেই। মৃত্যু তো তার হয়েই গেছে মণিময়ের সঙ্গে। মনে হচ্ছে মণিময়ই বুঝি পাশে পাশে চলছে। তা কেমন করে হয়! তবে এসময় এটা ভাবতেও ভালো লাগছে।

মনে মনে প্রার্থনা করছে হিয়ারানী, ঈশ্বর সুমন্তকে রক্ষে করো। ওর যেন না কোন বিপদ হয়। ও যেন মা-স্ত্রী নিয়ে শান্তিতে থাকে। হিয়ারানী তো এখান থেকে চলে যেতে চেয়েছিল সুমন্তকে বাঁচাবার জন্য। তার সে কথা ঈশ্বর স্বকর্ণে শুনেছে। তার সব কাজই ফুরিয়েছে। অন্য জায়গায় যাওয়ার চেয়ে পৃথিবী থেকে বিদায়ই শ্রেষ্ঠ কাম্য। ঈশ্বরের অশেষ করুণা অশেষ আশীর্বাদ। ঈশ্বর। হিয়ারানীর এই মুক্তির জন্য তোমায় ধন্যবাদ। শত সহস্র ধন্যবাদ।

সুমন্তদের গুরুদেব সন্ন্যাসী সূর্যদীপের গম্ভীর আওয়াজে সজাগ হয়ে উঠেছে হিয়ারানী। সূর্যদীপ আদেশ করছে লেঠেলদের। ডাইনের

বটগাছটায় ভালো করে বেঁধে ফেলো হিয়ারানীকে।

হিয়ারানী বুঝতে পারছে না সূর্যদীপের এত কাণ্ড করবার কারণ কি! সে তৈরী হয়েই আছে। মাথা পেতে দিতে প্রস্তুত। এক মুহূর্তের ব্যাপারে। এত বাঁধা বাঁধির কষ্ট করা কেন?

আবার আদেশের সুরে বলেছে সূর্যদীপ লেঠেলদের—এবারে সকলের ছুটি। চলে যাও! চলে যা বলছি। বাড়িতে গিয়ে গিন্নীমা আর মামাবাবুকে বলে দিবি। তাদের কাজের ভার অন্যের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দায়িত্ব নিয়েছি যেমন, আমি তা পূর্ণ করে যাবো। হিয়ারানীকে মুক্তি দিয়ে। এখান থেকে চিরকালের জন্য আজ মুক্তি ওর। কোন ভয় নেই। সুমন্তর ঘরের তালা খুলে দিতে বলতে পারিস মামাবাবুকে। সুমন্তর সঙ্গে আর দেখা হবে না হিয়ারানীর কোন দিন এখানে।

বীভৎস উল্লাসে লাঠি ছোরা নিয়ে লাফিয়ে নেচে উঠেছে অন্ধকারে অন্ধকার রাজ্যের মানুষেরা। তারপর পড়িমরি করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে একসঙ্গে সবাই। সুসংবাদ জানিয়ে অনেক পুরস্কার পাবে।

বলিষ্ঠ পদক্ষেপে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসেছে সূর্যদীপ। আলখাল্লার ভেতরে হাত গলিয়ে বড় ছোরা একটা বার করেছে। শক্ত মুঠোয় বাঁট ধরে হিয়ারানীর সামনা সামনি দাঁড়িয়েছে। বজ্রগম্ভীর স্বরে বলেছে, অন্তিমকালে তোমার ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে নাও। চটপট চটপট। সময় হাতে নেই বেশী। বলির লগ্ন বয়ে যাবে মহামায়ার।

চোখ বুজে নয়। চোখ চেয়েই দেখছে হিয়ারানী। মণিময় ধরে রয়েছে তাকে। দু'চোখ বুজেছে হিয়ারানী। বুজেও একই দৃশ্য দেখছে। মণিময় হারায়নি। হারাবে নাও কখনো তার মণিময়।

চমক ভাঙছে হিয়ারানীর কটকট কাছি কাটার আওয়াজে। ছোরা দিয়ে কেটে কেটে শক্ত বাঁধন আলগা করে দিচ্ছে সূর্যদীপ।

মুক্ত করে দিয়েছে হিয়ারানীকে সূর্যদীপ। সম্পূর্ণ মুক্ত। স্নেহঝরা স্বরে বলেছে, মা। তোমায় বাঁচাবার জন্যেই আমার এত হম্বিতম্বি, এত অভিনয়। তুমি চলে যেতে পারো, যেখানে ইচ্ছে তোমার।

সূর্যদীপের পায়ের ওপর কেঁদে ভেঙে পড়েছে হিয়ারানী।

বাবা! কেন নিজে হাতে শেষ করলেন না এ ডাইনিকে, এ এ রাক্ষুসীকে। সত্যিসত্যিই মুক্তি পেয়ে যেতুম। কোথায় যাবো, কার কাছে, কোথায় আশ্রয় এ অলক্ষুণের! অপঘাতের চেয়ে আপনার হাতের বলি যে আমার মহাপুণ্য ছিল বাবা।

হাত ধরে তুলেছে সূর্যদীপ।

সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, তুমি ডাইনি নও, তুমি রাক্ষসী নও। তুমি অলক্ষুণে নও! তুমি অন্য। তুমি কি, তুমি জানো না এখনো। এদের স্তরের তুমি নও।

বলেছে সূর্যদীপ, তোমার আসল আশ্রয়ে তোমাকে পৌঁছে দেব আমি। যেখানে হিমালয়ের কোলে কোলে গুহায় গুহায় আছে অজ্ঞাতে তোমার মতো তোমার বোনেরা।

আকাশের বিদ্যুৎ সারা জায়গাটা জুড়ে নীল আলো ছড়িয়ে দিয়েছে নিমেষে। আলোয় আলো হয়ে উঠেছে দুটি মুখ। হাসির আলোয়। পবিত্র হাসিতে। একটি সূর্যদীপের। আর অন্যটি? হিয়ারানীর।

গুহার ভেতরে বসে ওরা পাঁচজন। স্বপ্নমায়া মনোবীণা সুনয়নী মৈথিলী আর হিয়ারানী। শান্ত সুন্দর এক একটি মাতৃমূর্তি।

এরা আগুনের সামনে বসে একমনে কি ধ্যান করছে জানি না আমি। গুহার আগুনের তাপ আমার অনুভূতির পরতে পরতে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে।

কিসের ধ্যানে কার ধ্যানে মগ্ন এরা? হয়তো বা ডাকিনীদেবীর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি শুভশক্তি। সকলের শুভশক্তি জেগে ওঠার সাধনা সকলের মঙ্গলের সাধনা। সবার মনের কালো মুছে গিয়ে ভরে উঠুক আলোয় আলোয়। মানুষ হয়ে উঠুক শান্তির দূত আনন্দের দূত মহামিলনের দূত। গড়ে উঠুক স্বর্গরাজ্য। সবার মঙ্গল হয়ে উঠুক সবাই।…